দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

ফিতনা আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ইসলামের নামে চরমোনাইদের ভয়ংকর কিছু তাহরিফ ও তার প্রামাণ্য খণ্ডন :... ৭

গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন ২৭

সংশয় নিরসন- ০১: ৩৩

মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা ফরয ৩৩

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে? ৪৮

গোপন গোনাহ : ভয়ংকর এক রোগের সূত্র ৫১

দারুল আমান-আমলী আমান-কিবতি হত্যা ও একটি সংশয়.....৫৭

সাইয়িদুনা উসমান রা. : যুগে যুগে বিকারগ্রস্তদের সমালোচনার শিকার এক মাজলুম সাহাবি ৬১

সংশয় নিরসন ০২ ..... ৭৩

ক. সামরিক কাজে গোপনীয়তা ৭৩

সংশয় নিরসন- ০২ ..... ৭৮

খ. গুপ্ত হত্যা- কুরআনে কারীম ৭৮

সংশয় নিরসন- ০২ ..... ৮২

খ. গুপ্ত হত্যা..... ৮২

হাদিস ১. কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা ৮২

সংশয় নিরসন- ০২ .....৮৮

খ. গুপ্ত হত্যা- ৮৮

হাদিস ২. আবু রাফের ঘটনা ৮৮

সংশয় নিরসন- ০২ ..... ৯৫

খ. গুপ্ত হত্যা..... ৯৫

হাদিস ৩. খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির ঘটনা ৯৫

সংশয় নিরসন- ০২ .....৯৯
খ. গুপ্ত হত্যা.....৯৯
হাদিস-৪: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ৯৯
গুপ্ত হত্যা (শেষ পর্ব).....১০৫
বিবিধ ফাওয়ায়েদ ১০৫
ওয়ালা-বারা এবং শরীফ হাতেম আলআউনীর বিভ্রান্তি ১০৮
জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০১ ..... ১১৯
জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০২ ..... ১২৫
জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৩ ..... ১৩৩
(আবু হানিফা রহ. এর জিহাদ)..... ১৩৩
জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৪ ..... ১৪১
ইমাম মালেক রহ. এর জিহাদ..... ১৪১
জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৫ .....১৪৬
(ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ) ১৪৬
জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৬ .....১৫০
(ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) এর জিহাদ) ১৫০
মজলিসে শূরায় মহিলা সদস্য থাকতে পারবে কি?-.....১৫৯
তাকি উসমানী সাহেবের বিভ্রান্তি.....১৫৯
শাসকদের দরবারে যাতায়াতকারী আলেম হতে সাবধান !!!.....১৬৫
শাসকদের ব্যাপারে সাবধান- ১৬৭
হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. এর উপদেশমালা ও শিক্ষা.....১৬৭
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা) ১৭৯
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা - ২) ১৮২

সরকারের অনুগত দুনিয়ালোভী আলেম ১৮৬

উলামায়ে সূ'দের থেকে সাবধান!!!.....১৯০

সাপের লেজে নয়, মাথায় আঘাত করুন.....১৯৯

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ১ .....২০২

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০২ .....২১০

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৩ .....২১৬

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৪ .....২২৮

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৫ .....২৩৫

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৬ .....২৪০

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৭ .....২৪৪

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৮ .....২৪৮

পিডিএফ- কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়ার বিভ্রান্তির খণ্ডন ২৫২

ফিতনাতুদ দাজ্জাল - সালাফ ও আমরা.....২৫৩

নাফিরে আম: আরেকটু আলোকপাত.....২৫৮

সংশয়: লা তামান্নাও লিকাআল আদুউ.....২৬০

যেসব ভুল আমাদের ধ্বংস করবে.....২৭৪

হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতা ও কিয়ামতের একটি আলামত: অজ্ঞতার বিস্তার ২৭৭

ইসলামের নামে চরমোনাইদের ভয়ংকর কিছু তাহরিফ ও তার প্রামাণ্য খণ্ডন :

[saif abdullah]

Moderator

০১-০১-২০১৯

১ নং মন্তব্য : চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন : বর্তমান জমানায় যেহেতু তলোয়ারের যুদ্ধ, মুখোমুখি যুদ্ধ, এটা এখন অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সশস্ত্র বিপ্লব অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যেহেতু চৌদ্দশ বছরের আগের অবস্থা, পাঁচশ বছরের আগের অবস্থা, একশ বছরের আগের অবস্থা এক নয়। ...এই মুহূর্তে এই জমানায় কেউ যদি মনে করে, আমরা সশস্ত্র বিপ্লব করব, আমি বলব, তুমি সশস্ত্র বিপ্লব করতে পারবে না, তুমি আত্মঘাতী বিপ্লব করতে পারো, তুমি আত্মঘাতী বিপ্লব করতে পারো। এজন্য দেখেননি, যারা এই সশস্ত্র বিপ্লব করতে চেয়েছে, একজনও বাঁচেনি; বরং আমাদের দেশটাকে সন্ত্রাসী বানিয়ে তারা এখন জেলখানায় ভোগে আর ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দুর্নামগ্রস্ত হয়েছে।

সূত্র : https://m.youtube.com/watch?v=KvelZpqFd২Q (ভিডিওর প্রথম অংশ)

খণ্ডন : এ বক্তব্যের মাধ্যমে আপনি ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ বিধান 'কিতাল'কে অস্বীকার করেছেন। আপনি দাবি করেছেন, চৌদ্দশ বছরের আগের অবস্থার সাথে যেহেতু বর্তমান জমানার মিল নেই, তাই এ যুগে চৌদ্দশ বছরের আগের মতো সশস্ত্র জিহাদ তথা কিতালের অনুমতি নেই; বরং এ যুগে এটা করলে নাকি সন্ত্রাসবাদ হবে! অস্ত্রের মাধ্যমে এখন জিহাদ করা নাকি আত্মঘাতী হামলা বলে বিবেচিত হবে!! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক!

কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত 'কিতাল' দ্বারা সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ বুঝানো হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোনো আলিমের মতানৈক্য নেই। তাহলে কুরআনের যেসব আয়াতে কিতালের কথা এসেছে, সেসব আয়াত কি শুধু ১৪০০ বছর পর্যন্ত কার্যকর ছিল? এর পরে কি এসব আয়াত অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে? পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো মুফাসসির কি গত হয়েছেন, যিনি

কিতালের এসব আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করেছেন? এসব আয়াতের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? এগুলো কি আগেই রহিত হয়ে গেছে? নাকি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর থেকে বর্তমান যুগে রহিত হয়েছে?

তাহলে নিম্নোক্ত এ আয়াতগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী???

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

‘তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম; যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিজিয়া প্রদান করে।’ (সুরা তাওবা: ২৯)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো; যতক্ষণ না ফিতনা (তথা কুফর ও শিরক) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।’ (সুরা আনফাল: ৩৯)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

‘হে নবি, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন সশস্ত্র জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দুইশর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফিরের ওপর; এজন্য যে, ওরা কিছু বোঝে না।’ (সুরা আনফাল: ৬৫)

নিম্নেবর্ণিত এসব বিশুদ্ধ হাদিসের ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা কী???

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাকবে, অবশেষে ইসা আ. অবতরণ করবেন।' (সহিহু মুসলিম: ১/১৩৭, হা. নং ১৫৬)

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের পক্ষে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি ইসা আ.-এর নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' (সুনানু আবি দাউদ: ৩/৪, হা. নং ২৪৮৪)

لَا تَبْرَحُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ

'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাকবে। তাদেরকে যারা অপমান করতে চাইবে বা বিরোধিতা করতে চাইবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই অটল থাকবে।' (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি: ১৯/৩৮৬, হা. নং ৯০৫)

২ নং মন্তব্য : আমরা আগেই বলছি আমরা দাওয়াত নিয়ে যাই মানুষের কাছে। আর মানুষ যদি ইসলাম নাই বুঝে তাহলে ইসলামটা কায়েম করব কী? ইসলাম কায়েম করব কী? কী কথা ঠিক না? এজন্য আমরা চাই, আব্বাজান রহ. বলতেন, আমি নির্বাচন করি না, আমি জিহাদ করি। আমি কী করি? আল্লাহর শোকর এটার বাস্তব নমুনাও আছে। হাজি তোফাজ্জল হোসেন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। হোসেন স্প্রিং এর মালিক। হোসেন টায়ারের মালিক। এ যে হোসেন টায়ার দেখেন না? হোসেন স্প্রিং? বহু কোটি কোটি টাকার মালিক। চট্টগামের একজন ব্যবসায়ী। চরমোনাইয়ের খাস মুরিদ ছিল। ফানা ফিশ শায়েখ ছিল। আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি যা বলতেন, নির্বিঘ্নে মেনে নিতেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করতেন না। ১৯৯১

সালে আব্বাজান বললেন, তাফাজ্জুল হোসেন সাহেব, -উনার বাড়ি হলো মুন্সিগঞ্জ- আপনি গিয়ে নির্বাচন করেন। বলল, হুজুর, আমার বাড়ি তো মুন্সিগঞ্জ, থাকি আমি চট্টগ্রামে। আমাকে কেউ চিনে না। আমি কী নির্বাচন করব? আব্বাজান বললেন, যান মিয়া, জিহাদের নিয়তে দাঁড়াইয়া যান। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেননি। উনি চলে গেলেন। যাওয়ার পরে উনি পোস্টার ছাপাইয়া বললেন, ভাই, আমি নির্বাচন করতে আসিনি। হুজুর বলছে, ইসলামের বাক্স নিয়ে জিহাদে শরিক হয়ে যাও। আমি জিহাদ করার জন্য আসছি। ১৯৯১ সাল। তার নিজের প্রতিষ্ঠিত এক মাদরাসার সামনে এরকম নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তার বুকের ভিতর পেইন উঠল। তিনি বললেন, আমাকে একটু ভিতরে নিয়ে যাও। ধরাধরি করে তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। কালিমা পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর পড়ল, দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। তাকে দাফন করা হলো। মুন্সিগঞ্জ+ পদ্মানদী ভেঙে গেছে, আপনারা জানেন। বহু জায়গা ভেঙে গেছে। চার বছর আট মাস পর পদ্মার ভাঙ্গনে যখন তার কবর ভেঙে গেল, দেখা গেল, তার কবরের ভেতর লাশ **একেবারে তাজা, একবোরে তাজা!**

আমরা নির্বাচন করি না, আমরা জিহাদ করি। আমরা কী করি? এটা নির্বাচন নয়, এটা আমাদের জিহাদ। এই জিহাদে যারা অংশগ্রহণ করবে তারাই হলো মুজাহিদ। এতে যারা খরচ করবেন, সময় দেবেন, সবকিছু করবেন, তাদের প্রত্যেকটা সময়, প্রত্যেকটা সেকেন্ড আল্লাহর দরবারে নেকের মধ্যে লেখা হতে থাকবে।

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانط لا يقتر من صيامه ولا صلاته حتى يرجع المجاهد في سبيل الله

মুজাহিদ যতক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমলনামায় সওয়াব লেখা হইতে থাকবে। এই মুজাহিদ কোন মুজাহিদ? যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করার জন্য সাধনা করবে তারাই হলো এই মুজাহিদের অন্তর্গত। যারা অন্য কোনো কাজ করার জন্য নামবে তারা এই হাদিসের মেসদাক (প্রয়োগক্ষেত্র) এর মধ্যে পড়তে পারে না। এত সহজ মনে করবেন না। কী, কথা ঠিক না?

সূত্র :

https://m.youtube.com/watch?v=KvelZpqFd২Q (ভিডিওর শেষের অংশ)

খণ্ডন : এ বক্তব্যের প্রথমে আপনি নির্বাচনকে জিহাদ বলে ঘোষণা দিলেন। তারপর সপক্ষে দলিল দিলেন, একজন প্রার্থী নির্বাচনের প্রচারণার সময় মারা গেলে, চার বছর পর তার কবর খোঁড়া হলে দেখা গেল, তার লাশ পঁচেনি। এরপর সর্বশেষ দাবি করলেন, যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে, তারাই একমাত্র মুজাহিদ, অন্য কোনো পদ্ধতিতে কাজ করলে তারা মুজাহিদ বলে বিবেচিত হবে না। এজন্য নির্বাচনকালীন ব্যয় হওয়া প্রতিটি টাকা, সময় ও শ্রম সব জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখানে প্রথম যে তাহরিফ করলেন, সেটা হলো কুফরি সিস্টেমকে শুধু ভালো নিয়তে ব্যবহারের কারণে জিহাদ বলে দাবি করলেন। আপনি কি জানেন, জিহাদের শরয়ী সংজ্ঞা কী? প্রকৃত অর্থে জিহাদ তো সশস্ত্র সংগ্রামকেই বলে। অর্থাৎ কিতাল ও শরয়ী জিহাদের অর্থ একই। ফুকাহায়ে কিরাম জিহাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে :

هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى

অর্থাৎ সীমলঙ্ঘনকারী যোদ্ধা কাফির বা ধর্মত্যাগী বা বিদ্রোহী বা এ জাতীয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রামাকে জিহাদ বলা হয়। চার মাজহাবের ফকিহ ও মুহাদ্দিস সবাই এমন সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন। দেখুন – বাদাইউস সানায়ি : ৭/৯৭, ফাতহুল বারি : ৬/২, মুনতাহাল ইরাদাত : ২/২০৩, আল-ইকনা : ২/৬১, আর –রাওজুল মুরবি : ৪/২৫৩, সুবুলুস সালাম : ৭/৩৩৭, নাইলুল আওতার : ৫/৬, আল-মুগনি : ১৩/১০, আল-মুকনি মাআশ শরহিল কাবির : ১০/১২, আশ-শারহুল মুমতি : ৮/৮ এছাড়াও ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসিনে কিরাম 'জিহাদের অধ্যায়' বলে যে শিরোনাম দেন, তাতে কি কখনো দেখেছেন, সশস্ত্র জিহাদ ছাড়া তাতে আভিধানিক বা হুকমি জিহাদের কোনো মাসআলা বা হাদিস বর্ণনা করেছেন? এতে কি স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা জিহাদ বলতে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামকেই বুঝিয়েছেন? সবাই জিহাদ মানে এটাই বুঝেছে। কিন্তু আপনি জিহাদকে এমন এক

অর্থে ব্যবহার করে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন, যার সাথে শরয়ী অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই।

আপনি বলতে পারেন, এটা শরয়ী অর্থে জিহাদ না হলেও আভিধানিক অর্থে বা হুকমি অর্থে তো জিহাদ ঠিক আছে। তাহলে এতে দ্বীনের বিকৃতি কীভাবে হলো? আমি বলব, আপনি যখন কোনো বিধানের ব্যাপারে কথা বলবেন, তখন তথায় তার পারিভাষিক বা শরয়ী অর্থই উদ্দেশ্য হয়, আভিধানিক অর্থ নয়। যেমন আপনি বললেন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। এখানে কেউ যদি এ কথাটি এভাবে প্রচার করে যে, দৈনিক পাঁচবার নিতম্ব দোলানো (নাচানাচি করা) ফরজ, তবে আপনি কি তাকে বিকৃতিকারী বলে অভিহিত করবেন না? অবশ্যই করবেন। কারণ, আভিধানিকভাবে 'সালাত' এর একটি মূলক্রিয়ার অর্থ নিতম্ব দোলানো হলেও এখানে তার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আপনি এখানে যে জবাব দেবেন, আমরা আপনার উত্থাপিত কথার জবাবেও তাই-ই বলব। অনুরূপ জিহাদ যদি আভিধানিক অর্থেই নিতে চান, তাহলে তো কুফরের জন্য প্রচেষ্টাকেও তো কুরআনে আভিধানিক অর্থে জিহাদ বলেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে প্রচেষ্টা চালায়, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।' (সুরা লুকমান: ১৫)

তাহলে কুফরের জন্য প্রচেষ্টা করাকে কি আপনি জিহাদ বলবেন? কুরআনে তো এখানে 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহার করেছে। তাই শরয়ী মাসআলা বয়ানের জায়গায় আভিধানিক অর্থ প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই।

যদি বলতে চান, দ্বীন কায়েমের জন্য যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রকৃত শরয়ী অর্থে জিহাদ বলা না হলেও হুকমিভাবে তো জিহাদ বলা যেতে পারে।

আমি বলব, প্রথমত সেটার জন্য আপনার চয়িত পন্থাটি শরিয়া অনুমোদিত হতে হবে। আপনি যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে হুকমি জিহাদ বলতে চাচ্ছেন, তা তো শরিয়া অনুমোদিত প্রচেষ্টাই নয়। কুফরমিশ্রিত পদ্ধতি কীভাবে দ্বীন কায়েমের পথ

হতে পারে!?? শুধু নিয়ত ভালো থাকার কারণে যদি কোনো নাজায়িজ কাজ জায়িজ হতো, তাহলে তো সুপথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বেশ্যাখানায় যাওয়া এবং প্রয়োজন হলে তাদের সাথে বিছানায় যাওয়াও জায়িজ হয়ে যাবে। কারণ, কাজ ও পন্থা হারাম হলেও উদ্দেশ্য বা নিয়ত তো ঠিক আছে!! এটাই কি আপনার ইসলাম? আপনার শরিয়ত কি এমন কাজের আদেশ বা অনুমোদন দিতে পারে?? দ্বিতীয়ত, হুকমি জিহাদ হলে সেটাকে এত প্রচার ও মানুষকে এটার প্রতি এত আহবান করা হচ্ছে কেন? এটা যে আসল জিহাদ নয়, এ কথা কি আপনার মুখ থেকে একবারও বের হয়েছে? আসল জিহাদের ব্যাপারে নীরব থেকে শুধু আপনার হুকমি জিহাদের জন্য এত জোরপ্রচেষ্টা কেন? আসলটার জন্যই কি আপনার অধীক প্রচেষ্টা থাকা উচিত ছিল না? আগুনে পুড়ে বা পানিতে ডুবে মারা গেলে সে হুকমি শহিদ। তাই বলে কি আপনি আল্লাহর কাছে এ দুআ করতে পারবেন যে, আল্লাহ, তুমি আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারো, আমাকে পানিতে ডুবিয়ে মারো? আপনি কিন্তু এ দুআ করেন না, এমন দুআ কোনো মুমিন করতে পারে না। এখানে দুআ করা হয়, হে আল্লাহ, আমাকে জিহাদের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত দান করুন। কারণ, সবাই জানে যে, এটাই আসল শাহাদত। আর অন্যগুলো হুকমি বা শুধু সান্ত্বনামূলক শাহাদত, আসল শাহাদত নয়।

তৃতীয়ত, আপনি এটা হুকমি জিহাদ বললে আসল জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলছেন কেন? আপনি আসল জিহাদ করতে পারছেন না, সেটা আপনার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু যারা এ কাজ করছেন এবং কাফির ও তাগুতদের জন্য ভীতি সৃষ্টি করছেন, তাদেরকে সন্ত্রাসী বলার কোনো অধিকার আপনার নেই। আপনার জিহাদে তাগুত ভয় পায় না। কারণ, তারা জানে, এটা আসল জিহাদ নয়। এ জিহাদের দ্বারা আপনি তাদের একটি পশমও নাড়াতে পারবেন না। তাই তাদের পছন্দনীয় এ জিহাদ তারা আপনাকে খুশি মনেই করতে দেবে। কিন্তু আসল জিহাদ যারা করছে, তাদের সামান্য একটি ধুলিকণার সমানও হবে না আপনার জিহাদ। কারণ, তাদের কুরবানি আর রক্তের কারণেই তাগুতের দৃষ্টি আপনার পর্যন্ত এখনও পৌঁছেনি। তাঁরা না থাকলে আজ আপনাদের জান আর মা-বোনদের ইজ্জত ঠিক থাকত কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর এসব কোনোমতে ঠিক থাকলেও ইসলামের কোনো বিধান পালন করতে পারতেন না। বৈশ্বিক বিষয়ে খবর না রেখে, বাস্তবতা

না বুঝে কিছু মুরিদের সামনে কয়েকটা গরম বক্তৃতা করলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যায় না। এর জন্য চাই রাসুলের দেখানো পথে আপনার তপ্ত রক্ত। আপনি রাসুলের সে দেখানো পথেও নেই, আবার তপ্ত রক্ত দেওয়ার ময়দানেও নেই; তাহলে এটা কীসের জিহাদ। এমন নকল জিহাদের বয়ান দিয়ে উম্মতকে বিভ্রান্ত করবেন না। মানুষের আবেগকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গোছানোর ফিকির করবেন না। জনসাধারণের ইসলামপ্রিয়তাকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। এসব বন্ধ করুন। এবার সত্য জানার সময় চলে এসেছে। হকের আলোয় আপনাদের তাহরিফ বা দ্বীন বিকৃতির বিবরণ প্রকাশ হওয়া শুরু হয়েছে। আল্লাহ আপনাদের সত্যের পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন।

৩ নং মন্তব্য : গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক জিনিস নয়। গণতন্ত্র আর নির্বাচনের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য। এ জায়গায় আমরা ভুল ধারণা করি। গণ মানে জনগণ, তন্ত্র মানে আইন। জনগণের আইন। তার মানে বাই দ্যা পিপল, অব দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল। আর আমরা কী বলতেছি? বাই দ্যা আল্লাহ, অব দ্যা আল্লাহ, ফর দ্যা আল্লাহ। আমি তো আগেই বলেছি, আমি গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চাই না। আমাকে নির্বাচিত করো, আমি ইসলাম বাস্তবায়ন করতে চাই। তো আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এটা আপনাকে বলছে কে? এটা ভুল থিম। এখানেই মারাত্মক ভুল। বরং বর্তমান জমানায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামি হুকুমত কায়েম করা খুবই কঠিন, মহাল, সম্ভব নয়। আমি তো আগেই বলেছি, আমাকে নির্বাচিত করো, আমি কী বাস্তবায়ন করব? ইসলাম। তো আমি গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করব, এটা আপনি পেলেন কোথায়? এটা কোথায় পেলেন আপনি? বরং বর্তমান জমানায় সশস্ত্র বিপ্লবর মাধ্যমে ইসলামি হুকুমত কায়েম করা খুবই কঠিন, মহাল, সম্ভব নয়।

সূত্র : https://m.youtube.com/watch?v=pUrhv৫Ymwbw
(ভিডিওর প্রথম অংশ)

খণ্ডন : আপনি গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক জিনিসি নয় বলে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? এটা তো কমন বিষয় যে, গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক জিনিস নয়। আপনার কথা থেকে বুঝা যায়, গণতন্ত্রে কুফরি নীতি থাকায় তা কুফরি ঠিক আছে। কিন্তু নির্বাচনে তো কোনো কুফরি নেই। আর এ নির্বাচনে জেতার পর যেহেতু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করা হবে না; বরং ইসলামি হুকুমত কায়েম করা হবে, তাই গণতন্ত্রের মতো নির্বাচনকেও কুফরি বলা ভুল ধারণা।

আমি বলি, এটাও আপনার চরম এক ভ্রান্তি যে, নির্বাচনকে গণতন্ত্রের হুকুম থেকে ভিন্ন কিছু ভাবা। এমনিতে নির্বাচন শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু নির্বাচন যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়, নির্বাচনে যদি কুফরি তন্ত্রের মিক্স থাকে, তাহলে এটাকে সাধারণ নির্বাচন বলে জায়েজ বলার কোনো অবকাশ নেই। আপনি যখন গণতান্ত্রিক সিস্টেমে নির্বাচনে অংশ নিবেন, তখন তো আপনাকে গণতন্ত্রের সকল রুলস ও নীতিমালা মেনেই মনোনয়ন নিতে হবে। আপনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান বলে তাদের লিখিত স্বীকৃতি দিতে হবে। আপনি গণতন্ত্র রক্ষায় একজন আদর্শ সৈনিক হবেন বলে বক্তৃতাও করতে হবে। এসব কি কুফর নয়? এগুলো কি কুফরকে প্রমোট করা নয়?? বাহ্যক দৃষ্টিতে হলেও এসব কি তাগুতদের পাল্লাকে ভারী করা নয়???

এখানে আপনার জন্য কুফরে লিপ্ত হওয়া কেন জায়েজ হবে? শরিয়তের কোন মূলনীতির আলোকে আপনার জন্য এখানে কুফরে লিপ্ত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? শুধুমাত্র ইকরাহ বা অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হলেই তো কুফরে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আপনাকে এখানে কে অস্ত্রের মুখে কুফরে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে? ভালোর মন্দ নীতি যে এখানে প্রযোজ্য নয়, তা আমি পূর্বে আরেকটি লেখায় দলিলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করেছি।

অতএব, গণতন্ত্র আর নির্বাচনকে ভিন্ন প্রমাণ করে আপনি উভয়ের বিধান আলাদা করার যে পাঁয়তারা করেছিলেন, তা সফল হলো না। মুল কুফর হলে তার শাখাও তো কুফরই হবে। আপনি গণতন্ত্রকে কুফর বলে স্বীকার করছেন, অথচ তার শাখা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে কুফর বলে স্বীকার করছেন না; বরং জায়েজ বলছেন! বড় আজিব আপনার ফতোয়া!!

আর আপনি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিলেন, তা তো গণতন্ত্র নয়। এটা আপনার নিজস্ব একটি সংজ্ঞা। আপনি যখন গণতন্ত্রের রুলস ভেঙে আপনার মতো করে রাষ্ট্র চালাবেন, তখন আপনি কী করে ভাবলেন যে, গণতন্ত্রের তল্পীবাহকরা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে? আমেরিকা, ইংল্যান্ড কেন বসে থাকবে? ভারত কেন আপনার কথা মেনে নেবে? আপনি কি এদের মোকাবেলা করে আপনার

রাজত্ব টিকিয় রাখতে পারবেন? কক্ষনো পারবেন না। একদিনও পারবেন না। মুসলিম ব্রাদারহুড সর্বদিক থেকে আপনাদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে ও শক্তিশালী। তারা গণতন্ত্রের রুলস ভাঙার ঘোষণাও দেয়নি। জাস্ট কয়েকটা আইন ইসলামি করেছিল। একবছরও টিকল না। আপনি যদি মনে করেন, কয়েক বছর শাসন করে ভেতরে ভেতরে নিজেদের শক্তি অর্জন করে নেব। তো আমি বলব, আপনি এটা করতে পারবেন না। কারণ, এটা গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র নয়। আপনাকে দেশের আইন মেনেই সব করতে হবে। গোপনে তেমন কিছুই করতে পারবেন না। তাছাড়াও আপনি যে কয়েক বছর এ প্রস্তুতি নিবেন, সে কয়েক বছর তো আপনাকে কুফরি সিস্টেমেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র বানানোর উদ্দেশ্যে আপনার জন্য কি এভাবে লাগাতার কুফরি জারি রেখে, শত কুফরের আইনে সম্মতি জানিয়ে, কুফরের মধ্যে দিনরাত কাজ করার অনুমতি আছে? এভাবে আদৌ হবে না, এটা আপনিও বুঝবেন। এটার জন্য আপনার আইনাস্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আপনাদের এসব লম্পঝম্প আখেরে তো সব বৃথাই যাবে। আর আপনি যে সশস্ত্র সংগ্রামকে অসম্ভব ভাবছেন, তা অনেক আল্লাহর বান্দা সম্ভব করে দেখাচ্ছেন, যারা আপনার মতো এত হিকমতি আর দুর্বল চিত্তের অধিকারী নয়। অতএব, আপনার এসব অলীক কল্পনার ফানুস দিয়ে আপনার কুফরি তন্ত্রকে ইসলাম কায়েমের মাধ্যম বানানোর অনুমোদন কিছুতেই হতে পারে না।

৪ নং মন্তব্য : আর সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য শর্ত হলো স্বকীয়তা এবং সতন্ত্রতা, গোপনীয়তা। আর বর্তমান জমানায় গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই কঠিন, জটিল এবং মহাল। এটা সম্ভব নয়। এজন্য দেখেন, গোটা দুনিয়ায় বর্তমানে সশস্ত্র বিপ্লব টিকেনি, টিকতে পারে না। এজন্য পূর্ব বাংলাদেশ কমনিস্ট পার্টি, সর্বোহারা সাকসেস হতে পারেনি। বরং আমাদের দেশের যে সমস্ত সন্ত্রাসরা ইসলামকে সামনে নিয়ে ইসলামকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছে, তারাও টিকতে পারেনি। তাদের বাচ্চা ও পোনা ডিমসহ সব এরেস্ট হয়ে গেছে।

তাহলে কি ইসলাম বন্ধ হয়ে যাবে? না, ইসলাম বন্ধ হবে না। মোকাবেলায় আরেকটা চলে আসবে। সেটা কী? বর্তমানে সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হলো নির্বাচন। নির্বাচনের চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি দেখছি না। ইখতিলাফ নেই। সমস্ত উলামায়ে কিরামের ইজমা হয়ে গেছে। আপনি ইখতিলাফ করছেন কেন?

পাকিস্তানের উলামায়ে কিরামের ইজমা, ভারতের উলামায়ে কিরামের ইজমা, বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের ইজমা। গোটা দুনিয়ার উলামায়ে কিরামের এখন নির্বাচনের ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, জিহাদ শব্দের অর্থই তো 'আল-জিহাদু হুয়াদ দুআউ ইলা দ্বীনিল হক'। জিহাদ তো দ্বীনে হকের দিকে দাওয়াত দেওয়া। আর নির্বাচনের মাধ্যমে যত সুন্দরভাবে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যায়, এত সুন্দর পদ্ধতি বর্তমানে দ্বিতীয় কোনোটি নেই। ঘরে ঘরে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া যায় নির্বাচনের মাধ্যমে।

সূত্র :https://m.youtube.com/watch?v=pUrhv৫Ymwbw (ভিডিওর মাঝের অংশ)

খণ্ডন : মানতেকের কিতাবে পড়ানো হয়, "জগত পরিবর্তনশীল। আর সব পরিবর্তনশীল বস্তু ধ্বংসশীল। অতএব বিশ্ব ধ্বংসশীল।" সুন্দর যুক্তি। কারণ, কথাগুলো বাস্তব। এর ভিত্তি আছে। তাই ফলাফলও সঠিক এসেছে। আপনিও সম্ভবত এ ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। প্রথমে বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা শর্ত। আর বর্তমান যুগে স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা সম্ভব নয়। অতএব বর্তমানে যুগে সশস্ত্র সংগ্রামও সম্ভব নয়। বাহ! এত সুন্দর যুক্তি!! এত মানতেকের প্রয়োগ!!!

প্রথম কথা হলো, আপনি কোথায় পেয়েছেন যে, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা শর্ত। এটা ফিকহের কোন কিতাবে আছে? কোন ফকিহ বলেছেন? নাকি এটা আপনার বানানো শর্ত? আপনার বানানো শর্ত হয়ে থাকলে এটাকে মানুষের কাছে শরিয়তের শর্ত বলে প্রচার করছেন কেন? এটা কি স্পষ্ট ধোঁকাবাজি নয়??

দ্বিতীয়ত, আপনি নিজের দাবির পক্ষে দলিল দিয়েছেন যে, গোটা দুনিয়ায় বর্তমানে নাকি সশস্ত্র বিপ্লব টিকেনি এবং টিকতে পারে না। এটা বলে আপনার নিজের মূর্খতা প্রকাশ না করলেও পারতেন। নিজেদের ব্যর্থতা অন্যদের ওপর চাপাচ্ছেন কেন?? আপনাকে কে বলল, পৃথিবীর কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম নেই বা থাকলেও টিকে থাকতে পারছে না। তাহলে বর্তমান বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ভূমি যেসব সশস্ত্র যোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণ করছে, সেগুলো কি

পৃথিবীর মানচিত্রের বাহিরে? এসব যোদ্ধাদের উত্থান তো বেশিদিন হয়নি, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছর হলো। এরই মধ্যে তারা দুনিয়ার তাবৎ তাগুতি শক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশাল বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামি শাসন চালু করেছে। আর আপনাদের ইসলামি গণতন্ত্রের যাত্রার আজ প্রায় শতবর্ষ হতে চলল। আজ পর্যন্ত কি পৃথিবীর এক বর্গকিলোমিটার ভূমিতেও ইসলামি শাসন কায়েম করে দেখাতে পেরেছেন? এটা তো চরম ব্যর্থতা ও নিচু মানসিকতার পরিচায়ক যে, নিজেদের ভুল স্বচক্ষে দেখার পরও তা থেকে ফিরে তো আসছেনই না; উল্টো যারা সহিহ মানহাজে কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী ও ব্যর্থ বলে নিজেদের লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করছেন!! ধিক্কার জানাই এমন মানসিকতাকে। ঘৃণা করি এমন জঘন্য অপবাদকে। সত্যের আলো দেখেও যারা না দেখার ভান করে, তাদের চেয়ে হতভাগা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

এরপর আপনি বিশ্ব প্রেক্ষাপটকে বাংলাদেশের সর্বোহারা, কমিউনিস্ট ইত্যাকার বাহীনির সাথে মিলিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এসবই হলো সন্ত্রাসবাদ এবং এ পথে কোনোদিন সফলতা আসবে না। আপনার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এত দুর্বল, আপনার এসব বয়ান না শুনলে হয়ত কোনোদিনও জানা হতো না। এটা ঠিক যে, বাংলাদেশে যারা কাজ করেছে, তাদের কৌশলগত কিছু ভুল ছিল, তাই বলে আপনি তাদের প্রতি ঘৃণার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন, তা সত্যিই ঘৃণাযোগ্য। তারা কৌশলগত কিছু ভুল করলেও আপনাদের মতো কুফরি তন্ত্রকে বেছে নেয়নি। আর বৈশ্বিক একটি আন্দোলনকে আপনি বিচ্ছিন্ন দুএকটি ঘটনা দ্বারা পরিমাপ করার অধিকার রাখেন না। করলে তা হবে আপনার চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দিন।

এরপর আপনি সশস্ত্র জিহাদকে আপনার যুক্তিতে অসম্ভব প্রমাণ করে দাবি করলেন যে, বর্তমান সময়ে নির্বাচন হলো সবচেয়ে সহজ ও উত্তম পদ্ধতি। আর এ মাসআলায় নাকি উম্মতের ইজমা হয়ে গিয়েছে।

আপনার এসব হাস্যকর উক্তির খণ্ডন করার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ইজমা কাকে বলে, তা কি জানেন? গোটা দুনিয়ার ইজমা বলতে আপনি কাদের কথা বলতে চাচ্ছেন? কয়েকটি মাদরাসার ফতোয়া পেলেই ইজমা হয়ে যায়? আপনি কি জানেন, আরব, মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়াসহ ভারত,

পাকিস্তান, বাংলাদেশেরও অসংখ্য প্রথিতযশা প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরাম রয়েছেন, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে নাজায়িজ বলেন? আপনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে বলতে পারতেন যে, তারা এ ব্যাপারে এমন ফতোয়া দিয়েছে। তা না করে আপনি আপনার মতের পক্ষে হওয়ায় আংশিকের ফতোয়াকে সবার ফতোয়া বলে অপপ্রচার করছেন! এটাই কি আপনার ইলমি আমানত? এমন ডাহা মিথ্যারোপ বা অজ্ঞতাসূচক মন্তব্য করে নিজের প্রতি কেন জুলুম করছেন? এসব মিথ্যারোপ কবে বন্ধ হবে?

শেষে আপনার বানানো জিহাদের সংজ্ঞা ছুড়ে নিজের মত প্রমাণের চেষ্টা করলেন। আপনি জিহাদের এ সংজ্ঞা কোথায় পেয়েছেন? শুধু দ্বীনে হকের দিকে দাওয়াত দিলেই জিহাদ হয়ে যায়? নাকি এখানে যুদ্ধের শর্ত আছে? ফিকহের কিতাব কখনো খুলে দেখেছেন? সংজ্ঞা না জেনে শরিয়তের কোনো বিধানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কি দ্বীনের সুস্পষ্ট বিকৃতি নয়?

ফুকাহায়ে কিরাম জিহাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে :

هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى

অর্থাৎ সীমলঙ্ঘনকারী যোদ্ধা কাফির বা ধর্মত্যাগী বা বিদ্রোহী বা এ জাতীয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রামাকে জিহাদ বলা হয়। চার মাজহাবের ফুকাহা ও মুহাদ্দিস সবাই এমন সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন। দেখুন – বাদাইউস সানায়ি : ৭/৯৭, ফাতহুল বারি : ৬/২, মুনতাহাল ইরাদাত : ২/২০৩, আল-ইকনা : ২/৬১, আর –রাওজুল মুরবি : ৪/২৫৩, সুবুলুস সালাম : ৭/৩৩৭, নাইলুল আওতার : ৫/৬, আল-মুগনি : ১৩/১০, আল-মুকনি মাআশ শরহিল কাবির : ১০/১২, আশ-শারহুল মুমতি : ৮/৮ এছাড়াও ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসিনে কিরাম 'জিহাদের অধ্যায়' বলে যে শিরোনাম দেন, তাতে সবাই সশস্ত্র জিহাদের আলোচনাই আনেন। এতে অন্যসব হুকমি বা আভিধানিক জিহাদের আলোচনা আনেন না। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে একটু পূর্বে খণ্ডন করা হয়েছে।

৫ নং মন্তব্য : গণতন্ত্র বেসিক একটি আদর্শ। একটা নীতি। যার মূল থিম হলো বাই দ্যা পিপল, অব দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল। আর নির্বাচন হলো, নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি। নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি আর গণতন্ত্র এক জিনিস নয়। মনে রাখতে হবে ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়া পদ্ধতি যদিও এক হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য এক হয় না। দেখেন, হুজুর পাক সা. মাঠে আসছেন, আবু জাহিলও মাঠে আসছে। আমার নবির ঘোড়া ছিল, আবু জাহিলেরও ঘোড়া ছিল। আমার নবির উট ছিল, আবু জাহিলেরও উট ছিল। আমার নবির তলোয়ার, আবু জাহিলের তলোয়ার, আমার নবির পক্ষের লোকের রক্তক্ষরণ হয়েছে, আবু জাহিলেরও রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমার নবির পক্ষের লোক শাহাদত বরণ করেছে, আবু জাহিলের লোক মারা গেছে। বাহ্যিক দিক সমান। যুদ্ধ সমান, সব সমান। কিন্তু একটাকে সন্ত্রাসবাদ আর অন্যটাকে সন্ত্রাসবাদ বলি কেন? কারণটা কী? বাহ্যিক তো সমান। ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি প্রক্রিয়া সমান হয়। মুসা আ.-এর সাথে ফেরাউনের যুদ্ধ সমান, নমরুদের সাথে নবি ইবরাহিমের যুদ্ধ সমান। তালুত জালুতের যুদ্ধ সমান হয়। হুকুমত কায়েম করার পদ্ধতি সবসময় এক হয়, উদ্দেশ্য এক হয় না। আমরা অনেকেই মনে করি, নির্বাচনটা কুফরি, অমুকের পদ্ধতি। আরে ভাই, পদ্ধতি যেকোনোটা যার তার থেকে আসতে পারে। হিন্দুর তলোয়ার এটা, এই তলোয়ারটা আবু জাহিলের। এখন আবু জাহিলের তলোয়ার দিয়ে কোনো মুসলমান যদি কাউকে মারে, তাহলে সে কি সওয়াব পাবে না? খন্দক। খন্দকের এ প্রক্রিয়াটি কার? পারস্যের, মাজুসিদের। এটা ওহির মাধ্যমে হয়নি। তো অগ্নিপূজকদের পদ্ধতি অবলম্বন করলে যদি ফজিলত হতে পারে, সেটা ইসলাম হতে পারে, তাহলে এখন যে পদ্ধতিটি ইসলামি হুকুমত কায়েম করে বা যেকোনো গণতন্ত্র বা সেকুলারের হুকুমত কায়েম করে, পদ্ধতি একই হয়, উপরে ওঠার সিঁড়ি একটাই, কিন্তু উপরে কামরা একটা নয়। একটা হলো সিনেমা, আর একটা হলো মসজিদ। তবে উপরে ওঠার পদ্ধতি একটাই। এখন আপনি সিনেমায়ও যেতে পারেন, মসজিদেও যেতে পারেন। যদি মসজিদে যাওয়ার জন্য উপরে ওঠেন, সওয়াব হবে, আর যদি সিনেমায় যাওয়ার জন্য ওঠেন, গোনাহ হবে। আপনি বলতে পারেন, হুজুর, তাহলে আপনি এই গণতন্ত্রের এই দেশে? আরে ভাই, আপনি তো গণতন্ত্রের এই দেশেই আছেন। আপনি বিবাহ করছেন কোন আইনে? আপনার মাদরাসা চলে কোন আইনে? আপনার মসজিদ চলে কোন আইনে? আপনি যে কেসে পড়ছেন, কোন আইনে

চলে? আপনি মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন কোন আইনে? আপনার সব গণতন্ত্র, তখন গণতন্ত্রের কোনো প্রশ্ন আসে না। কিন্তু যখনই নির্বাচন আসে, তখনই এই প্রশ্ন করেন কেন? এই প্রশ্ন আপনার নয়, এ প্রশ্ন ইহুদি এবং হিন্দুদের, নাস্তিকদের। কারণ হলো, তুমি তো গণতন্ত্রের মধ্যেই আছ। সেখানেই তুমি থাকো। এই প্রশ্ন তোমাকে ক্ষমতায় যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু তোমাকে এই প্রশ্ন ক্ষমতায় যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে। এজন্য এখানে এসে ওরা বলে, এটা গণতন্ত্র, এটা গণতন্ত্র। বলি, এটা গণতন্ত্রের মাতাহাতে। আমরা সবাই গণতন্ত্রের মাতাহাতে। এদেশে মাদরাসা-মসজিদ, এদেশে বিবাহ-শাদি, কেস-কাচারি, আমি। আমার প্রাইম মিনিস্টার কে? শেখ হাসিনা। আমার অর্থমন্ত্রী কে? আবুল মাল আব্দুল মুহিত। কাজেই আমি তো এখানেই আছি। গণতন্ত্রের মাঝখানে। এখান থেকে আমার বের হওয়ার সুরত কী? বরং আমি বের হতে চাই, তুমি বের হতে চাও না। আমি বলি, এটা পদ্ধতি। ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি এক হয়। যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়, তাহলে আমারটা জিহাদ হবে। আর ওদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, ওরা টেরোরিস্ট, ওদেরটা হবে টেরোরিজম।

সূত্র : https://m.youtube.com/watch?v=m৯৯Y২G-rk২A (ভিডিওর প্রথম ও শেষ অংশ)

খণ্ডন : এ মন্তব্য করে নিজের মূর্খতার সব ডালা খুলে দিলেন! আপনার ব্যাপারে এমন কথা বলতাম না। কিন্তু আপনার যুক্তি আর কিয়াসের যে অবস্থা, যুক্তিদের বাকশক্তি থাকলে হয়ত তারাও হেসে ফেলত। এমন প্রশ্ন কিছু মূর্খরা করে থাকে যে, আপনি এত ইহুদি, খ্রিষ্টানদের বিরোধিতার কথা বলেন, তাহলে তাদের আবিস্কৃত মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করেন কেন???

আপনার যুক্তি হলো, যেহেতু কাফিররা যে অস্ত্র ব্যবহার করবে, মুসলমানদেরও সে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি আছে, তাহলে কাফিররা যখন আমাদেরকে নির্বাচন দিয়ে মোকাবেলা করবে, তখন আমরাও তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন দিয়ে মোকাবেলা করব। তারা তলোয়ার ব্যবহার করলে যেমন আমরা তলোয়ার ব্যবহার করি, তারা ঘোড়া ব্যবহার করলে যেমন আমরা ঘোড়া ব্যবহার করি, তারা মাঠে আসলে যেমন আমরা মাঠে আসি, ঠিক তেমনই তারা নির্বাচন করলে আমরাও নির্বাচন করে তাদের মোকাবেলা করব। আপনি উভয়ের মাঝে পার্থক্যের মূল পয়েন্টটি নির্ধারণ

করেছেন নিয়ত বা উদ্দেশ্য। তারা যেহেতু কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য এসব মাধ্যম ব্যবহার করে, তাই তাদের কাজ সন্ত্রাসবাদ। আর আমরা এসব ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করছি, তাই এটা ইসলামি এবং আমাদের সবকিছু জিহাদ।

আমি বলি, আপনি মূল পয়েন্ট ভুলে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছেন, না আপনি বুঝছেন আর না আপনার অন্ধ ভক্তরা তা উপলব্ধি করতে পারছে। আমাদের মূল পয়েন্ট ছিল, নির্বাচন করলেও এ থেকে কুফর এখনও দূর হয়নি। এতে কুফর মিশে আছে। অস্ত্র ব্যবহারকে তো কেউ কুফর বলেনি। যেটা কুফর নয়, সেটার সাথে যেটা কুফর সেটাকে কেন মেলাচ্ছেন?

আপনার কথা থেকে বুঝা যায়, কাফিররা যে মাধ্যম ব্যবহার করে আমাদের মোকবেলা করবে আমরা সে মাধ্যম ব্যবহার করেই তাদের প্রতিরোধ করব। তাহলে কাফিররা সুন্দরী নারী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের মোকাবেলা করলে কি আমরাও তাদের বিরুদ্ধে সুন্দরী মুসলিম নারী ব্যবহার করে মোকাবেলা করব? এতে কি এসব নারীরা জিহাদের সওয়াব পাবেন? এটা কি জায়িজ হবে? যদিও এখানে ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়; বরং শত্রপক্ষের মোকাবেলা ও কৌশল জেনে নেওয়া উদ্দেশ্য হয়। এ ব্যাপারে হয়ত আপনিও বলবেন, না, এভাবে মোকাবেলা করা জায়িজ নয়। কারণ, ব্যভিচার পরিষ্কার হারাম। তো এখানে যদি ইসলামের স্বার্থে হলেও মুসলিম নারীদের ব্যবহার করা জায়িজ না হয় তাহলে ইসলামের স্বার্থে কুফরে লিপ্ত হওয়া কী করে জায়িজ হবে? এটা তো আরও কঠিন, আরও মারাত্মক। কারণ, সেটা ছিল হারাম, আর এটা তো কুফর। সুতরাং আপনার এ মূলনীতি 'নিয়ত ঠিক থাকলে কাফিরদেরকে যেকোনো মাধ্যম দিয়ে মোকাবেলা করা যায়' স্পষ্ট ভুল ও চরম এক ভ্রান্তি।

এরপর আপনি বোকার মতো কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমাদের দেশের সবই তো গণতান্ত্রিক আইনে হয়। বিবাহ-শাদি, মসজিদ-মাদরাসা, কেস-কাচারি ইত্যাদি। এরপর বলেছেন, যারা নির্বাচনের সময় গণতন্ত্রের ব্যাপারে কথা বলে, এটাকে কুফরি মতবাদ বলে প্রচার করে, তাদেরকে আপনি বলছেন, এটা নাকি ইহুদি ও হিন্দুদের প্রশ্ন। এটা কোনো মুসলমানের প্রশ্ন হতে পারে না। আমি বলি, বিষয় বরং উল্টো। যারা গণতন্ত্রকে কুফরি এবং এতে শরিক হওয়াকে নাজায়িজ মনে করে, তাদের দলিলভিত্তিক জবাব না দিয়ে তাদের প্রশ্নকে ইহুদি-

নাসারার প্রশ্ন বলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? এটা আবার ইহুদিদের কোনো চাল নয় তো? আমি এমন সন্দেহ করতেই পারি। কারণ, আপনাকে যখন কোনো মুমিন কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, এটা কুফরি, তখন আপনি পারলে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে তার বক্তব্য খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রমাণ করতে পারেন। এ অধিকার আপনার অবশ্যই আছে। কিন্তু আপনি তা না করে উল্টো তার প্রশ্নকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দিচ্ছেন। তার নসভিত্তিক আপত্তিকে আপনি বিধর্মীদের আপত্তি বলে প্রচার করছেন! তাহলে তো আপনার ব্যাপারেই এ সন্দেহ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। আল্লাহ আমাদের এমন জঘন্য মন্তব্য করা থেকে হিফাজত করুন। শেষে আবারও নিয়তকে মূল বানিয়ে যেকোনো মাধ্যম গ্রহণ করার যুক্তি দেখিয়েছেন, যা পূর্বে একাধিকবার খণ্ডন করা হয়েছে।

আর গণতান্ত্রিক দেশে থাকার দ্বারা কি গণতন্ত্র মেনে নেওয়া হয়ে যায়? তাহলে কি দারুল হরবে মুসলিমদের থাকার অনুমতি নেই? তারা কি দারুল হরবে থাকে না?তারা দারুল হরবে থাকে এবং তাদের দেওয়া সুবিধা ভোগ করে বলেই কি তাদের কুফরের স্বীকৃতি দেওয়া??? ফিকহের কিতাবে তো এর ভূরিভূরি নজির রয়েছে। আপনি এমন প্রশ্ন করে কী বুঝাতে চাইলেন? নিজের মূর্খতা প্রকাশ করলেন নাকি বাচ্চাদের মতো করে অদ্ভূত কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন?!! এভাবে কথা বলে কী যে বুঝাতে চান, আশ্চর্য লাগে!! আর আপনার মুরিদরাও সব গোগ্রাসে গিলে নেয়! গলায় এতটুকুও আটকে যায় না!! আল্লাহর কাছে আমরা এমন মূর্খতা থেকে পানাহ চাই।

৬ নং মন্তব্য : আজকে আপনি যদি হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেন, তাহলে ভোটটা পাবে আল্লাহর নবি। যদি আপনি নৌকা মার্কায় ভোট দেন, ভোটটা পাবে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা। আপনি যদি ধানের শীষে ভোট দেন, তাহলে ভোটটা পাবে খালেদা জিয়া। আপনি যদি অন্য প্রতীকে ভোট দেন, ভোট পাবে তাদের নেতা। আর যদি আপনি হাতপাখায় ভোট দেন, হাতপাখায় ভোট দিলে ভোট পাবে ইসলাম এবং আল্লাহর নবি।

সূত্র :https://m.youtube.com/watch?v=FALUCRnVPh৮
(ভিডিওর প্রথম ও শেষ অংশ)

খণ্ডন : বস্তুত যারা তাহরিফ করে, তাদের মুখের লাগাম আল্লাহ খুলে দেন। আর এর দরুন তাদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হয়, যা শুনে কাফিররাও অবাক হয়ে যায়। এভাবেই একসময় সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

আপনি এখানে দাবি করলেন, আপনার হাতপাখায় ভোট দিলে নাকি ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আমি মনে করি, এমন কথা শুনে তো খোদ চরমোনাইয়ের অন্ধ মুরিদদেরও হুঁশে আসা উচিত ছিল। ইসলাম ও রাসুল সা.-এর শানে এমন জঘন্য মন্তব্য করায় আমি মনে করি, আপনার প্রকাশ্যে তাওবা করা আবশ্যক। এটা চরম গোস্তাখি। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের স্বার্থে আপনারা ইসলাম ও রাসুল সা.-কে পর্যন্ত ছাড় দিলেন না! আপনি শুধু আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চান, এতটুকুর কারণেই আপনাকে ভোট দেওয়া মানে ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হয়ে যাচ্ছে??? তাহলে আপনার কথানুসারে তো জামাতে ইসলামিকে ভোট দেওয়া মানেও তো ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হবে! জমিয়তে ইসলামকে ভোট দেওয়া মানেও তো ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হবে!! খিলাফত আন্দোলনকে ভোট দেওয়া মানেও তো ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হবে!!! মানুষ কি এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে না? এসব কী শুরু করছেন?? এমন কথা তো ইসলামি গণতন্ত্রের দাবিদার অন্য দলের লোকেরাও কোনোদিন বলতে দুঃসাহস দেখায়নি! এমন জঘন্য উক্তি ইসলামের ইতিহাসে খুবই বিরল। আল্লাহর কাছে এমন ব্যক্তিবর্গ ও তাদের বিকৃতি থেকে পানাহ চাই।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ও তার রাসুল সা.-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য হওয়ায় যদি আপনাকে ভোট দেওয়া মানে ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হয়, তাহলে তো নৌকা বা ধানের শীষে ভোট দিলে বর্তমান ব্যক্তি ভোট পাওয়ার কথা ছিল না, আপনার এখানে বলা উচিত ছিল, তাদের ভোট দেওয়া মানে আব্রাহাম লিংকনকে ভোট দেওয়া। অথচ আপনি তা না বলে বর্তমান প্রার্থীদের নাম বললেন। কেন? কেন এমনটা করলেন?? মানুষের ইসলামপ্রিয়তা দিয়ে বানিজ্য করতে চাচ্ছেন? এজন্যই তো মানুষ আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে চায় না। তারা জানে, আপনারা ইসলামের জন্য নয়, নিজদের স্বার্থে ভোট চাইছেন। দ্বীনের এত তাহরিফ করলে সাধারণ মানুষও আপনাদের চাতুরতা বুঝে ফেলে। আপনাদের মতো এমন অজ্ঞতাপূর্ণ ও কাঁচা ধোকাবাজি কোনো গণতান্ত্রিক দলই করে না। তারাও বোঝে,

এসব ফাউল কথা। অথচ আপনি তথাকথিত ইসলামি দলের প্রতিনিধিত্ব করেও এ সাধারণ জ্ঞানটুকু রাখেন না! আজব আপনাদের রাজনীতি!! আজব আপনাদের কথাবার্তা ও স্লোগান!!!

তৃতীয়ত, আপনি ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়ার কথা বললেন। এতে কত বড় ক্ষতি হলো, তা কি কখনো কল্পনা করেছেন? আপনি হারলে বিরোধীরা বলবে, ইসলাম ও রাসুল সা. হেরে গেছে। নাউজুবিল্লাহ। তাদের মুখে এমন নিকৃষ্ট কথা বের হওয়ার উৎস হলেন আপনি। আপনার কারণেই তারা ইসলাম ও রাসুল সা.-কে নিয়ে অশোভনীয় কথাবার্তা বলার সুযোগ পেল। আপনি এর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না; যতক্ষণ না প্রকাশ্যে তাওবা করেন।

চতুর্থত, আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি ক্ষমতা পেলে পরিপূর্ণ আল্লাহ ও তার রাসুল সা.-এর নির্দেশনা অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবেন? আপনি কি আপনার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল? যদি বলেন, নিশ্চিত নই, আমি চেষ্টা করব, তাহলে আপনি এমন কথা বললেন কেন, যে ব্যাপারে আপনার ওপর আস্থা রাখা যায় না? আপনি কেন এটাকে ইসলাম ও রাসুল সা.-এর নির্বাচন বলে মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি করলেন।

পঞ্চমত, আপনি রাসুল সা.-কে ঐসব কমিনা ফাসিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে দিলেন, যারা তাঁর সমকক্ষ বা কাছাকাছি হওয়া তো দূরের কথা, বরং তারা হলো আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দাদের অন্যতম। আপনি রাসুল সা.-কে এসব বাজে লোকদের সারিতে বসিয়ে দিলেন এ দাবি করে যে, স্বয়ং রাসুল সা.-ও এদের সাথে ভোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে!

এসব বেআদবি ও মূর্খতাসুলভ দিক কি কখনো ভেবে দেখেছেন? এতসব গোস্তাখি করেছেন, কখনো কি চিন্তা করে দেখেছেন? যা জানেন না, তা নিয়ে কেন কথা বলেন? সাহাবায়ে কিরাম রা. হাদিস বর্ণনা করার সময় কেঁপে উঠতেন। আতঙ্কে চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। এ ভয়ে যে, না জানি অজান্তে রাসুল সা.-এর দিকে এমন কথা সম্বোধিত হয়ে যায়, যা রাসুল সা. বলেননি। অথচ তাঁরা নিশ্চিতই কথাটি রাসুল সা.-এর মুখ থেকে শুনেছিলেন। তারপরও ভয় পেতেন। আতঙ্কে থাকতেন। আর আপনি কী করলেন? চিন্তা করতেও আমার ভয় লাগছে! শরীরের লোম

দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!! আল্লাহ আপনার সুমতি ফিরিয়ে দিন এবং সঠিক রাহে ফিরিয়ে আনুন।

বি. দ্র : আপনার এসব মন্তব্য নিয়ে খণ্ডনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কিছু মানুষ আপনাকে অনুসরণ করে, আপনার কথাকে ওহির মতো বিশ্বাস করে, আপনার কথায় কোনো ভুল খুঁজে পায় না, তাদের সে মোহ ভাঙানোর জন্যই এ দীর্ঘ লেখাটির অবতারণা। এছাড়াও যারা আপনাদেরকে হক মনে করে, আপনাদের মৌলিক কোনো সমস্যা নেই বলে বিশ্বাস করে, তারাও যেন আপনাদের এসব ভুল, সীমালঙ্ঘন ও বিকৃতির ফিরিস্তি ভালো করে দেখে নেয়। আপনাদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়, আপনাদের অবস্থা জামাতে ইসলামির চেয়ে ভালো নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই আপনারা নিজেদের যাই মনে করেন না কেন, আপনাদের এই হলো প্রকৃত অবস্থা। এখন আপনাদের ইচ্ছা, চাইলে ভুল মেনে নিয়প সংশোধন করে নিতে পারেন, চাইলে এড়িয়ে যেতে পারেন, আর চাইলে এসবের বিপরীত দলিলভিত্তিক জবাব লিখতে পারেন।

#সংগৃহীত

পোস্টলিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯৩৫

গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-১৪-২০১৯

মুফতি কাজি ইব্রাহিম সাহেব গণতন্ত্রকে মরা গরুর মতো জায়েয বলেছেন। অর্থাৎ গণতন্ত্র হারাম তবে নিরুপায় হয়ে করতে হচ্ছে। এজন্য জায়েয। যেমন- নিরুপায় অবস্থায় মরা গরুর গোশত খাওয়া জায়েয। এ ধরণের আরো যুক্তি আরো অনেকেই দিয়ে থাকেন।

তারা যদি গণতন্ত্রকে হারাম মনে করে থাকেন, তাহলে গণতন্ত্রে যোগ দেয়ার আগে বুঝে নিতে হবে: কোনো হারামে লিপ্ত হওয়া কখন বৈধ হয়?

হারাম থেকে বেঁচে থাকা ফরয। হারামে লিপ্ত হওয়া হারাম। যেমন, নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। হত্যা করা হারাম।

গণতন্ত্র যদি হারাম হয়ে থাকে, তাহলে তাতে লিপ্ত হওয়া হারাম। তা থেকে বেঁচে থাকা ফরয।

নিরুপায় অবস্থায় কি সব হারাম বৈধ হয়ে যায়?

সাধারণত অনেকে মনে করেন, নিরুপায় অবস্থায় সব হারাম বৈধ হয়ে যায়। ব্যাপকভাবে এ কথা সহীহ নয়। নিরুপায় অবস্থায় সকল হারাম বৈধ হয়ে যায় না। নিরুপায় অবস্থায় কেবল সেসব হারামই বৈধ হয়, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিরুপায় অবস্থায় বৈধ করেছেন।

যেমন, মৃত প্রাণী ভক্ষণ। এটা নিরুপায় অবস্থায় বৈধ। কিন্তু কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। যদি কারো মাথায় অস্ত্র ঠেকানো হয় যে, যদি তুই মৃত প্রাণীর গোশত না খেয়েছিস, তাহলে তোকে হত্যা করে দেব; তাহলে তার জন্য তা খাওয়া হালাল। কিন্তু যদি কারো মাথায় অস্ত্র ঠেকানো হয় যে, যদি তুই অমুক মুসলমানকে হত্যা না করিস, তাহলে তোকে হত্যা করে দেব;

তাহলে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য মুসলমান হত্যা জায়েয হবে না। যদি হত্যা করে, তাহলে হারাম হবে। আল্লাহ তাআলা মাফ না করলে জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء- 93]

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে-শুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হবেন ও তাকে লা'নত করবেন। আর তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহা শাস্তি।"- নিসা ৯৩

আল্লাহ তাআলা অন্যায়ভাবে মুসলমান হত্যা হারাম করেছেন। অন্য কোন আয়াতে বা হাদিসে এর বৈধতা দেননি। অতএব, নিরুপায় অবস্থায় এবং জীবন বাঁচানোর স্বার্থেও কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা জায়েয নয়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله بإتفاق المسلمين وإن اكرهه بالقتل. اهـ

"কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করতে বাধ্য করলে তার জন্য তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না- যদিও তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫৩৯

আল্লামা মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

وإن أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما" لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما. اهـ

"যদি হত্যার ভয় দেখিয়ে কাউকে অন্য কোন মুসলমান হত্যা করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে হত্যার অনুমোদন হবে না। নিজেকে হত্যা করা হলেও বিরত থাকবে। যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে গুনাহগার হবে। কেননা, যতই জরুরত ও নিরুপায়

অবস্থা হোক, কোন মুসলমান হত্যা বৈধ নয়।”- হিদায়া ৩/২৭৪, কিতাবুল ইকরাহ

নিরুপায় অবস্থা কাকে বলে?

গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন- নিরুপায় অবস্থা কাকে বলে?

যখন হারাম করলে ফায়েদা ও লাভ হবে, কিন্তু না করলে ক্ষতি হবে না- তাকে জরুরত বলে না। একে নিরুপায় অবস্থা বলে না।

যখন হারাম না করলে লোকসান বা কষ্ট হবে- একেও জরুরত বা নিরুপায় অবস্থা বলে না।

নিরুপায় অবস্থা বলে একে যে, হারামে লিপ্ত না হলে জীবন চলে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। কিংবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়া বা দীর্ঘ দিনের জন্য বা অত্যন্ত জুলুমপূর্ণ জেলে আটক হওয়া প্রায় নিশ্চিত। একে জরুরত বলে। একে নিরুপায় অবস্থা বলে।

যখন কোন ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যে, যদি এই হারামে লিপ্ত না হয়, তাহলে তার জীবন চলে যাবে বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হবে কিংবা জেলে বন্দী হবে- তাহলে তাকে বলা হবে, সে নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন। এই নিরুপায় অবস্থায় আল্লাহ তাআলা কিছু হারামে লিপ্ত হওয়া জায়েয করেছেন। যেমন- মদ, শুকর বা মৃত খাওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة- 173]

“তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অবশ্য যে ব্যক্তি চরম নিরুপায় অবস্থায় পতিত হয় (ফলে এসব নিষিদ্ধ বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং (প্রয়োজনের) সীমা

অতিক্রম না করে, তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”- বাকারা ১৭৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة-3]

“কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয় (ফলে হারাম বস্তু ভক্ষণ করে) আর গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা না করে, তাহলে আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”- মায়েদা ৩

ক্ষুধার তাড়নায় যখন জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং হারাম ছাড়া অন্য কোন হালাল খাবার না পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ তাআলা হারাম ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। তবে দুই শর্তে:

ক. মজা সম্ভোগের জন্য খেতে পারবে না।

খ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে পারবে না। যতটুকুতে জীবন বাঁচে শুধু ততটুকু। আয়াতে আল্লাহ তাআলা ক্ষুধার তাড়নায় জীবনের আশঙ্কা হলে প্রয়োজন পরিমাণ হারাম ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। আইম্মায়ে কেরাম এ থেকে বের করেছেন, ক্ষুধার তাড়নায় জীবনের আশঙ্কা হলে যেমন হারাম ভক্ষণ বৈধ, অন্য কোন কারণে জীবনের আশঙ্কা হলেও হারাম ভক্ষণ বৈধ।

এখানে লক্ষণীয় যে, নিরুপায় অবস্থায় আয়াতে শুধু হারাম ভক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্য কোন হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতির কথা আয়াতে নেই। তবে অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের দ্বারা আরো কিছু হারাম ও কুফরে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। বিশেষত যেসব বিষয় একান্ত আল্লাহ তাআলার হক, যেগুলোতে বান্দার ক্ষতি হয় না, সেগুলোর বৈধতা আছে। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে।

বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের আলোকে নিরুপায় অবস্থা বলতে- জীবনের আশঙ্কা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্টের আশঙ্কা বা দীর্ঘ মেয়াদী কিংবা অতিশয় জুলুমপূর্ণ জেল সাব্যস্ত হয়। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

তাহলে সারকথা দাঁড়াল:

- শরীয়তের স্বাভাবিক নিয়ম, হারামে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

- একান্ত নিরুপায় ও জীবনের আশঙ্কামূলক ক্ষেত্র হলে কোন কোন হারামে লিপ্ত হওয়া বৈধ। আর কিছু হারাম এমন আছে, যেগুলোতে কোন অবস্থাতেই লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। জীবন গেলেও না।

গণতন্ত্রকে যারা হারাম বলা সত্বেও জায়েয বলেন, তাদের নিকট প্রশ্ন:

গণতন্ত্র কোন ধরণের হারাম? নিরুপায় অবস্থায় যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে সে ধরণের হারাম, না'কি যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি নেই সে ধরণের হারাম?

যদি উত্তর হয়, যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি নেই, সে ধরণের হারাম- তাহলে তো পরিষ্কার যে, গণতন্ত্র করা যাবে না। নিরুপায় হলেও না। আর যদি উত্তর হয়, যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে সে ধরণের হারাম; তাহলে:

প্রথমত জিজ্ঞেস করি, কুরআন সুন্নাহয় এর দলীল কি?

দ্বিতীয়ত: জায়েয হলে সকলের জন্য জায়েয, না'কি একান্ত নিরুপায় যারা তাদের জন্য জায়েয?

এটার উত্তর একটাই যে, একান্ত নিরুপায় যারা কেবল তাদের জন্যই জায়েয, বাকিদের জন্য হারাম।

তাহলে বেশির চেয়ে বেশি এটা বলা যায়, গণতন্ত্রে যোগ না দিলে যাদের প্রাণ যাবে বা জেল-জুলুমের শিকার হবে, কেবল তাদের জন্যই জীবন বাঁচে পরিমাণ বা জেল-জুলুম দূর করা যায় পরিমাণ জায়েয। এর বেশি জায়েয নয়। বাকিদের জন্যও জায়েয নয়।

যেমন, কারো পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, সে ভোট না দিতে গেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে, তাহলে তার জন্য ভোট কেন্দ্রে যাওয়া জায়েয। তবে যদি ভোট না দিয়ে পারা যায় বা না ভোট দেয়া যায় বা ভোট নষ্ট করে ফেলার সুযোগ থাকে, তাহলে ভোট দেয়া জায়েয হবে না। কেননা, গ্রেফতারি থেকে বাঁচার জন্য শুধু ভোট কেন্দ্রে যাওয়াই যথেষ্ট। গোপন কক্ষে যখন ভোট দেবে, তখন কেউ সামনে

থাকবে না। তাই ভোট দিতে সে বাধ্য নয়। হ্যাঁ, কাউকে যদি সামনাসামনি ভোট দিতে বলে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।

তাহলে গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন, তাদের কথা মতোও কেবল তাদের জন্যই জায়েয, যারা নিরুপায়। যাদের গ্রেফতারি বা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য গণতন্ত্র নামক হারামে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন কোন উপায় নেই। তাও কেবল ততটুকুই জায়েয, যতটুকুতে গ্রেফতারি বা মৃত্যু প্রতিহত হয়। এর বেশি নয়। যাদের গ্রেফতারি বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে না, তাদের জন্য জায়েয নেই। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বেশি বলার সুযোগ নেই। তাহলে তারা ঢালাওভাবে সকলের জন্য – এমনকি মাহদি আলাইহিস সালামের আগমন পর্যন্ত- কিভাবে গণতন্ত্রকে জায়েয বলছেন?

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২০৮৯

সংশয় নিরসন- ০১:

মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা ফরয

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-১৭-২০১৯

সংশয়-১:

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কোন মুসলিম ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে শত্রু প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া ফরয। কিন্তু কাফেররা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে তা পুনঃরুদ্ধার করা ফরয- এমন কথা কি কেউ বলেছেন? ভারতে যখন ইংরেজরা আক্রমণ করেছিল তখন প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয ছিল। কিন্তু যখন তারা দখল করে নিয়ে গেছে তখন থেকে আর জিহাদ ফরয নয়। স্পেন, আরাকান ও কাশ্মিরসহ অন্যান্য ভূখণ্ডের বেলায়ও একই কথা।

নিরসন

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

এক. আমরা জানি, জিহাদ দুই প্রকার: ইকদামি ও দিফায়ি। কাফেরদের শক্তি চুরমার করে ইসলামী শাসনের অধীনস্ত করার জন্য কাফেরদের দেশে অগ্রে বেড়ে যে হামলা করা হয়, সেটি ইকদামি জিহাদ। আর কাফেররা মুসলমানদের কোন ভূমিতে আক্রমণ করলে প্রতিহত করা দিফায়ি জিহাদ। এ উভয় প্রকার জিহাদ ফরয। প্রথমটি ফরযে কিফায়া, দ্বিতীয়টি ফরযে আইন।

কাফেররা যদি আমাদের উপর কোন আক্রমণ নাও করে, তথাপি তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরয। তাদেরকে তাদের দেশে রাজত্ব করতে দেয়াও আমাদের জন্য জায়েয নেই। তাদের রাজত্ব চুরমার করে ইসলামী শাসনের অধীনস্ত করা আমাদের ফরয দায়িত্ব।

মুহতারাম পাঠক, যখন কাফেরদেরকে কাফেরদের ভূমিতে নিরাপদে থাকতে দেয়াও আমাদের জন্য জায়েয নেই, তখন আমাদের ভূমি দখল করে নিলে তা তাদের হাতে ছেড়ে রাখা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এখানে তো এর আগেই জিহাদ ফরয হবে।

ইমাম তুসূলী রহ. (১২৫৮ হি.) বলেন,

أفلا تتذكرون: أن الله- سبحانه- أمرنا بالذهاب إليهم، وقتالهم في أراضيهم، فكيف: إذا قدموا إلى برّنا هذا بالغيّ والفساد!؟، أم لنا براءة استثنانا الله- تعالى- بسببها من عموم دعوة العباد؟!. اهـ

"তোমাদের কি স্মরণ নেই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের ভূমিতে গিয়ে আক্রমণ চালানোর আদেশ দিয়েছেন?? তাহলে স্বয়ং তারা ভ্রষ্টতা আর ফাসাদ নিয়ে আমাদের এই ভূমিতে আগ্রাসন চালালে কি বিধান হবে?! না'কি আমাদের এমন কোন ছাড়পত্র আছে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দাওয়াতের সার্বজনীন যে দায়িত্ব, তা থেকে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন?"- আজবিবাতুত তুসূলী ২৬৩

দুই. আরাকান, কাশ্মির, ভারত, পূর্ব তুর্কিস্তানসহ কাফেরদের দখলকৃত প্রতিটি মুসলিম ভূমিতে মুসলমানরা আজ সীমাহীন নির্যাতিত। তাদের হাহাকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার করার জন্য, যারা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"- নিসা: ৭৫

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আসসা'দি রহ. (১৩৭৬ হি.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها.

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. اهـ

"এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে তার রাস্তায় জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করছেন। আয়াত বুঝাচ্ছে যে, এ জিহাদ তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। এ জিহাদ তরকের কারণে তারা চরম ভর্ৎসনার পাত্র হচ্ছে। তিনি বলছেন, 'কী হলো তোমাদের?! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছ না।' অথচ অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুরা, যারা কোনো উপায় অবলম্বন পাচ্ছে না, তারা শত্রুদের হাতে চরম অত্যাচারের শিকার হচ্ছে! তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই ভূখণ্ড থেকে বের করে নিয়ে যান। যার অধিবাসীরা শিরক ও কুফর করে নিজেদের প্রতি জুলুম করছে এবং অত্যাচার করে ও আল্লাহর পথে বাধা দিয়ে মুমিনদের উপর জুলুম করছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে

মিনতি জানাচ্ছে, তিনি যেন তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন, যে তাদেরকে এই জালেমদের ভূমি থেকে উদ্ধার করবে।

সুতরাং এটি তো সে প্রকারের জিহাদ, যা তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার্থে করবে। এটি সেই যুদ্ধ নয়, যা (আগে বেড়ে) কাফেরদের উপর আক্রমণের আগ্রহে করা হয়। যদিও এই প্রকারের জিহাদেও রয়েছে মহাসফলতা এবং তা থেকে পশ্চাৎগামীদের ব্যাপারেও এসেছে চরম ভর্ৎসনা, কিন্তু যে জিহাদের মাধ্যমে তোমাদের দুর্বলদের উদ্ধার করবে, তার প্রতিদান তার চেয়েও আরো অনেক বড় এবং তার উপকারিতাও অনেক বেশি। কারণ এটি শত্রু প্রতিরোধমূলক জিহাদ।"- তাফসীরে সা'দি ১/১৮৭

আল্লাহ তাআলার এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও কিভাবে মজলুম মুসলমানদের কথা ভুলে গিয়ে আমরা বসে থাকতে পারি??

তিন. আক্রান্ত হলে যে কারণে প্রতিহত করা ফরয, সে একই কারণে দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করা ফরয। আক্রান্ত হলে প্রতিহত করা ফরয যাতে মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন ক্ষতিসাধন না হয়। মুসলমানদের অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হতে না হয়। কোন মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর কোন সীমালঙ্ঘন না হয়। কাফেররা যেন মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব না করতে পারে। তাদের উপর চেপে বসতে না পারে। আল্লাহর যমিনে যেন ফিতনা না হয়। শিরক, কুফর ও ফাসাদের রাজত্ব না হয়। আল্লাহর বান্দারা যেন নিরাপদে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে যেতে পারে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلّهِ

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন ও আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"- আনফাল: ৩৯

কাফেররা আক্রমণ করলে তো এসব ফিতনার সম্ভাবনা থাকে মাত্র। যদি তারা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, তাহলে ফিতনা চালাবে। আর দখল করে নিলে তো সুনিশ্চিত যে, তারা সব ধরণের ফিতনা ফাসাদ ও জুলুম অত্যাচার চালাবে- যেমনটা আজ আমরা প্রতিটি দখলকৃত মুসলিম ভূমিতে দেখতে পাচ্ছি।

যদি আগ্রাসন চালালেই জিহাদ ফরয হয়ে যায়, তাহলে দখল করে নিলে কোন কারণে জিহাদ ফরয হবে না? এখানে তো এর আগেই ফরয হওয়ার কথা।

চার. ফুকাহায়ে কেরাম যেখানে বলেছেন যে, কাফেররা কোন ভূমিতে আগ্রাসন চালালে তা প্রতিহত করা ফরয, যাতে তারা দখলদারিত্ব বসাতে না পারে, সেখানে আসলে তারা এ কথাটিও বলেছেন যে, কোন ভূখণ্ড কাফেরদের দখলে চলে গেলে তা উদ্ধার করা ফরয। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করলেই তা বুঝে আসে। আসুন আমরা কয়েকটি বক্তব্য দেখি। ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দখলদারিত্ব কায়েম করার পূর্বেই শত্রু প্রতিহত করা ফরয:

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لاخلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم. اهـ

"সকল মুসলমানের সুবিদিত আকীদা যে, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করে; আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে; ফলে তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শঙ্কাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, শত্রুর ক্ষতি থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে পরিমাণ লোক তাদের সাহায্যে জিহাদে বের হওয়া। এ বিষয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। এমন কথা কোনো মুসলমানই বলেনি যে, শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করবে, তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করবে, আর মুসলমানদের জন্য তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ হবে।"- আহকামুল কুরআন ৪/৩১২

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ: (৫৮৭ হি.) বলেন-

فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {انفروا خفافا وثقالا} قيل: نزلت في النفير. اهـ

"যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; অর্থাৎ কোন এলাকায় শত্রুরা আক্রমন চালায়, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ফরজ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর বর্তায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় জিহাদে বের হও।' বলা হয়, আয়াতটি নাফিরে আম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।" -বাদায়িউস সানায়ি': ৭/৯৮

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

يجب الجهاد على الكفاية إلا إذا كان النفير عاماً بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين ... فيفترض على كل واحد. اهـ

"জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে নাফিরে আম হয়ে গেলে সকলের উপর ফরজ হয়ে যায়। আর নাফিরে আম হল- যখন কাফেররা আক্রমন করে বসে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত হয় না।... তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।" –আলবিনায়া:৭/৯৬

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন-

ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه. اهـ

"যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ, শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া।" -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/ ১৫২

এ চার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট- শত্রু আগ্রাসন চালালে বা চালাতে আসলে তাকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয। দখলদারিত্ব কায়েম করার পূর্বেই তাকে প্রতিহত করে দিতে হবে।

দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করা ফরয:

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন-

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. اهـ

"যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ঐসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকবে না। এভাবে তার পরের এবং তার পরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকবে। পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে।" - রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

ইমাম তুসূলী রহ. (১২৫৮ হি.) বলেন,

فالجهاد: فرض عين على من نزل بهم عدوّ الدين، فإن لم تكن فيهم كفاية، أو لم تجتمع لهم كلمة: فعلى الذين يلونهم، (فإن لم تكن في الذين يلونهم كفاية، أو لم تجتمع لهم كلمة: فعلى الذين يلونهم)، وهكذا إلى أن تحصل الكفاية، ولو اتّصل ذلك من مثل "المغرب" لبغداد"، وعمّ ذلك من الآفاق الحاضر والباد .اهـ

“যাদের উপর শত্রুরা আগ্রাসন চালিয়েছে, (সর্বপ্রথম) তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। যদি তাদের দ্বারা যথেষ্ট না হয় বা তাদের পরস্পরে ঐক্য না থাকে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর। যদি তাদের পার্শ্ববর্তীদের দ্বারা যথেষ্ট না হয় বা তাদের পরস্পরে ঐক্য না থাকে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর। এভাবে পর্যায়ক্রমে ফরযে আইন হতে থাকবে, যতক্ষণ না প্রতিহত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের ব্যবস্থা হয়। যদিও এই ফরয মাগরিব থেকে নিয়ে বাগদাদ পর্যন্ত, এমনকি সার্বজনীনভাবে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের গ্রাম-শহর সকলের উপর বর্তায়।”- আজবিবাতুত তুসূলী ২৬৩

লক্ষ করুন- বলা হয়েছে, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে সর্বপ্রথম তাদের উপর জিহাদ ফরয। তারা যদি প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় বা না করে তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর। এভাবে হতে হতে সারাবিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যাবে।

এই বক্তব্যের দু’টি উদ্দেশ্য হতে পারে-

ক. কাফেররা কোন এক জায়গায় আক্রমণ করলে আগ্রাসী কাফেরদের প্রতিহত করতে যে পরিমাণ মুসলমানের জিহাদের শরীক হওয়ার দরকার, সে পরিমাণ মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। প্রথমত এ দায়িত্ব যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর বর্তাবে। তারা জিহাদে শরীক হবে। তাদের দ্বারা যথেষ্ট হবে না মনে হলে তাদের পার্শ্ববর্তীরাও শরীক হবে। তাদের দ্বারাও যথেষ্ট হবে না মনে হলে তাদের পার্শ্ববর্তীরাও শরীক হবে। এভাবে যদি এমন হয় যে, সারা বিশ্বের সকল মুসলমান শরীক না হলে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে না, তারা দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলবে, তাহলে সকলের উপরই জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কোন ভূখণ্ডে আগ্রাসন হওয়া মাত্রই এমন সংখ্যক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে, যে সংখ্যক মুসলমান দিয়ে দখলদারিত্ব বসানোর আগেই কাফেরদের প্রতিহত করা যায়।

এ হল এক উদ্দেশ্য। প্রথমে উল্লিখিত জাসসাস, কাসানী, আইনী ও কুরতুবি- এ চারজনের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এটি হতে পারে যে, প্রথমত যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তারা যদি প্রতিহত করতে না পারে বা না করে, ফলে কাফেররা তাদের উপর

দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর ফরয হবে তাদের উদ্ধার করা। তারা যদি তাদের উদ্ধারে সক্ষম না হয় বা না করে কিংবা কাফেররা তাদের উপরও দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলে, তাহলে তাদের পরবর্তীদের উপর ফরয হবে তাদের সকলকে উদ্ধার করা। এভাবে আক্রান্ত ভূমিতে কাফেরদের দখলদারিত্ব যদি বহাল থাকে কিংবা তারা ক্রমাগত দখল বাড়াতে থাকে, তাহলে বাকি মুসলমানদের উপর ফরয হবে এসব দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করা। এর জন্য সারাবিশ্বের সকল মুসলমানকে জিহাদে শরীক হওয়ার দরকার পড়লে সকলকেই শরীক হতে হবে। কোন মুসলিম ভূমি কাফেদের দখলে থাকতে দেয়া যাবে না।

আল্লামা তুসূলী রহ. ও আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. সহ আরো যাদের বক্তব্য এমন- তাদের সকলের বক্তব্যেই এ দু'টি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে।

চিন্তা করে দেখুন, ফুকাহায়ে কেরাম এ কথাগুলো বলেছেন, যখন উট-ঘোড়া ছাড়া যোগাযোগের আর কোন মাধ্যম ছিল না। সুদূর স্পেন বা মরক্কোতে আক্রমণ হলে এ খবর রাতারাতি মাশরিক তথা বাগদাদ বা হিন্দুস্তানে পৌঁছে যাবে না। আর স্পষ্ট যে, এত দিনে কাফেররা দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলবে। বাগদাদবাসী বা হিন্দুস্তানবাসীর তখন দায়িত্ব হবে, এ দখলদারিত্ব হটিয়ে স্পেন ও মরক্কো মুক্ত করা। ফুকাহায়ে কেরামের এমনটিই উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু তারা বলেছেন, নিকটবর্তীরা যদি সক্ষমতা সত্বেও জিহাদ না করে বসে থাকে, তাহলে বাকিদের দায়িত্ব জিহাদ করা। আর স্পষ্ট যে, নিকটবর্তীরা বসে থাকলে কাফেররা দখলদারিত্ব কায়েম করবে। পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব হবে কাফেরদের দখলদারিত্ব থেকে মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০ হি.) এর ফতোয়া

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্যটির কথা বলেছি- অর্থাৎ কোন মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে চলে গেলে তা উদ্ধার করা ফরয- ইবনে কামাল পাশা রহ. এর ফতোয়া থেকে বিষয়টি ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার হবে। তার ফতোয়াটি ছিল দখলদার শীয়াদের ব্যাপারে।

শীয়ারা মুসলমানদের কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিল। তখন তৎকালীন উসমানী খেলাফতের শাইখুল ইসলাম ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০ হি.) এদের বিরুদ্ধে কিতালের ফতোয়া জারি করেন। মূল ফতোয়াটি তুর্কি ভাষায়। ডক্টর সায়্যিদ বাগজুওয়ান সেটি তাহকিক করে আরবী অনুবাদ করে ছেপেছেন। ফতোয়ায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিতালের বিধান বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে ফিকহের বক্তব্য থেকে এর দলীল দিয়েছেন। এখানে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,

قد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد السنيين، حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة. اهـ

"মুসলমানদের রাষ্ট্রসমূহে মুতাওয়াতির সূত্রে অসংখ্য ব্যক্তির মাধ্যমে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, শীয়াদের একটা দল সুন্নীদের অনেকগুলো এলাকা দখল করে নিয়েছে। এমনকি সেগুলোতে তারা তাদের বাতিল মতবাদ প্রকাশ্যে জারি করেছে।"- খামসু রাসায়িল ফিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিব ১৯৫

সামনে বলেন,

وبالجملة أن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يعد ولا يحصى. فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم. وإن دارهم دار حرب. اهـ

"মোটকথা, মুতাওয়াতির সূত্রে অসংখ্য ব্যক্তি মারফত আমাদের নিকট এসব শীয়ার এত অধিক কুফরির কথা পৌঁছেছে যে, তার কোন হিসাব কিতাব নেই। কাজেই, তারা কাফের ও মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আর তাদের দখলকৃত রাষ্ট্র দারুল হরবে পরিণত হয়েছে।"- খামসু রাসায়িল ফিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিব ১৯৬

সামনে বলেন,

ثم أن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين. حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب، فيحل للمسلمين أموالهم ونسائهم وأولادهم ... ويجب أن يعلم

أيضا أن جهادهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. اهـ

"এদের বিধান মুরতাদদের বিধানের অনুরূপ। তাদের দখলকৃত শহরগুলো দারুল হরব। তাই মুসলমানদের জন্য তাদের মাল গনিমত বানানো এবং তাদের নারী শিশুদের বন্দী করা হালাল। ... আরো জেনে রাখা আবশ্যক যে, সকল সক্ষম মুসলমানের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরযে আইন।"- খামসু রাসায়িল ফিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিব ১৯৬

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পক্ষে তিনি সদরুশ শরীয়া রহ. (৭৪৭ হি.) এর নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন-

إذا هجمَ الكفارُ على ثغرٍ من الثّغورِ يصيرُ فرضَ عينٍ على مَن كان يقربُ منه، وهم يقدرونَ على الجهاد. وأمَّا على مَن ورائِهم، فإذا بلغَ الخبرُ إليهم يصيرُ فرضَ عينٍ عليهم إذا احتيجَ إليهم، بأن خيفَ على مَن كان يقربُ منهم، بأنَّهم عاجزونَ عن المقاومة، أو بأن لم يعجزوا، ولكن تكاسلوا، ثُمَّ وثُمَّ إلى أن يصيرَ فرضَ عينٍ على جميعِ أهلِ الإسلام شرقاً وغرباً .اهـ

"কাফেররা মুসলমানদের কোন সীমান্তে আক্রমণ করলে সীমান্তের নিকটবর্তী সক্ষম মুসলমানদের উপর (সর্বপ্রথম) জিহাদ ফরযে আইন। তাদের পরবর্তীদের কাছে যদি সংবাদ পৌঁছে এবং প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তাদের উপরও ফরযে আইন। প্রয়োজন পড়বে এভাবে যে, সীমান্তবর্তীরা অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা হচ্ছে (যে, তারা প্রতিহত করতে পারবে না) কিংবা অক্ষম নয় কিন্তু অলসতা করছে। এভাবে হতে হতে (ক্রমানুসারে) পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সকল প্রান্তের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে।"- শরহুল বিকায়া ৬/৮৩-৮৪

ইবনে কামাল পাশা রহ. এর ফতোয়া থেকে দু'টি বিষয় বুঝা গেল-

১. কাফেররা কোন মুসলিম ভূমি দখল করে নিলে তা উদ্ধার করা ফরয। কারণ, তিনি এ ফতোয়া এমন মুসলিম ভূমি উদ্ধারের ব্যাপারে দিয়েছিলেন, যেগুলো ইতিমধ্যে শীয়া কাফেররা দখল করে নিয়েছিল।

২. ফুকাহায়ে কেরাম যেখানে বলেছেন যে, 'কাফেররা আক্রমণ করলে প্রয়োজন পড়লে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন'- এর দ্বারা পূর্বোক্ত উভয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দখলদারিত্ব কায়েম করার আগেই প্রতিহত করতে হবে। প্রতিহত করা সম্ভব না হলে এবং কাফেররা দখলদারিত্ব কায়েম করে নিলে সেটি উদ্ধার করা ফরয। কেননা, সদরুশ শরীয়ার যে বক্তব্য দিয়ে তিনি দলীল দিয়েছেন যে, শীয়াদের দখলকৃত ভূমিগুলো উদ্ধার করা ফরয, সেখানে এ কথা পরিষ্কার নেই যে, দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে হবে। সেখানে শুধু এতটুকুই আছে যে, আক্রমণ হলে ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা যায়, ফুকাহায়ে কেরামের এ ধরণের সকল বক্তব্য দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, যেকোনভাবে কাফেরকে দারুল ইসলাম থেকে বের করে দিতে হবে। দখলদারিত্ব কায়েম করার আগে সম্ভব হলে আগেই। সম্ভব না হলে দখলদারিত্ব কায়েম করার পর হলেও যুদ্ধের মাধ্যমে হটিয়ে মুসলিম ভূমি উদ্ধার করতে হবে।

পাঁচ. দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে হবে- এ কথাটি কোন কোন ফকিহ স্পষ্টও বলেছেন।

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন-

وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: الرابعة- وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم .وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار

الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا. اهـ

"কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। চতুর্থ মাসআলায় এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উক্ত অবস্থা হল- যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারি, যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ- শত্রুর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক- জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হব; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।" -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২

ইমাম কুরতুবী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন।

১. যখন শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয়।

(بغلبة العدو على قطر من الأقطار)

২. যদি শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। **(بحلوله بالعقر)**

৩. যদি শত্রু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের দিকে আসতে থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে। **(لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها)**

কাজি ইয়ায রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন-

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) هو على وجهين؛ فأما الاستنفار لعدو صدم أرض قوم، فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم، وكذلك لكل عدو غالب ظاهر حتى يقع، وأما لغير هذين الوجهين فيتكد النفير لطاعة الإمام لذلك، ولا يجب وجوب الأول. اهـ

"হাদিসের বাণী **(وإذا استنفرتم فانفروا)** 'যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।' -এর দু'টি সূরত:

১. যদি এমন কোনো শত্রু প্রতিহত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন।

২. একইভাবে যে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রতিহত করার জন্যে জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়।

এই দুই সূরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের ভিত্তিতে জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দু'টির মতো জোরদার ফরজ নয়।" -ইকমালুল মু'লিম: ৬/২৭৫

ইমাম কুরতুবী রহ. ও কাজি ইয়ায রহ. এর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, শত্রু কোন মুসলিম ভূখণ্ড দখল করে নিলে, তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরয; যতক্ষণ না শত্রু

পরাজিত হয় এবং মুসলিম ভূমি উদ্ধার হয়। যেমন শত্রু আসতে থাকলে বা আগ্রাসন চালালে তা প্রতিহত করার জন্য কিতাল ফরয।

সারকথা-

উপরোক্ত আলোচনার সারকথা দাঁড়াল: নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রত্যেকটিতেই জিহাদ ফরয-

♣ কাফেররা কোন মুসলিম ভূমি আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসতে থাকলে।

♣ কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ চালালে।

♣ কোন মুসলিম ভূমি দখল করে নিলে।

প্রথম দুই সূরতে দখলদারিত্ব বসাবার পূর্বেই আক্রমণ প্রতিহত করে দিতে হবে। তৃতীয় সূরতে দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে হবে। অতএব, বর্তমান ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ভারত, মায়ানমার, পূর্বতুর্কিস্তানসহ সকল গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক মুসলিম ভূমি, যেগুলো কাফের মুরতাদদের দখলে আছে, সেগুলো উদ্ধারের জন্য জিহাদ ফরযে আইন। কোন না কোনভাবে জান, মাল বা যবান দিয়ে জিহাদে সক্ষম এমন কোন মুসলমানই এই ফরয থেকে মুক্ত নয়।

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২১২৪

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে?

হেলাল

Senior Member

০১-২৪-২০১৯

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে? ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মসজিদে গমণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে নামায আদায় করলাম। আমি ছিলাম মহিলাদের কাতারে। তিনি নামায শেষে হাসতে হাসতে মিম্বারে উঠে বসলেন। প্রথমেই তিনি বললেনঃ প্রত্যেকেই যেন আপন আপন জায়গায় বসে থাকে। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান আমি কেন তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয়ার জন্যে একত্রিত করেছি যে তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে আমার কাছে আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর সে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে এমন ঘটনা বলেছে যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম। লাখ্‌ম ও জুযা◌াম গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সাথে সে সাগর পথে ভ্রমণে গিয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার হয়ে এক মাস পর্যন্ত তারা সাগরেই ছিল। অবশেষে তারা সাগরের মাঝখানে একটি দ্বীপে অবতরণ করলো। দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করে তারা মোটা মোটা এবং প্রচুর চুল বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পেল। চুল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত থাকার কারণে প্রাণীটির অগ্রপশ্চাৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলোনা। তারা বললঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। তারা বললোঃ কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তামীম দারী বলেনঃ প্রাণীটি যখন একজন লোকের কথা বললোঃ তখন আমাদের ভয় হলো যে হতে পারে সে একটি শয়তান। তথাপিও আমরা ভীত হয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঘরটির ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করে আমরা বৃহদাকার একটি মানুষ দেখতে পেলাম। এত বড় আকৃতির মানুষ আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও

দেখিনি। তার হাত দু'টিকে ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে হাঁটু এবং গোড়ালীর মধ্যবর্তী স্থানে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা বললামঃ মরণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ তোমরা আমার কাছে আসতে সক্ষম হয়েছ। তাই আগে তোমাদের পরিচয় দাও। আমরা বললামঃ আমরা একদল আরব মানুষ নৌকায় আরোহন করলাম। সাগরের প্রচন্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করলো। অবশেষে তোমার দ্বীপে উঠতে বাধ্য হলাম। দ্বীপে প্রবেশ করেই প্রচুর পশম বিশিষ্ট এমন একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার অগ্রপশ্চাৎ চেনা যাচ্ছিলনা। আমরা বললামঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বললোঃ আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। আমরা বললামঃ কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে এই ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললোঃ হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে তোমার কাছে দ্রুত আগমণ করলাম। হতে পারো তুমি একজন শয়তান- এ ভয় থেকেও আমরা নিরাপদ নই। সে বললোঃ আমাকে তোমরা 'বাইসান' সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বাইসানের কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? সে বললোঃ আমি তথাকার খেজুরের বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। সেখানের গাছগুলো এখনও ফল দেয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ সে দিন বেশী দূরে নয় যে দিন গাছগুলোতে কোন ফল ধরবেনা। অতঃপর সে বললোঃ আমাকে বুহাইরাতুৎ তাবারীয়া সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ বুহাইরাতুৎ তাবারীয়ার কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? আমরা বললামঃ তথায় প্রচুর পানি আছে। সে বললোঃ অচিরেই তথাকার পানি শেষ হয়ে যাবে। সে পুনরায় বললোঃ আমাকে যুগার নামক ঝর্ণা সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললামঃ সেখানকার কি সম্পর্কে তুমি জানতে চাও? সে বললোঃ আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? লোকেরা কি এখনও সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে? আমরা বললামঃ তথায় প্রচুর পানি রয়েছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে। সে আবার বললোঃ আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে জানাও। আমরা বললামঃ সে মক্কায় আগমণ করে বর্তমানে মদিনায় হিজরত করেছে। সে বললোঃ আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ ফলাফল কি

হয়েছে? আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, পার্শ্ববর্তী আরবদের উপর তিনি জয়লাভ করেছেন। ফলে তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বললঃ তাই না কি? আমরা বললাম তাই। সে বললোঃ তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভাল। এখন আমার কথা শুন। আমি হলাম দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদিনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই ফেরেশতাগণ কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে তাড়া করবে। মক্কা-মদিনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবে।

হাদীছের বর্ণনাকারী ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বারে আঘাত করতে করতে বললেনঃ এটাই মদিনা, এটাই মদিনা, এটাই মদিনা। অর্থাৎ এখানে দাজ্জাল আসতে পারবেনা। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তামীম দারীর হাদীছটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে। শুনে রাখো! সে আছে সাম দেশের সাগরে (ভূমধ্য সাগরে) অথবা আরব সাগরে। তা নয় সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। এই বলে তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেনঃ ‘‘আমি এই হাদীছটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থেকে মুখস্থ করে রেখেছি’’।[৯]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২১৯৪

গোপন গোনাহ : ভয়ংকর এক রোগের সূত্র

saif abdullah

Moderator

০১-২৬-২০১৯

ইদানীং একটি রোগ মহামারির রূপ ধারণ করেছে। অনেক দ্বীনদার ভাইয়েরাও এ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। রোগটি খুবই ভয়ানক, অত্যন্ত সংবেদনশীল। রোগটির স্বরূপ হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামের সত্যতা, আখিরাতের বিশ্বাস, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ইত্যাকার বিষয়ে প্রকাশ অযোগ্য ভাবনার উদয়। অনেকেরই এখন এসব ব্যাপারে আজেবাজে চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে। সন্দেহ ও সংশয় ব্যাপক আকার ধারণ করছে। অনেকের তো অবিশ্বাসের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেছে যে, ইতিমধ্যে তারা দ্বীনদারি থেকে পুরোমাত্রায় দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম থেকে ক্রমান্বয়ে অন্ধকার জগতের দিকে সরে যাচ্ছে। রোগটি এখন আর ব্যক্তিকেন্দ্রীক নেই; বরং ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে সামাজিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইমানি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।

অনেক তাতব্য-তালাশ ও সময় ব্যয় করে যা বুঝতে পারলাম, তার সারসংক্ষেপ হলো, এ রোগের উৎস হলো, গোপন গোনাহ। মানুষ যখন জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনে গোনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিতে থাকে। অন্তর যখন তাকওয়াশূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তর পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর ভয় আর জাগ্রত হয় না। মোনাজাতে চোখের পানি আসে না। এক পর্যায়ে শয়তান তার দুর্বল ইমান ও বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। বিভিন্ন শিরকি ও কুফরি চিন্তা তার মনে আসতে শুরু করে। সে না এগুলোর খণ্ডন জানে, আর না জানার জন্য কোনো আলিমের শরণাপন্ন হয়। যখন অবিশ্বাস অন্তরে একেবারে গেঁথে যায়, তখন সে হয়ে পড়ে সেক্যুলার বা নাস্তিক। অনেকে পরিবার ও সমাজের ভয়ে তা প্রকাশ না করলেও শেষে ইমানহীন অবস্থাই তার মৃত্যু ঘটে।

পূর্বের ও বর্তমানের একাধিক ঘটনা পাওয়া যায় যে, সারাজীবন দ্বীনদার ও পরহেজগার হিসাবে পরিচিত লোকটির মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হচ্ছে না। যতই

চেষ্টা করছে, মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। অনেকে তো শেষ সময়ে এসে সরাসরি ইসলামকেই অস্বীকার করে বসছে। কেউ কুরআন সামনে নিয়ে বলছে, আমি এর সবকিছু অস্বীকার করলাম। নিজ স্বীকারোক্তি বা পরিবার ও ভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, সে বাইরে সবার কাছে ভালো দ্বীনদার হিসাবে প্রকাশ করলেও গোপনে নিয়মিত কবিরা গোনাহে লিপ্ত হতো।

বর্তমান সময়ে গোপনে গোনাহ করার আসবাব অনেক বেশি। উপকরণগুলো অত্যন্ত সহজলভ্য। তাই আমাদের যুবসমাজ দিনদিন গোপন গোনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বীনদার শ্রেণিও বাদ পড়ছে না। এর ভয়াবহ ফলাফলও দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর মানুষ এখন সংশয়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। দু,চারজন এটা নিয়ে চিন্তিত ও চিকিৎসা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীনই থেকে যাচ্ছে। শেষ জমানায় যে মানুষ ব্যাপকহারে ইমানহারা হতে থাকবে, তার বাস্তবায়ন বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানের ভয়ংকর এ সময়ে কতজন যে মুক্তি পাবে, তা একমাত্র মহান রাব্বুল আলামিনই ভালো জানেন!

ইবনে জাওজি রহ. বলেন :

والحذر الحذر من الذنوب، خصوصًا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية،

গোনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা; বিশেষত গোপন গোনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তাঁর নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন। (সাইদুল খাতির : ২০৭, প্রকাশনী : দারুল কলাম, দিমাশক)

ইবনে আরাবি রহ. বলেন :

أخسر الخاسرين من أبدى لِلنَّاسِ صَالِح أعماله، وبارز بالقبيح من هُوَ أقرب إِلَيْهِ من حبل الوريد.

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে সত্তা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তাঁর সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক : ৫/৩৫৬, প্রকাশনী : দারুল ফিকর, বৈরুত)

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেন :

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ، إِمَّا مِنْ جِهَةِ عَمَلٍ سَيِّئٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَتِلْكَ الْخَصْلَةُ الْخَفِيَّةُ تُوجِبُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

বান্দার গোপন গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোনো আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই তার মন্দ মৃত্যুর কারণ হয়। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২/১৭৩, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া রহ. বলেন :

أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات.

সব আল্লাহওয়ালা এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, গোপন গোনাহ-ই অধঃপতন ও অবনতির প্রধান কারণ। (মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩)

গোপন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহ :

১. রোনাজারি করা ও আল্লাহর কাছে দোয়া করা; যেন তিনি তাঁর নাফরমানি ও সকল গোনাহ থেকে হিফাজত করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (সুরা আল-বাকারা : ১৮৬)

২. নফসের সাথে মুজাহাদা করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সুরা আশ-শামস : ৭-১০)

তিনি আরও বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার রাস্তায় চেস্টা-কুশেষ করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিষ্ঠাবান লোকদের সাথে আছেন।(সুরা আল-আনকাবুত: ৬৯)

৩. হাদিসে বর্ণিত ওই অবস্থার কথা চিন্তা করা, কিয়ামতের দিন যখন গোপন গোনাহকারীদের আমলসমূহ ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়া হবে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا» ، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا

আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে। (সুনানু ইবনি মাজাহ : ২/১৪১৮, হা. নং ৪২৪৫ প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যি)

৪. আল্লাহ তাআলার পর্যবেক্ষণের কথা চিন্তা করা যে, তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। (সুরা নিসা : ১)

৫. গুনাহ করার সময় এ চিন্তা করা যে, আমার শ্রদ্ধেয় বড় কেউ দেখলে কি আমি এ গোনাহ করতে পারতাম?

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

وَاسْتَحِ اللَّهَ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ ذِي هَيْبَةٍ مِنْ أَهْلِكَ

তুমি তোমার পরিবারের কোনো প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা করো। (মুসনাদুল বাজ্জার : ৭/৮৯, হা. নং ২৬৪২, প্রকাশনী : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা)

৬. এ চিন্তা করা যে, গোনাহরত অবস্থা যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কিভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

প্রত্যেক ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) ওই অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। (সহিহ মুসলিম : ৪/২২০৬, হা, নং ২৮৭৮, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৭. আল্লাহর নিয়ামত ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করা এবং জাহান্নামের আজাব ও ভয়ানক শাস্তি কল্পনা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা করো। নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা করো। (সুরা ফুসসিলাত : ৪০)

আল্লাহর কাছে আমরা ইমানের জন্য নিয়মিত দুআ করতে থাকি। গোপন গোনাহ থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকি। মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে দূরে থাকি। দ্বীনদার আলিমদের সোহবত বেশি বেশি ইখতিয়ার করি এবং কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও ইসলামি বই অধিকহারে অধ্যয়ন করতে শুরু করি। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। শিরকমুক্ত ইমান ও বিদআতমুক্ত আমল দান করুন। ইমানের হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তাওফিক দান করুন।

সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২০৪

দারুল আমান-আমলী আমান-কিবতি হত্যা ও একটি সংশয়

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০২-১৯-২০১৯

সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী ভাই জানতে চেয়েছেন- [তাকি উসমানী সাহেব ও আরো কয়েকজন উর্দু ফাতওয়ার প্রণেতাগণ নতুন একটি দার আবিষ্কার করেছেন। তা হল: "দারুল আমান"। দারুল হরবে যদি মুসলিমরা নিরাপদে থাকতে পারে, তাহলে সেটা দারুল আমান। সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তিনি নবী যুগে এর উদাহরণ দিয়েছেন হাবশাকে দিয়ে। যেহেতু সেখানে মুসলিমগণ নিরাপদে ছিলেন।

আরেকটি ব্যাপার হল: মুফতি শফী সাহেবের মারিফুল কুরআনে সূরা কাসাসের একটি আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি বলেছেন: নিরাপত্তা চুক্তি দুই ধরণের; একটা হল: লিখিত বা ঘোষিত, আরেকটি হল: অঘোষিত বা অলিখিত। সূরা কাসাসের উক্ত আয়াতটি হল:

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16)

"১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। ১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।"- কাসাস ১৫-১৬

তিনি এভাবে দলিল দেন যে: মূসা আলাইহিস সালাম যেই কিবতীকে হত্যা করেছিলেন, সে তো হারবীই ছিল। তাকে হত্যা করাতে দোষের কি? তথাপি কেন মূসা আলাইহিস সালাম এটাকে নিজের নফসের উপর জুলুম বিবেচনা করলেন?

এর উত্তরে তিনি বলেন: কিবতীদের সাথে যদিও লিখিত নিরাপত্তা চুক্তি হয়নি কিন্তু একসাথে পরস্পর মিলে মিশে নিরাপদে থাকার কারণে অলিখিত নিরাপত্তা চুক্তি হয়ে গেছে। এ কারণে এই হত্যার মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবে মূসা আলাইহিস সালাম এই চুক্তিটি ভঙ্গ করেছেন।

এ হিসাবে তো ধরা হবে যে, আমাদের দেশে এবং সকল দেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ ঐ দেশের কাফেরদের সাথে অলিখিত অঘোষিত চুক্তি করে ফেলেছে। তাই তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না। এ দু'টি বিষয়ের সুন্দর উত্তর প্রয়োজন।]

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

♣ দারুল আমানের ব্যাপারে আপনি নিচের লেখাটা দেখতে পারেন:

দারুল আমানের প্রহসনের কবলে মুসলিম উম্মাহ!

https://my.pcloud.com/publink/show?c...Hy৩j৫XKS৩YvzK৭

♣ আর অলিখিত চুক্তি তথা আমলী চুক্তির যে বিষয়টি মুফতি শফি রহ. থানবী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটা আগ্রাসী কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। আগ্রাসী কাফেরদের বিধান কা'ব বিন আশরাফের মতো, যাকে সাহাবায়ে কেরাম নিরাপত্তা ও আমান দেয়ার পরও হত্যা করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া আছে। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের কাফের ও মুরতাদ শাসকগুলো আগ্রাসী ও দখলদার কাফের। আমাদের উপর এরা চেপে বসেছে। যেকোন পন্থায় এদের কবল থেকে আমাদের নিজেদেরকে, নিজেদের ভূমি এবং দ্বীন ধর্মকে রক্ষা ও উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব। এদের সাথে আমাদের কোন সময় কোন চুক্তি হয়নি। অধিকন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক আগে থেকেই জিহাদের ঘোষণা দিয়ে রেখেছি। তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। আমরা যেমন তাদের নিরাপদ মনে করি না, তারাও আমাদের নিরাপদ মনে করে না। তারা সর্বদাই আমাদের তরফ থেকে ভয়ে থাকে। সামান্য থেকে সামান্য

কোন সম্পৃক্তি কারো মাঝে দেখলেই তাকে বন্দী করে। জেলে দেয়। অমানবিক নির্যাতন চালায়। তাহলে আমাদের সাথে তাদের কিভাবে আমানের চুক্তি হল? বরং তারা আমাদের প্রকাশ্য দুশমন, আমরা তাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অধিকন্তু যদি আমানের চুক্তি কখনও হয়েও থাকে- যদিও তা হয়নি কখনও- তবুও আমাদের উপর নির্যাতন করার কারণে, আমাদের শত হাজারো ভাই বোনকে বন্দী ও নির্যাতন করার কারণে আমান ভেঙে গেছে। এখন তাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল। থানবী রহ. বা শফি রহ. কেউই আগ্রাসী কাফের ও মুরতাদদের বেলায় এ ধরণের আমলী আমান গ্রহণযোগ্য হবে বলেননি। সেখানে শুধু এতটুকু আছে যে, কিছু কাফের ও কিছু মুসলমান যদি কোন হুকুমতের অধীনে পারস্পরিক আমান ও বিশ্বস্ততার সাথে একত্রে বসবাস করে, তাহলে একে অপরের উপর হামলা করা ও লুটপাট করা জায়েয হবে না। কারণ, এটাও গাদ্দারি। এটা আমরাও অস্বীকার করি না। এদেশের হিন্দুদের বেলায় হয়তো কথাটা কিছুটা প্রযোজ্য হতে পারতো- যদি তারা আমাদের উপর কোন জুলুম বা আমাদের নিয়ে কোন সমালোচনা না করতো। এরপরও একান্ত সাধারণ হিন্দু, যারা আমাদের কোন ধরণের ক্ষতি বা সমালোচনা করছে না এবং এদেশের মুরতাদ হুকুমতের পক্ষে বা ভারতের জুলুমের পক্ষে তাদের কোন সমর্থন নেই- তাদেরকে হত্যা করা আমরা ভাল মনে করি না। আর না এতে জিহাদের কোন ফায়েদা আছে। পক্ষান্তরে যারা আমদের দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোন ক্ষতিতে বা সমর্থনে লিপ্ত, তাদের রক্ত হালাল। এ ব্যাপারে আপনি নিচের লেখাটি দেখতে পারেন-

পথভ্রষ্ট রহমানীর ফতোয়া: ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাজায়েয!!

https://my.pcloud.com/publink/show?c...৯RfhUl৫৭XkswI৭

***

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

উপরোক্ত আয়াতের যে তাফসীর থানবী রহ. করেছেন, আবুস সাউদ রহ. আয়াতের এক তাফসীরে সেটা উল্লেখ করেছেন। তবে বিভিন্ন কারণে এ তাফসীরের চেয়ে ঐ তাফসির সঠিক মনে হচ্চে, যা আবুস সাউদ রহ. সহ অন্যান্য

মুফাসির করেছেন। সেটা হল, নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছার আগে কোন কাফের হত্যাযোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

"রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দেই না।"- ইসরা ১৫

যেহেতু মূসা আলাইহিস সালাম তখন নবী হননি এবং কিবতিদের কাছে নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাই তারা হত্যাযোগ্য ছিল না।

দ্বিতীয়ত মূসা আলাইহিস সালাম কিবতিকে হত্যার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না। কাফেরকে হত্যা করা সব শরীয়তের বিধান নয়। যেমন ধরুন, নূহ আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম বা সালেহ আলাইহিস সালামের শরীয়তে জিহাদের বিধান ছিল না। তাদের হত্যার বিধান ছিল না। এ কারণে সেসকল নবীর কেউই তাদের উম্মতের কাউকে হত্যা করেননি- যদিও উম্মত তাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে।

মোটকথা- কোন কাফেরকে হত্যার জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক:

ক. তার কাছে নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছা।

খ. উক্ত শরীয়তে ঈমান আনয়নে অস্বীকারকারী কাফেরদের হত্যার বিধান থাকা।

উক্ত কিবতির বেলায় এর কোনটিই পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, কিবতি যেহেতু বনি ইসরাইলের লোকটার উপর জুলুম করছিল তাই তাকে বাধা দেয়া যেত। তবে হত্যা করা উচিৎ হয়নি। ভুলক্রমে হলেও হত্যাটা অনুচিত হয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পেরেছেন, এ কাজটা শয়তানের তরফ থেকে হয়েছে। তাকে অত্যধিক রাগান্বিত করে কিবতিকে হত্যা করিয়েছে। এজন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চেয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এটাই এ আয়াতের সঠিক তাফসির। অধিকন্তু আগের তাফসিরও যদি ধরা হয়, তবুও সেটা আগ্রাসী কাফেরের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে এ বিষয়টি অন্য সময় বিস্তারিত আলোচনা করবো।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪৫৫

সাইয়িদুনা উসমান রা. :

যুগে যুগে বিকারগ্রস্তদের সমালোচনার শিকার এক মাজলুম সাহাবি

saif abdullah

Moderator

০৩-০৩-২০১৯

দ্বীনের যেসব অধ্যায়ে কোনো ছাড় নেই, যেসব ক্ষেত্রে নীরব থাকার কোনো অবকাশ নেই, যেসব স্থানে কোনো ধরনের আপোষের সুযোগ নেই; সেগুলোর অন্যতম হলো সাহাবা সমালোচনা। কত মানুষ এ ভয়ংকর পথে পা দিয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যে-ই এ বিপদ সংকুল সাগরে ঝাপ দিয়েছে, সে-ই ডুবে মরেছে, কখনো আর কিনারে ফিরে আসতে পারেনি। মুহাদ্দিসিনে কিরাম রিজাল শাস্ত্র নিয়ে এত মেহনত করেছেন, যা পুরো মানবজাতির ইতিহাসে বিরল। হাদিসের বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ এমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন, যা স্বয়ং বর্ণনাকারীর স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়রা পর্যন্ত জানত না। কিন্তু এখানে এসে তাঁরা সাহাবিদের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সাহাবিগণ এ শাস্ত্রের কাঁচি থেকে পুরোপুরি মুক্ত। তাঁদের ওপর সামান্য এতটুকু কাঁচি লাগানোও সহ্য করা হবে না। কারণ, তাঁরা নবুওয়াতের পরশ পাথরে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছেন, যেখানে খুঁত খুঁজতে যাওয়া বস্তুত নবুওয়াতের ওপর অনাস্থা সৃষ্টির নামান্তর। তাই এক বাক্যে সবাই বলেছেন, 'সাহাবায়ে কিরাম রা. সবাই নির্ভরযোগ্য, সবাই-ই বিশ্বস্ত'। এভাবেই হাদিস বর্ণনার মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও উম্মাহর বিদগ্ধ উলামায়ে কিরাম সাহাবা সমালোচনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাহলে অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের সমালোচনা করা কতটা অপরাধের হবে, একটু চিন্তা করে দেখুন!

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্যতম আকিদা হলো, সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করা যাবে না। তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা করা ফিতনায় নিপতিত হওয়ার প্রথম সোপান। মাওলানা মওদুদিকে আমরা যেসব

কারণে গোমরাহ বলে থাকি, তার অন্যতম হলো, এই সাহাবা সমালোচনা। তাঁদের মর্যাদার ওপর সামান্য আঘাতও আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ সহ্য করতে পারি না। সমালোচনাকারী সে যে-ই হোক না কেন। এখানে এসে নিজ ঘরানা ও ভিন্ন ঘরানার পার্থক্য ভুলে যেতে হবে। একবাক্যে, একযোগে সবাইকে এর বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

মওদুদিকে যদি আমরা মুআবিয়া রা.-এর সমালোচনা করার কারণে গোমরাহ বলি, তাহলে চরমোনাইয়ের পির মুফতি ফয়জুল করিমকে কেন আমরা উসমান রা.-এর মতো জলিলুল কদর সাহাবির সমালোচনা করার কারণে গোমরাহ বলব না? আমি তো বলি, সে এখানে শুধু উসমান রা.-এর সমালোচনাই করেনি; বরং পুরো সাহাবিদেরই সমালোচনা করেছে। কেননা, উসমান রা. খলিফা হয়েছিলেন সকল সাহাবিদের ইজমার ভিত্তিতে। সবাই বুঝেশুনেই তাঁর খলিফা হওয়ার পক্ষে রায় পেশ করেছিলেন। একক সিদ্ধান্ত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাহলে উসমান রা. এর মতো মহান সাহাবি যদি নরম দিলের মানুষ হওয়ার কারণে খিলাফতের মতো গুরুদায়িত্ব সামলাতে না-ই পারেন, তাহলে কি সব সাহাবির চিন্তা-ভাবনা ভুল ছিল? আসলেই কি উসমান রা. এত দুর্বল ও বিচক্ষণতাহীন ছিলেন। কক্ষনোই নয়; তিনি ছিলেন বিচক্ষণ সাহবিদের মধ্যে অন্যতম, ইতিহাসে যার উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে; যদিও ইতিহাস অজ্ঞরা তা চোখে দেখে না। আসুন আগে আমরা দেখে নিই, ফয়জুল করিম সাহেব উসমান রা.-এর ব্যাপারে কী মন্তব্য করলেন, এরপর আমরা এর খণ্ডন নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ফয়জুল করিম সাহেব বলেন : "যখনই শোনছে ওমার, ফেতনাটা তো এমনিই দাইবা গেছে। কী, কথা ঠিক না? আল্লাহু আকবার! ওমার রা. থাকাকালে তেমন কোনো ইসলামি জগতের মধ্যে ফেতনা শোনা যায় না। শুধু বিজয় আর বিজয়, শুধু বিজয় আর বিজয়, শুধু বিজয় আর বিজয়। কথাটা বুঝাতে পারছি? ফেতনা কম, শুধু বিজয় আর বিজয়। ওমার বিন খাত্তার রা. দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পরে উসমান রা.-রিক্কতে কালব ছিলেন, নরম দিলওয়ালা, একটু মায়াবি লোক, হায়াআন উসমান, লজ্জাশীলা এবং তিনি খুব বেশি বিশ্বাস করতেন। যেও কেউ কিছু একটু কান্নাকাটি করিয়া, পাগড়ি-পোট্টা বান্দিয়া লম্বা দাড়ি রাখিয়া দরবেশের ভেশে যদি কোনো কথা উসমান বিন খাত্তাব রা. উসমান গনি রা. বলতেন, ওমনি

বিশ্বাস করতেন। আহারে খোদা! এই লোক কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? এত বড় দরবেশ! এত আহলে এলেম! এত বিশাল জানুয়া! এর জ্ঞানে কোনো অভাব নেই! আরো কানতেছে ব্যক্তি! নাহ, এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে পারেই না! কথাটা বুঝাতে পারছি? এ ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে পারে না! বেশি একটু নরমি দিল ছিলেন। বিশ্বাস করতেন সবাইকে। এই দুর্বলতায় মুনাফেকরা সব জায়গায় আস্তে আস্তে শিকড় গাড়ছে। কী গাড়ছে? শিকড় গাড়ছে। ঠিক না ভাই? মনে রাখতে হবে, এখান থেকে নুখতা বের করতে হবে, মারাত্মক নুখতা, মারাত্মক নুখতা। এই জন্য যেই বুজুর্গির মধ্যে হুশ নাই, সেই বুজুর্গিকে নেতৃত্ব দিলে সে নিজেও ধ্বংস হবে, জাতিও ধ্বংস হবে। এটা মনে রাখতে হবে। এজন্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম কোনো বেশি বুজুর্গি থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করতেন না। যার হুশ কম, এমন মুহাদ্দিস থেকে বেশি হাদিস রেওয়ায়েত করতেন না। কেন? কারণটা কী? বুজুর্গানে কেরাম সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলায়। সবাইকে কী? সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলায়। মোল্লা জিয়ুন রহ.-এর মতো বুজুর্গ, কত বড় মুহাদ্দিস, কত বড় আলেম, কত বড় আহলুল এলেম! এই নুরুল আনওয়ারের এত বড় উসুলি কিতাব মুখস্ত লেখে ফেলাইছে, মুখস্ত। বন্ধুরা বলছে, একটা কিতাব লেখে দেন। মুখস্ত লেখে ফেলাইছে। এখন মনে করছেন এলেমের অবস্থা কী! একদিন এক ব্যক্তি বলতেছে, হুজুর, আপনার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে। কইল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বেচারির কী অবস্থা! বেচারির কী অবস্থা! আহারে কীভাবে খাবে? কীভাবে চলবে? আহা আফসুস! বেচারির কী অবস্থা! আরেকজনে বলতেছে, আপনে থাকতে আপনার স্ত্রী বিধবা হয় কেমনে? আপনি তো দুনিয়া থেকে বিদায় হলে আপনার স্ত্রী বিধবা হবে। আপনে তো এখনও আছেন! আপনার স্ত্রী বিধবা হয় কী করে? কয়, ইন্না লিল্লাহ। মুসলমান মিথ্যা কথা বলতে পারে? তাদের খেয়াল কতদূর মারাত্মক! মুসলমান মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আর আমাদের অবস্থা কী বর্তমানে? মুসলমান কি সত্য কথা বলতে পারে? এখন অবস্থা কী, বুঝছেন?”

ভিডিও লিংক [২৪.২৭ মিনিট থেকে ২৮.০৯ মিনিট পর্যন্ত দেখুন] :

https://www.youtube.com/watch?v=৬wFFhuDxYNw

আফসোস, হে পির সাহেব! আপনি তো মওদুদিকেও ছাড়িয়ে গেলেন!! মওদুদি

সাহেবও তো মুআবিয়া রা.-এর ব্যাপারে এমন জঘন্য মন্তব্য করেনি, যেমনটা আপনি করলেন!!! আপনি উসমান রা.-কে নরম দিলের মানুষ বলে প্রমাণ করলেন, উনার মধ্যে কঠোরতা ছিল না! আর এজন্য তার খিলাফত আমলে সব ফিতনা প্রকাশ পেয়েছে! প্রমাণ করলেন, তার দুর্বলতায় উম্মাহর অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। আপনি উসমান রা.-এর ব্যাপারে কী কী অপবাদ দিলেন, একটু ঠান্ডা মাথায় কি চিন্তা করে দেখবেন? একটু দেখুন :

এক : আপনি বলছেন, //যখনই শোনছে ওমার, ফেতনাটা তো এমনিই দাইবা গেছে। কী, কথা ঠিক না? আল্লাহু আকবার! ওমার রা. থাকাকালে তেমন কোনো ইসলামি জগতের মধ্যে ফেতনা শোনা যায় না। শুধু বিজয় আর বিজয়, শুধু বিজয় আর বিজয়, শুধু বিজয় আর বিজয়। কথাটা বুঝাতে পারছি? ফেতনা কম, শুধু বিজয় আর বিজয়। ওমার বিন খাত্তার রা. দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পরে উসমান রা.-রিক্কতে কালব ছিলেন, নরম দিলওয়ালা, একটু মায়াবি লোক, হায়াআন উসমান, লজ্জাশীলা এবং তিনি খুব বেশি বিশ্বাস করতেন।//

খণ্ডন : আপনি কি কোনোদিন ইতিহাস পড়েছেন? এত জাহালাত নিয়ে আপনাকে ওয়াজে নামতে বলেছে কে? উমর রা.-এর সময়ে বিজয় আর বিজয়, আর উসমান রা.-এর সময়ে শুধু ফিতনা আর ফিতনা, শুধু পরাজয় আর পরাজয়!!! এসব কই যে পান, আল্লাহই ভালো জানেন। একটু ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন, উসমান রা.-এর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্যের কী বিজয় ও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। তাঁর আমলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন হয়েছিল। তাঁর জনহিতকর কার্যাবলি সমাজের আদলই পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি মদিনা শহর রক্ষাবাধ 'মাহরু' নির্মাণ করেন। খাল খনন করে কৃষিতে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে সবার প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। মসজিদে নববির আধুনিকায়ন করেন। তাঁর আমলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল।

ওমর রা. যেখানে বিজয় রেখে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি তা আরও সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সময়ে ইসলামি খিলাফত পূর্বে কাবুল ও বেলুচিস্তান এবং পশ্চিমে ত্রিপোলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর সময়েই প্রথম নৌবাহিনী গঠিত হয়। নৌ-অভিযানে সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপপুঞ্জ মুসলমানদের দখলে আসে। তাঁর আমলেই

রোম ও পারস্য শক্তির ঔদ্ধত্য পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়। তাঁর আমলে সবচেয়ে বড় যে কাজটি করা হয়, তা হলো কুরআন সংকলন। ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি তাঁর হাতেই পূর্ণতা লাভ করে। আজ আমরা যে কুরআন পড়ি, সেটা তাঁরই নেতৃত্বে সংকলিত কুরআন, যাকে মুসহাফে উসমানি বলা হয়।

এত সব কাজ কি দুর্বল, সাধারণ ও সরল-সোজা কোনো লোক করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? তিনি যদি এতই সাদাসিধা হতেন, যদি তিনি ডান-বাম কিছু নাই বুঝতেন, সবাইকে যদি সরল মনে বিশ্বাসই করতেন, তাহলে কি তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্য জয় করতে পারতেন? পারতেন কি তিনি মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাতে? তিনি কি সক্ষম হতেন কুরআন সংকলনের মতো কঠিন ও গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে? না, আপনি যে বুজুর্গের কথা বলছেন, উসমান রা. সে বুজুর্গ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, লজ্জাশীল ও নরম দিলের আলোকিত মানুষ। শুধু তাঁর সরলতা ও লজ্জাশীলতার কথা বর্ণনা করে তাঁকে দুর্বল খলিফা আখ্যা দেওয়া আপনার চরম অজ্ঞতা ও সাহাবি বিদ্বেষিভাব প্রকাশ করে।

আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, তিনি শুধুই নরম ছিলেন। অথচ আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন এভাবে, "তাঁর সাহাবিগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল।" [সুরা আল-ফাতহ : ২৯] এ আয়াতে সকল সাহাবি উদ্দিষ্ট হলেও উসমান রা. নন, এমন কথা কোনো মুফাসসির কি কখনো বলেছেন? যদি না বলে থাকেন, তাহলে উসমান রা.-এর মুমিনদের প্রতি দয়াদ্রতা ও তাঁ লাজুকতার কথা বলে তাঁকে দুর্বল খলিফা প্রমাণ করার মিশনে নামছেন কেন? আল্লাহর কুরআনে বিশ্বাস করে থাকলে আপনার এই একপেশে কথা থেকে দ্রুত রুজু করুন। ইতিহাস সাক্ষ্য, উসমান রা. দুর্বল ও বোকা ছিলেন না। যেখানে যে গুণ থাকা দরকার, আল্লাহ তাঁকে সেসব গুণ যথাযথই দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন খলিফায়ে রাশিদ, উম্মাহর আলোকিত ও চিরউজ্জ্বল এক সন্তান।

দুই : আপনি বলেছেন, //যেও কেউ কিছু একটু কান্নাকাটি করিয়া, পাগড়ি-পোট্টা বান্দিয়া লম্বা দাড়ি রাখিয়া দরবেশের ভেশে যদি কোনো কথা উসমান বিন খাত্তাব রা. উসমান গনি রা. বলতেন, ওমনি বিশ্বাস করতেন। আহারে খোদা! এই লোক

কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? এত বড় দরবেশ! এত আহলে এলেম! এত বিশাল জানুয়া! এর জ্ঞানে কোনো অভাব নেই! আরো কানতেছে ব্যক্তি! নাহ, এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে পারেই না!//

খণ্ডন : আপনি কোন রিওয়ায়াতে পেয়েছেন যে, তিনি এত দুর্বল ছিলেন? কোন বর্ণনায় পেয়েছেন যে, সবাইকে তিনি এক কথায় বিশ্বাস করতেন? কোন হাদিসে পেয়েছেন যে, তিনি দাড়ি, টুপি দেখলেই বিগলিত হয়ে যেতেন? এমন গাজাখুরি কথা কোন ইতিহাসে পেয়েছেন? তিনি লজ্জাশীল ছিলেন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে তার বুদ্ধি-জ্ঞান, বিচক্ষণতা কিছুই ছিল না বলে আপনি এত বড় অপবাদ দিতে পারেন না! এমন জঘন্য অপবাদ গোমরাহ ফিরকার লোকেরা ছাড়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কোনো লোক আজ অবধি দিতে পারেনি। আপনার কথা থেকে বুঝা যায়, তিনি ডান-বামও বুঝতেন না। একেবারে সরল শিশু ও বোকা টাইপের ছিলেন। অথচ তাঁর ব্যাপারে হাদিসে কী বলে, আসুন আমরা একটু দেখি :

ক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে উসমান রা. ছিলেন সার্বিক দিক বিবেচনায় তৃতীয় মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবি। প্রথমে আবু বকর রা., এরপর উমর রা., এরপর উসমান রা.। ইলম, আমল ও বিচক্ষণতাসহ সকল ভালো গুণাবলিতে সাহাবায়ে কিরাম হলেন পুরো উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। আর তাঁদের মধ্যে তৃতীয় হলেন উসমান রা.। এমন একজন জলিলুল কদর সাহাবিকে শিশুসুলভ সরল ও দুর্বলচিত্তের মনে করা আমরা চরম বেআদবি ও সাহাবিদের শানে গোস্তাখি মনে করি। দেখুন সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ

‘ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আবু বকর রা.-এর ন্যায় মর্যাদাবান কাউকে মনে করতাম না, অতঃপর উমর রা.-কে, অতঃপর উসমান রা.-কে, অতঃপর সাহাবিগণের মধ্যে কাউকে কারও ওপর মর্যাদা দিতাম না।’ (সহিহুল বুখারি : ৫/১৫, হা. নং ৩৬৯৭)

খ. হুদাইবিয়ার সন্ধি ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী চুক্তি ছিল। এখানে এক পক্ষে ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁর পক্ষ থেকে মক্কায় প্রতিনিধি হিসাবে পাঠনো হয় তাঁরই প্রিয় সাহাবি উসমান রা.-কে। তিনি যদি এতই সরল ও বোকা টাইপের হতেন, যিনি ডান-বাম বোঝেন না, তাহলে ইতিহাসখ্যাত এ সন্ধিচুক্তির আলোচনার জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান রা.-কে মক্কায় পাঠাতেন না। দেখুন সুনানে তিরমিজিতে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ. فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لأَنْفُسِهِمْ.

‘আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (লোকদেরকে) স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্যের শপথ (বাইআতুর রিজওয়ান) করার হুকুম দেন তখন উসমান বিন আফফান রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মক্কার বাসিন্দাদের নিকট গিয়েছিলেন। আনাস রা. বলেন, লোকেরা আনুগত্যের শপথ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উসমান আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রয়োজনীয় কাজে গেছে। তারপর তিনি (উসমান রা.-এর বাইআতস্বরূপ) নিজের এক হাত অপর হাতের ওপর রাখেন। রাবি বলেন, উসমান রা.-এর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতখানা লোকদের নিজেদের জন্য তাদের হাতের চাইতে বেশি ভালো ছিল।’ (সুনানুত তিরমিজি : ৬/৬৭, হা. নং ৩৭০২)

তিনি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ছিলেন না; বরং তারা শারাফাত ও মর্যাদার কথা মুসলিম ও কাফির সবাই স্বীকার করত। দেখুন সহিহ বুখারির বর্ণনা

وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ اليُمْنَى : »هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ. فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ لِعُثْمَانَ

‘ইবনে উমর রা. বললেন, আর বাইআত রিজওয়ান হতে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো, মক্কার বুকে তাঁর চেয়ে সম্ভ্রান্ত অন্য কেউ যদি থাকত, তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই উসমান রা.-এর বদলে পাঠাতেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রা.-কে মক্কায় পাঠান। তাঁর চলে যাবার পরই বাইআতে রিজওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি উসমানের হাত। অতঃপর ডান হাত বাম হাতে স্থাপন করে বললেন, এ হলো উসমানের বাইআত।’ (সহিহুল বুখারি : ৫/১৫, হা. নং ৩৬৯৮)

গ. উসমান রা.-এর খিলাফত তো স্বয়ং আল্লাহ দান করেছেন, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিলেন। আল্লাহর নির্বাচিত খলিফার ব্যাপারে যদি বলা হয়, তিনি এমন সরল ছিলেন যে, ভালো-মন্দ, ধোঁকা ও সততার মাঝে পার্থক্য করতে পারতেন না, তাহলে তো (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক) খোদ আল্লাহর ওপরই অভিযোগ চলে আসে। দেখুন সুনানে তিরমিজিতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ.

‘আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উসমান, আল্লাহ তাআলা হয়ত তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন (খিলাফত দান করবেন)। তোমার থেকে লোকেরা তা খুলে নিতে চাইলে তুমি তাদের দাবিতে তা ত্যাগ করো না।’ (সুনানুত তিরমিজি : ৬/৬৯, হা. নং ৩৭০৫)

ঘ. উসমান রা.-এর খিলাফতলাভ সকল সাহাবিদের ইজমার ভিত্তিতে হয়েছিল। উমর রা. মৃত্যুর পূর্বে ছয়জন শুরা বানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এদের মধ্য হতে কাউকে যেন খলিফা বানানো হয়। অতঃপর শুরাসদস্য আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. অন্যান্য সাহাবিদের মতামত যাচাই করে উসমান রা.-এর পক্ষে সবার মত জানতে পারলেন। অতঃপর সবাই তাঁর হাতে বাইআত হন। তো এখানে আনসার ও মুহাজির সকল সাহাবির দৃষ্টিতে সেসময় তিনিই ছিলেন খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। যদি তিনি একই দুর্বল ও বুদ্ধিহীন বুজুর্গ হতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম রা. কিছুতেই তাকে খলিফা বানানোর ব্যাপারে মত দিতেন না। অতএব তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এটাই প্রমাণ করে যে, উসমান রা. খিলাফতের জন্য সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার মতো সব ধরনের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা তাঁর ছিল। সুতরাং তাকে খিলাফতের অযোগ্য আখ্যা দেওয়া মানে সাহাবিদের ব্যাপারে অনাস্থা সৃষ্টি করা, সাহবিদের রায়কে ভুল মনে করা, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদায় বিশ্বাসী কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।

ঙ. উসমান রা.-কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরপর (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজন) নিজের দুকন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ছিল এক বিরল সৌভাগ্য। কোনো নবির দুই কন্যাকে এককভাবে কেউ বিবাহ করতে পারেননি। এজন্যই তাঁকে জিন্নুরাইন (দুই আলোর অধিকারী) বলা হয়। তাহলে যিনি শ্রেষ্ঠ মানবের দুই মেয়ের জামাতা ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে এমন মন্তব্য করা কীভাবে বরদাশত করা যায় যে, তিনি নাকি হাবলা টাইপের ছিলেন। তার নাকি কোনো বিচক্ষণতা ছিল না। এমন কথা তো মক্কার কাফিররা পর্যন্ত বলতে পারেনি। এমন কথা বলা কি সাহাবি ও আলে রাসুলের সাথে স্পষ্ট বেয়াদবি নয়?

তিন : আপনি বলেছেন, //বেশি একটু নরমি দিল ছিলেন। বিশ্বাস করতেন সবাইকে। এই দুর্বলতায় মুনাফেকরা সব জায়গায় আস্তে আস্তে শিকড় গাড়ছে। কী গাড়ছে? শিকড় গাড়ছে। ঠিক না ভাই? মনে রাখতে হবে, এখান থেকে নুখতা বের করতে হবে, মারাত্মক নুখতা, মারাত্মক নুখতা। এই জন্য যেই বুজুর্গির মধ্যে হুশ নাই, সেই বুজুর্গিকে নেতৃত্ব দিলে সে নিজেও ধ্বংস হবে, জাতিও ধ্বংস হবে। এটা মনে রাখতে হবে। এজন্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম কোনো বেশি বুজুর্গি থেকে হাদিস

রেওয়ায়েত করতেন না। যার হুশ কম, এমন মুহাদ্দিস থেকে বেশি হাদিস রেওয়ায়েত করতেন না। কেন? কারণটা কী? বুজুর্গানে কেরাম সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলায়। সবাইকে কী? সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলায়।//

খণ্ডন : প্রথমত, আপনি বলতে চাইছেন, উসমান রা.-এর দুর্বলতায় মুনাফিকরা খিলাফতের সব জায়গায় শিকড় গেড়েছিল। এখানে দুর্বলতা বলতে নিশ্চয়ই উসমান রা.-এর বিচক্ষণতাকে উদ্দেশ্য করেছেন। বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি বিচক্ষণ হলে এসব মুনাফিকরা শিকড় গাড়তে পারত না। আসলেই কি তাই? মুনাফিকদের শেকড় গাড়া কি এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি বিচক্ষণ ছিলেন না? তাঁর আমলে ফিতনার উত্থান কি এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না? কক্ষনো নয়। এটা মূলত নববি যুগ থেকে জমানা দূরে সরে যাওয়ায় খারাপ লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হয়েছিল। হাদিসের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, নববি যুগ থেকে জমানা যত দূরে যাবে, ততই ফিতনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যদি তাই না হতো, তাহলে আলি রা.-এর বিচক্ষণতা নিয়ে তো আপনার কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ থাকার কথা নয়। অথচ তাঁর খিলাফত আমলে কি উসমান রা.-এর খিলাফত আমলের চেয়ে বেশি ফিতনা হয়নি? এতে কি এ কথা বলা ঠিক হবে যে, আলি রা. দুর্বল ছিলেন? তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না? বিষয়টি মূলত এমনই। আলি রা.-এর বিচক্ষণতা ঠিকই ছিল, কিন্তু দুষ্ট লোকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল। কারও বিচক্ষণতা থাকার অর্থ এ নয় যে, তার নেতৃত্বে থাকাকালীন কোনো ফিতনা আসতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, এরপর উসমান রা.-এর বদনাম করে আপনি ইজতিহাদ শুরু করলেন। ইজতিহাদের ভাষ্যও ছিল বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যে ভরপুর। আপনি এখানে এসে নুখতা বের করছেন! দাবি করলেন, যে বুজুর্গের মাঝে হুশ নেই, তাকে নেতৃত্ব দিলে নেতা ও জাতি সবাই ধ্বংস হবে। প্রকারান্তরে তো এটাই বলতে চাইলেন, উসমান রা. বুজুর্গ সাহাবি হলেও তিনি যেহেতু নেতৃত্বের উপযোগী ছিলেন না, বিধায় তিনি খলিফা হয়ে নিজেও ধ্বংস হয়েছেন এবং উম্মতকে ধ্বংস করে ছেড়েছেন! আপনি কি জানেন, আপনি কী বলেছেন? এত বড় মারাত্মক বেআদবি করতে রাফিজিরাও ভয় পাবে। হাদিসের ভাষ্যনুসারে যার খিলাফত স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন, যার খিলাফতের কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, যার খিলাফতের ব্যাপারে মুহাজির-আনসারসহ সকল সাহাবি ঐক্যমত্য

পোষণ করেছেন, তাঁর খিলাফতের যোগ্যতা নিয়েও যদি আপনার সন্দেহ হয়, তাহলে আপনার গোমরাহি নিয়ে কেন আমি সন্দেহ করব না; বরং আমি তো নিশ্চিত যে, এ কথার কারণে আপনি গোমরাহির ওপর আছেন।

তৃতীয়ত, আপনি শেষে বলছেন, মুহাদ্দিসিনে কিরাম বেশি বুজুর্গ মানুষ থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না। কেননা, তারা সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারে না। কাউকে মিথ্যাবাদী ভাবতে পারে না। এক্ষেত্রে যেটা সাব্যস্ত হয়, তা হলো, এমন বুজুর্গ মুহাদ্দিসের ওপর হাদিসের ক্ষেত্রে আস্থা রাখা যায় না। তাহলে কি আপনি এখানে এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, উসমান রা. যেহেতু বুজুর্গ সাহাবি ছিলেন এবং সরল খলিফা ছিলেন, তাই খিলাফতের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের আদর্শ নন? আমাদের আদর্শ শুধু আবু বকর রা. আর উমর রা.? বাকিরা তাহলে বাদ? এমন কথা তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কোনো লোক বলতে পারে না। আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়ালা জামাআহ তো চার খলিফাকে খুলাফায়ে রাশিদিন বলে বিশ্বাস করি। তাঁরা চারজনই পরবর্তী উম্মাহর জন্য আদর্শ। তাঁদের খিলাফত পূর্ণ নবুওয়াতের মানহাজের ওপর ছিল। অথচ আপনি উসমান রা.-কে সহজ-সরল আখ্যা দিয়ে, তাঁকে বড় বুজুর্গ বানিয়ে দিয়ে শেষে তাঁকে আস্থাহীন ও দুর্বল এক খলিফা বানিয়ে দিলেন। এটা কেমন বুজুর্গি, যার ওপর আস্থা রাখা যায় না! আমরা তো কোনো সাধারণ থেকে সাধারণ সাহাবিকেও এমন অদ্ভূদ ও অনাস্থাপূর্ণ বুজুর্গ মনে করি না। তাহলে উসমান রা.-কে এভাবে অনাস্থার পাত্র বানিয়ে আপনি কোন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চান, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

চার : আপনি বলেছেন, //মোল্লা জিয়ুন রহ.-এর মতো বুজুর্গ, কত বড় মুহাদ্দিস, কত বড় আলেম, কত বড় আহলুল এলেম! এই নুরুল আনওয়ারের এত বড় উসুলি কিতাব মুখস্ত লেখে ফেলাইছে, মুখস্ত। বন্ধুরা বলছে, একটা কিতাব লেখে দেন। মুখস্ত লেখে ফেলাইছে। এখন মনে করছেন এলেমের অবস্থা কী! একদিন এক ব্যক্তি বলতেছে, হুজুর, আপনার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে। কইল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বেচারির কী অবস্থা! বেচারির কী অবস্থা! আহারে কীভাবে খাবে? কীভাবে চলবে? আহা আফসুস! বেচারির কী অবস্থা! আরেকজনে বলতেছে, আপনে থাকতে আপনার স্ত্রী বিধবা হয় কেমনে? আপনি তো দুনিয়া থেকে বিদায় হলে আপনার স্ত্রী বিধবা হবে। আপনে তো এখনও আছেন! আপনার স্ত্রী বিধবা হয় কী করে? কয়, ইন্না লিল্লাহ। মুসলমান মিথ্যা কথা বলতে পারে?

তাদের খেয়াল কতদূর মারাত্মক! মুসলমান মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আর আমাদের অবস্থা কী বর্তমানে? মুসলমান কি সত্য কথা বলতে পারে? এখন অবস্থা কী, বুঝছেন?//

খণ্ডন :

এমন বর্ণনা কোথায় পেয়েছেন? বিশুদ্ধ সূত্র বর্ণনা করুন। মুল্লা জিয়ুন ভারত উপমাহদেশের ওই সব বিরল আলিমদের একজন ছিলেন, যাঁরা একবার কোনো কিছু পড়লেই মুখস্ত হয়ে যেত। তাঁর মতো এমন ধী-শক্তির অধিকারী শুধু ভারতে নয়, পুরো বিশ্বেই বিরল। লাখনৌর অধিবাসী এ আলিমের নাম হলো, শাইখ আহমাদ মুল্লা জিয়ুন রহ.। সিদ্দিকি বংশের সন্তান। বাদশাহ আলমগির ছিলেন তার ছাত্র। রাজপরিবারের অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আজন্ম তাদরিস ও তাসনিফে সময় ব্যয় করেছেন। ১১৩০ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুল আনওয়ার, মুকাদ্দামা : পৃ. ০৫)

তাঁর জীবনী কিছু কমবেশ এতটুকুই পাওয়া যায়। কিন্তু আপনার বর্ণিত ঘটনার কোনো রেফারেন্স পেলাম না। এ ধরনের কাহিনী বলতে হলে তো বিশুদ্ধ সূত্র লাগবে। নইলে এত বড় একজন আলিমের ব্যাপারে এমন অবাস্তব কিসসা-কাহিনী বলে আপনার মজলিস গরম করার কোনো অধিকার নেই। এমন প্রমাণহীন ও সূত্রবিহীন ঘটনা বলে আপনি আপনার উদ্ভট দাবি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনারই তো নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই, আপনার দাবি প্রমাণ তো দূরে থাক।

বি. দ্র. : আপনার এসব বক্তব্য সুস্পষ্ট গোমরাহি ও সাহাবি বিদ্বেষের পরিচায়ক। আপনার এ বক্তব্য থেকে রুজু না করলে আমরা আপনাকে গোমরাহ আখ্যা দেবো; যেমন আমরা মওদুদিকে গোমরাহ বলে অভিহিত করেছি। আপনার বক্তব্য যেহেতু প্রকাশ্য, তাই আপনার রুজুও হতে হবে প্রকাশ্যে এবং জনসম্মুখে। এর আগ পর্যন্ত আপনার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমাদের সাথে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করে সুপথে ফিরিয়ে আনুন।

সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৫৯৬

সংশয় নিরসন ০২

ক. সামরিক কাজে গোপনীয়তা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-২৭-২০১৯

সংশয়-২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি ময়দানে নেমে কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এমনই করেছেন। আমাদের আকাবিরগণও এমনই করেছেন। আমরা বর্তমানে যে লুকিয়ে লুকিয়ে – গুপ্ত হত্যা বা গেরিলা – জিহাদ করি, এটা কি জায়েয? ইসলাম তো যা করে প্রকাশ্যে করে। এভাবে লুকিয়ে কেন? এটা কি জিহাদ?

নিরসন

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

ইসলামে গোপনীয়তা

[ইসলাম যা করে প্রকাশ্যে করে]- কথাটা ঢালাওভাবে সহীহ নয়। সহীহ হচ্ছে, ইসলাম যা প্রকাশ্যে করা ভাল মনে করে সেটা প্রকাশ্যে করে, আর যা গোপনে করা ভাল মনে করে সেটা গোপনে করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের দিকে তাকালেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়।

♣ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর গোপনে গোপনে দাওয়াত দিতেন।

♣ মক্কায় কেউ মুসলমান হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঈমান গোপন রাখতে পরামর্শ দিতেন। হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

♣ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মক্কা থেকে হাবশা বা মদীনায় গোপনে গোপনে হিজরত করতেন।

♣ মদীনার আনসারদের সাথে বাইআতে আকাবা গোপনে গোপনে হয়েছে।

♣ গোপনীয়তার অনুপম নমুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা। এমন সঙ্গোপনে ও কৌশলে তিনি হিজরত করেছেন যে, মুশরিকরা তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও সন্ধান পায়নি।

আগের শরীয়তে গোপনীয়তা

♣ ফিরআউন বংশের এক লোক মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত কবুল করে ঈমানদার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ

"ফিরআউন বংশীয় এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখতো- সে বললো ...।"- আলমু'মিন ২৮

♣ আসহাবে কাহফ গোপনে পলায়ন করেছিল। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তারা যখন তাদের একজনকে খাবার কিনতে পাঠাচ্ছিল, তখন তাকে সাবধান করে দিচ্ছিল- যেন অতি সঙ্গোপনে কাজ করে,

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন কাউকে তোমাদের ব্যাপারে জানতে না দেয়।"- কাহফ ১৯

সামরিক কাজে গোপনীয়তা কাম্য

♣ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী কুরাইজার ইয়াহুদিদের ব্যাপারে হত্যার ফায়সালা করেছিলেন। হযরত আবু লুবাবা ইবনুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাক্রমে তা ইয়াহুদিদের নিকট প্রকাশ করে দেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতনসমূহেরও খিয়ানত করো না।"- আনফাল ২৭

আল্লাহ তাআলা সামরিক গোপনীয়তাকে আমানত আখ্যা দিয়েছেন এবং তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

♣ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের অভিযান গোপন রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পত্র মারফত তা মুশরিকদের অবগত করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"- মুমতাহিনা ১

মুসলমানদের সামরিক বিষয়াদি কাফেরদের অবগত করানোকে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের নামান্তর আখ্যা দিয়েছেন।

♣ হযরত কা'ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধাভিযানের ইচ্ছা করলে (সেটি গোপন রেখে) অন্য দিকে ঈঙ্গিত করতেন।"- সহীহ বুখারি ২৭৮৭

এটি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজীবনের সুন্নত যে, তিনি কোন যুদ্ধে বের হলে সাহাবায়ে কেরামকে স্পষ্ট জানাতেন না যে, কোন দিকে যাচ্ছেন। অন্য কোন দিকের ঈঙ্গিত করতেন। সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন দিকে যাচ্ছেন। অথচ রাসূলের উদ্দেশ্য থাকতো ভিন্ন। সামরিক বিষয়ে তিনি এতটাই গোপনীয়তা বজায় রাখতেন।

♣ এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الحرب خدعة

"যুদ্ধ কৌশলের নাম।"- সহীহ বুখারি ২৮৬৬

অর্থাৎ যুদ্ধের মূল বুনিয়াদ হল, কৌশল। যুদ্ধের জয়-পরাজয় কৌশলের উপর নির্ভরশীল, সামরিক শক্তির উপর নয়।

পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই তাদের সামরিক বিষয়াদি ও প্ল্যান-পরিকল্পনা তাদের দুশমনদের সামনে প্রকাশ করে না। এটাই যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম। ইসলাম এ নিয়ম মেনে চলে। এর ব্যতিক্রম করাকে খিয়ানত আখ্যায়িত করেছে।

♣ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর।"- নিসা ৭১

গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়া সতর্কতার পরিপন্থী- এটা সর্বস্বীকৃত।

♣ দায়িত্বশীলদের নির্দেশনা ব্যতীত কোন সংবাদ ছড়াতেও আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। একে মুনাফিকদের কাজ আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“তাদের (মুনাফিকদের) নিকট যখন কোন সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতির হোক- তারা তা ছড়িয়ে দেয়। যদি তারা তা রাসূল ও দায়িত্বশীলদের নিকট সমর্পন করে দিত, তবে সংবাদ অনুসন্ধানকারীরা তাদের থেকে সেটা জেনে নিতে পারতো (যে, তা ছড়ানোর উপযোগী কি’না)। তোমাদের উপর যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমত না হত, তবে অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকি সকলে শয়তানের অনুগামী হয়ে পড়তে।”- সূরা নিসা: ৮৩

কুরআন, হাদিস ও সীরাতের আলোকে স্পষ্ট যে, গোপনীয়তা ইসলামের চিরন্তন নীতি। আল্লাহ, রাসূল ও মুসলামানদের আমানত। গোপনীয়তা প্রকাশ করা অপরিপক্ষতা, ঈমানের দুর্বলতা, নিফাক ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের আলামত। এরপরও যারা গোপনে জিহাদের কাজ করার কারণে মুজাহিদদের সমালোচনা করে, তাদের দ্বীনের বুঝ কতটুকু আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। দুঃখের বিষয়, আজীবন বুখারি শরীফ পড়িয়ে আসছেন এমনসব মহিউস সুন্নাহরাই এমনসব মন্তব্য করছেন। হে আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান কর।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২১২

সংশয় নিরসন- ০২

খ. গুপ্ত হত্যা- কুরআনে কারীম

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-১০-২০১৯

গত পর্বে আমরা ইসলামে গোপনীয়তা এবং সামরিক কাজে গোপনীয়তার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এ পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা গুপ্ত হত্যার শরয়ী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করবো।

গুপ্ত হত্যার বিষয়টি মুসলমানদের নিকট সুবিদিত ছিল। আজকাল মুহিউস সুন্নাহ নামধারী কিছু যিন্দিকমার্কা আলেম এতে সন্দেহের বীজ বপনের পায়তারা চালিয়েছে। বুঝে না বুঝে অনেক মুসলমান ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে যে- ইসলাম যা করে তো প্রকাশ্যে করে; কাউকে হত্যা করতে হলে প্রকাশ্যে করবে, গোপনে কেন? অথচ গুপ্ত হত্যা কুরআনে কারীমের নির্দেশ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীক। বরং দুনিয়ার স্বাভাবিক যুদ্ধনীতিই এমন যে, বড় বড় ও নেতৃত্বস্থানীয়; যাদের সচরাচর যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায় না বা হত্যা করা সম্ভব হয় না, তাদেরকে গোপনে হত্যা করা হয়। যেসব দরবারি আলেম মুজাহিদদের গুপ্ত হত্যার উপর আপত্তি করে, তারা কিন্তু কাফের, মুরতাদ ও তাগুতরা যখন গুপ্ত হত্যা বা গ্রেফতার করে, তখন আপত্তি করে না। মনে হয় যেন, তাদের জীবনের টার্গেটই হচ্ছে দ্বীনের মুজাহিদগণের উপর আক্রমণ, তাদের বিভ্রান্ত প্রমাণ করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় উম্মাহকে জিহাদ থেকে ফিরানো।

যাহোক, কুরআন-সুন্নাহয় গুপ্ত হত্যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত। আমরা ইনশাআল্লাহ কুরআন সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করবো।

কুরআনে কারীমের দলীল দুইভাবে:

ক. আম দলীল;

খ. খাস দলীল।

সুন্নাহ থেকে আমরা চারটি ঘটনা পেশ করবো:

ক. ইয়াহুদি কা'ব বিন আশরাফের গুপ্ত হত্যা;

খ. ইয়াহুদি আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইকের গুপ্ত হত্যা;

গ. মুশরিক খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির গুপ্ত হত্যা;

ঘ. আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কতৃক মক্কার মুশরিকদের গুপ্ত হত্যা।

***

কুরআনে কারীমে গুপ্ত হত্যা

কুরআনে কারীমে গুপ্ত হত্যার দুই ধরণের নির্দেশনা বিদ্যমান: ক. আম; খ. খাস।

আম দলীল: আম দলীল দ্বারা ঐসব আয়াত উদ্দেশ্য, যেগুলোতে কাফেরদের হত্যার নিঃশর্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ – البقرة 191

"তোমরা যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে। যেসব স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে, তোমারাও তাদের সেসব স্থান হতে বের করে দাও। (জেনে রেখো) ফিতনা (দাঙ্গা হাঙ্গামা ও) হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। (লড়াই করার ব্যাপারে আরেকটি কথা মনে রাখবে) মসজিদে হারামের আশেপাশে তোমরা কখনও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে (প্রতিরোধের জন্য) তোমরাও লড়াই কর। এটাই হচ্ছে কাফেরদের যথাযথ শাস্তি।"- বাকারা ১৯১

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়- তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'- তাওবা: ৫

এ ধরণের যত আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল ও হত্যার নিঃশর্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সবগুলো গুপ্ত হত্যার দলীল। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিঃশর্তভাবে হত্যার অনুমতি দিয়েছেন। প্রকাশ্যে করা যাবে, গোপনে যাবে না- এমন কোন শর্ত করা হয়নি। অতএব, গোপনে-প্রকাশ্যে যেভাবেই সম্ভব হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا. اهـ أحكام القرآن 1\321

"এ আয়াতে আদেশ দেয়া হচ্ছে, যখনই বাগে পাওয়া যায়- কাফেরদের হত্যা করে দিতে। আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করুক বা না করুক- সকল কাফেরের বেলায়ই আয়াতের কিতালের নির্দেশ প্রযোজ্য।"- আহকামুল কুরআন ১/৩২১

খাস দলীল: উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতের দ্বিতীয় অংশ গুপ্ত হত্যার খাস দলীল। সেখানে আদেশ দেয়া হয়েছে, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ- **'তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক'।** আল্লাহ তাআলা কাফেরদের হত্যা ও বন্দী করার জন্য ওঁৎপেতে বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যখনই বাগে পাওয়া যাবে, পাকড়াও করে বন্দী বা হত্যা করা হবে। এর নামই গুপ্ত হত্যা।

কাযি ইবনে আরাবী রহ. (৫৪৩ হি.) বলেন,

و اقعدوا لهم كل مرصد- قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة أ.هـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী ‘তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক’; আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত দলীল যে, (যেসব কাফেরের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে) তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার আগেই গুপ্ত হত্যা করা বৈধ।”- আহকামুল কুরআন: ৪/২০৮

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬৬০

সংশয় নিরসন- ০২

খ. গুপ্ত হত্যা

হাদিস ১. কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-১৬-২০১৯

কা'ব বিন আশরাফ মদীনায় ইয়াহুদিদের সর্দার ছিল। সে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। বদর যুদ্ধের পর চুক্তি ভঙ্গ করে। মক্কায় গমন করে মুশরিকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দেয়। সে বড় কবি ছিল। কবিতা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোপনে হত্যা করে দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাঁচজন সাহাবিকে পাঠান। তারা হলেন,

১. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (কা'ব বিন আশরাফের ভাগিনা)।

২. আবু নায়িলা (কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই)।

৩. আব্বাদ ইবনে বিশর।

৪. আবু আবস ইবনে জাবর।

৫. আলহারিস ইবনে মুআজ- রাদিয়াল্লাহু আনহুম। **[দেখুন: ফাতহুল বারি ৭/৪১১, কিতাবুল মাগাজি, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ]**

ইমাম বুখারি রহ. (২৫৬ হি.) কিতাবুল মাগাজিতে কা'ব ইবনে আশরাফের গুপ্ত হত্যার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله ﷺ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقام محمد بن مسلمة

فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: «قل»، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألَنا صدقة، و إنه قد عنانا و إني قد أتيتك أستسلفك، قال: و أيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين ... فقال: نعم، ارهنوني، قالوا :أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا و أنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان :يعني السلاح - فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة، وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو، قالت :أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ... فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا، أي أطيب ... فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه (صحيح البخاري: 4037)

“জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে আছ যে কা’ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারো? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে’। সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? বললেন, হাঁ; চাই। ইবনে মাসলামা আরজ করলেন, তাহলে আমাকে আপনার সমালোচনামূলক কিছু বলার অনুমতি দিন। বললেন, ঠিক আছে অনুমতি

দেওয়া হলো।... মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'বের কাছে গেলেন। বললেন, এই মুহাম্মাদ লোকটা আমাদের কাছে দান দক্ষিণা চায়, সে আমাদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিল! তোমার কাছে এসেছি কিছু ঋণের জন্য। (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার এসব কথায় সুযোগ পেয়ে) কা'ব বলে উঠল, মাত্র তো শুরু! আল্লাহর কসম! তার প্রতি তোমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাবে! মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বলেলেন, তা ঠিক! তবে যেহেতু তাকে মেনেই ফেলেছি, তাই এখনই মনে হয় তার সঙ্গ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। শেষটা কোনদিকে গড়ায়, একটু দেখা দরকার। যা হোক, তো তুমি আমাকে কিছু খাবার ধার দাও। এই ধরো দু'-এক 'ওয়াসাক' হলেই চলবে।... ঠিক আছে, তাহলে কিছু একটা বন্ধক রাখ আমার কাছে । কী চাও তুমি? তোমাদের নারীদের বন্ধক রাখ।

কী যে বলো, এটা কী করে সম্ভব! তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ! (তোমাকে ছেড়ে আমাদের মহিলারা আর যেতে চাইবে না।) আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখ। না, সেটাই বা কীভাবে করি! ভবিষ্যতে লোকে আমাদের ছেলেদের গালি দিয়ে বলবে, তোমাকে তো এক দুই ওয়াসাক খাবারের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল! এটা আমাদের জন্য খুব লজ্জার বিষয়। তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখি। (অস্ত্রের কথা বলেছেন, যাতে হত্যার সময় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে কোন আপত্তি না হয়।) ঠিক আছে, তা-ই কর। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্ত্র নিয়ে আসার ওয়াদা করে চলে গেলেন।... ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অঙ্গিকারমতো কা'বের কাছে এলেন। রাতের বেলা। তার সাথে আসলেন কা'বের দুধ ভাই আবু নায়িলা। (এ ছাড়াও আরো তিনজন সহ মোট পাঁচজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাকিউল গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে নামায ও দোয়ায় লিপ্ত থাকেন।) ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাসায় এসে কা'বকে ডাক দিলেন এবং দূর্গে আসতে আহ্বান করলেন। ডাক শুনে কা'ব নেমে এল। (কা'ব তখন মাত্র বিয়ে করেছে)। স্ত্রী আপত্তি করল, এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি?

কা'ব বলল, এই তো, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়িলা এসেছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, স্ত্রী বলল, আমার তো মনে হচ্ছে আমি রক্তঝরা আওয়াজ শুনছি। কা'ব বলল, আরে সে তো আমারই ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং আমার দুধভাই আবু নায়িলা! সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাতের বর্শা লড়াইয়ে ডাক পড়লেও সাড়া দিতে ভয় করে না। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সঙ্গে আরো দু'জন লোক নিয়ে এসেছেন। তদের বলে রাখলেন, কা'ব আসলে আমি তার চুলে ধরে সুগন্ধি গ্রহণ করব। যখন দেখবে, মাথাটা শক্ত করে ধরেছি, এক আঘাতে মাথাটা গর্দান থেকে আলাদা করে ফেলবে। কা'ব একটি চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসল। তার শরীর থেকে খুশবু ছড়াচ্ছে। মুহাম্মাদ বললেন, এত চমৎকার সুগন্ধ তো আর কখনো পাইনি! আমি কি তোমার এই সুঘ্রাণ নিতে পারি? কা'ব বলল, হাঁ, 'অবশ্যই পারো'। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'বের চুল ধরে গন্ধ শোঁকলেন। তারপর সঙ্গীদেরও শোঁকালেন। কিছুক্ষণ পর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আবার গন্ধ শোঁকার অনুমতি চাইলেন। কা'ব আবারও অনুমতি দিল। এবার তিনি সুযোগ মতো কা'বের মাথাটা ঝাপটে ধরে সঙ্গীদের ইশারা করলেন- দাও কোপ। এভাবে তারা তাকে হত্যা করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (অভিযান সফল হবার) সুসংবাদ দিলেন।" **সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৪০৩৭, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম তার মাথা কেটে নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিক্ষেপ করেন। বর্ণনায় এসেছে, আঘাত খেয়ে কা'ব বিন আশরাফ চিৎকার দিয়ে উঠে। চিৎকার শুনে ইয়াহুদিরা জমায়েত হয়ে যায় এবং সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ভাবন করে। তবে ভিন্ন পথে রওয়ানা হওয়ায় তারা সাহাবায়ে কেরামকে পায়নি।

পরের দিন সকাল বেলা ইয়াহুদিরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নালিশ করে যে, আমাদের সর্দার গতরাত গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কা'বের অপরাধগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতে ইয়াহুদিরা ভয় পেয়ে যায়। আর কিছু বলার সাহস পায়নি। [দেখুন: ফাতহুল বারি, কিতাবুল মাগাজি, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ]

***

এ ঘটনা গুপ্ত হত্যার সুস্পষ্ট দলীল। ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল জিহাদে এ ঘটনা নিম্নোক্ত শিরোনামে এনেছেন,

باب الفتك بأهل الحرب

'হরবি কাফেরদের সুযোগ বুঝে হত্যা করে দেয়া(র বৈধতা) সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ'।

মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ শিরোনামের ব্যাখ্যায় বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

قوله باب الفتك بأهل الحرب أي جواز قتل الحربي سرا. اهـ

"হরবিকে গোপনে হত্যা করে দেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।" -ফাতহুল বারি ৬/২০৫

কাস্তাল্লানি রহ. (৯২৩ হি.) বলেন,

(باب) جواز (الفتك) بفتح الفاء وسكون الفوقية آخره كاف (بأهل الحرب) أي قتلهم على غفلة. اهـ

"অন্যমনস্কতার সুযোগে হরবিকে হত্যা করে দেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।"- ইরশাদুস সারি ৫/১৫৫

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

قاله بعض شيوخنا قال : إن قتل ابن الأشرف هو من باب أن من آذى الله ورسوله قد حل دمه ، ولا أمان له يعتصم به فقتله جائز على كل حال ؛ لأن الرسول (ﷺ) إنما قتله بوحى من الله وأذن فى قتله فصار ذلك أصلا فى جواز قتل من كان لله ولرسوله حربًا. اهـ بطال 5\190

"আমাদের কতক মাশায়িখ বলেন, কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেবে, তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে এবং কোন আমান তার রক্তের সুরক্ষা দিতে পারবে না। বিধায় সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হত্যা করেছেন।

ফলে এটি একটি সার্বজনীন মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীদের হত্যা করে দেয়া বৈধ।”- শরহু ইবনি বাত্তাল লি সহীহিল বুখারি ৫/১৯০

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) কিতাবুল মাগাজিতে এ হাদিসের ব্যাখ্যা শেষে বলেন,

وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. اهـ

“এ হাদিস দলীল যে, কোন মুশরিকের কাছে যখন সাধারণ দাওয়াত পৌঁছে যায়, তখন (দ্বিতীয়বার) দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাকে হত্যা করে দেয়া বৈধ।” –ফাতহুল বারি ৭/৪১২

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/newreply.php?p=৬২৯০৭

সংশয় নিরসন- ০২

খ. গুপ্ত হত্যা-

হাদিস ২. আবু রাফের ঘটনা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-২০-২০১৯

ইয়াহুদি আবু রাফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইক। তাকে সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক-ও বলা হয়। সে হিজাযের বড় ব্যবসায়ী ছিল। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিল। খায়বারের পাশেই হিজাযের একটি দূর্গে সে থাকতো। সে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর দুশমন। গাতফানসহ আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রকে সে আর্থিক সহায়তার মধ্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দিত। আনসারি সাহাবিগণ দুর্ধর্ষ এক অভিযানের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন।

মদীনার আনসারি সাহাবিগণ প্রধান দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন: আউস ও খাযরাজ। তাদের মাঝে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চলতো। এক গোত্র কোন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিলে অন্য গোত্রের আর প্রশান্তি হতো না- যতক্ষণ না তারাও অনুরূপ কোন কৃতিত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার মর্যাদা লাভ করেছিলেন আউস গোত্রের সাহাবাগণ। খাযরাজ গোত্রের সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন, আউসের সাহাবাগণ এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব লাভ করেছেন যা তাদের নেই। এতে তারা মনস্থির করলেন, কা'ব বিন আশরাফের মতো আরও কোন নবীর দুশমনকে হত্যা করে তারাও এই মর্যাদা লাভ করবেন। পরস্পরে পরামর্শ করলেন- কা'ব বিন আশরাফের মতো আর কে আছে এমন নবীর দুশমন? শেষে দেখলেন, আছে একজন। সে হল ইয়াহুদি আবু রাফে। মনস্থির করলেন, একেই হত্যা করা যায়।

নিজেরা পরামর্শের পর খাযরাজের সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবু রাফেকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ছয়জনের একটি ছোট্ট সারিয়্যা পাঠালেন আবু রাফেকে হত্যার জন্য। তারা হলেন,

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (সারিয়্যার আমীর)।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা।

৩. মাসউদ ইবনে সিনান।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস।

৫. আবু কাতাদা।

৬. খুযায়ি ইবনে আসউয়াদ- রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

তাদের মধ্যে সারিয়্যার আমীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াহুদিদের ঢঙে কথা বলতে পারতেন। তিনি সন্ধা বেলা কৌশলে দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আবু রাফেকে হত্যা করেন।

ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাজিতে বিভিন্ন সনদে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত উভয়ভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল জিহাদের এক বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب ﷺ قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيمن خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবু রাফেকে হত্যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারিদের কয়েকজনের একটি দল প্রেরণ করলেন। তাদের একজন (তথা আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) দূর্গে প্রবেশ করল। তিনি বলেন, দূর্গে প্রবেশ করে আমি তাদের একটি পশুর আস্তাবলে লুকিয়ে গেলাম। তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে

দিল। এরপর তারা দেখলো যে, তাদের একটি গাধা খুঁজে পাচ্ছে না। গাধা খুঁজতে তারা বাহিরে বেরিয়ে এল। তাদের সাথে আমিও বেরিয়ে এলাম। আমি তাদেরকে দেখাচ্ছি, যেন আমিও তাদের সাথে গাধা তালাশ করছি। খোঁজাখুঁজি করে তারা গাধা পেল এবং দূর্গে চলে এল। আমিও চলে এলাম। রাতে দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল এবং চাবিগুলো দেয়ালের একটি ছিদ্রের ফাঁকে রাখলো, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।"- **সহীহ বুখারি: ২৮৫৯**

কিতাবুল মাগাজির বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه أجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب أغلقت علي من الداخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت يا أبا رافع قال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى أنتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد أنتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة

فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال (ابسط رجلك) . فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদি আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং (মুশরিকদেরকে) তার বিরুদ্ধে সহায়তা করত। সে (খায়বারের কাছাকাছি) হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গে বাস করত। সাহাবায়ে কেরাম যখন তার দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছলেন, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন তাদের পশুগুলোকে চারণভূমি থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীদের বললেন, তোমারা এখানেই বসে থাক। আমি যাই। দারোয়ানের সাথে কোন কৌশল করে ঢুকতে পারি কি’না দেখি।

তিনি দরজার কাছে পৌঁছলেন। পৌঁছে কাপড় মুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসে গেলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। এতক্ষণে লোকজন দূর্গে ঢুকে গেছে। দারোয়ান আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! ঢুকতে চাইলে ঢুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি।

আমি ঢুকে গেলাম। ঢুকে (আস্তাবলে) লুকিয়ে গেলাম। সবার ঢুকা শেষ হলে দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। চাবিগুলো একটি পেরেকে লটকিয়ে রাখল। তিনি বলেন, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম। দরজা খুললাম। আবু রাফের অভ্যাস ছিল, রাতে তার কাছে খোশ-গল্পের আসর বসত। সে দূর্গের উপরের তলায় থাকত। তার গল্পের সঙ্গীরা যখন চলে গেল, আমি সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠলাম। আমি যে দরজাই খুলতাম, ভিতর থেকে লাগিয়ে দিতাম; এই ভেবে যে, যদি লোকজন আমার ব্যাপারে টের পেয়ে যায়, তাহলে হত্যা করে শেষ করা পর্যন্ত যেন তারা আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। আমি তার কক্ষে পৌঁছলাম।

(অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি গিয়ে আবু রাফেকে ডাক দেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তিনি জওয়াব দেন, আমি আবু রাফের জন্য একটু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। এতে স্ত্রী দরজা খোলে দেয়।) সে অন্ধকার কক্ষে তার পরিবারের লোকদের মাঝখানে শুয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলাম না যে, ঠিক কোথায় সে। ডাক দিলাম, আবু রাফে! সে জওয়াব দিল, এই লোক কে? আমি আওয়াজটা লক্ষ করে তরবারি চালালাম। আমার তখন দিশেহারার মতো অবস্থা। কিন্তু না! কোন কাজ হল না। উল্টো সে চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অল্প কিছুক্ষণ পর আবার গেলাম। (গলার স্বর পরিবর্তন করে যেন আমি তাকে সাহায্য করতে এসেছি এই ভান করে) বললাম, 'আবু রাফে! আওয়াজ কিসের'? সে উত্তর দিল, 'তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! এই মাত্র কক্ষে এক ব্যক্তি আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে'। তিনি বলেন, এবার আরেকটা কোপ দিলাম। এতে সে মারাত্মক জখম হল। কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না। এরপর আমি তরবারির ধারালো দিকটা তার পেটের উপর ধরে সজোরে চাপ দিলাম। একেবারে পিটে গিয়ে ঠেকল। বুঝতে পারলাম, হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর একেক করে দরজাগুলো খুলতে লাগলাম। আসতে আসতে একটা সিঁড়িতে এসে পা রাখলাম। (আমি চোখে একটু কম দেখতাম।) রাত ছিল চাঁদনী। মনে করেছি (সব সিঁড়ি শেষ) নিচে এসে গেছি। (কিন্তু তখনও একটি সিঁড়ি বাকি ছিল)। আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেল। পাগড়ি খোলে পা বেঁধে নিলাম।

সেখান থেকে এসে দরজার নিকট বসে রইলাম। বললাম, হত্যা করতে পেরেছি কি'না জানা পর্যন্ত আজ রাতে আর বের হচ্ছি না। যখন (ভোর হল এবং) মোরগ ডাকতে লাগল, তখন ঘোষক প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা দিল, 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে মারা গেছে'।

ঘোষণা শুনে (নিশ্চিত হয়ে) আমার সঙ্গীদের নিকট এলাম। বললাম, তাড়াতাড়ি পালাও। আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। (এরপর আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম আর রাতের বেলা পথ চলতাম। এভাবে খায়বার থেকে মদীনায় উপস্থিত হলাম।) তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, তোমার পা এদিকে বাড়াও দেখি। পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এমনভাবে ভাল হয়ে গেলাম, যেন কখনও কোন ব্যথাই পাইনি।"- **সহীহ বুখারি: ৩৮১৩, কিতাবুল মাগাজি।**

***

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) এ ঘটনা থেকে উৎসারিত বিধানাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. اهـ

"এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, যেসব মুশরিক দাওয়াত পৌঁছার পরও কুফরে অটল থাকবে, তাদের গুপ্ত হত্যা করা জায়েয। বুঝা গেল, যে ব্যক্তি হাত, মাল বা যবান- কোনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সহায়তা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। বুঝা গেল, হরবিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং সুযোগ সন্ধান জায়েয।"- **ফাতহুল বারি: ৭/৩৪৫, কিতাবুল মাগাজি**

অন্যত্র বলেন,

وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة أن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. اهـ

"এ হাদিস দলীল যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং সুযোগ সন্ধান জায়েয। তাদের মধ্যে যারা অত্যধিক কষ্টপ্রদায়ি, তাদের গুপ্ত হত্যা জায়েয। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুশমনি পোষণ করতো এবং লোকজনকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দিত। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, মুশরিকের কাছে

একবার দাওয়াত পৌঁছে গেলে, দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাকে হত্যা করা জায়েয।”- **ফাতহুল বারি: ৬/১৫৬, কিতাবুল জিহাদ**

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৭৫২

সংশয় নিরসন- ০২

খ. গুপ্ত হত্যা

হাদিস ৩. খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির ঘটনা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-২৮-২০১৯

মুশরিক খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান তাকে হত্যা করার জন্য। তিনি কৌশলে একে হত্যা করেন এবং কর্তিত মস্তক এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেন। চতুর্থ হিজরির শুরুতে মুহাররাম মাসের ৫ তারিখ রোজ সোমবার তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। হত্যা করে ১৮ দিন পর শনিবার মদীনায় উপস্থিত হন।

ইমাম আহমাদ রহ., আবু দাউদ রহ. ও বাইহাকি রহ.সহ আরো অনেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আহমাদ রহ. এর বর্ণনাটি তুলনামূলক বিস্তারিত। এ বর্ণনায় এসেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

دعاني رسول الله ﷺ فقال :أنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فاته فأقتله قال قلت يا رسول الله أنعته لي حتى أعرفه قال إذا رأيته وجدت له اقشعريرة قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله ﷺ من الاقشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت و أنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك قال فمشيت

معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله ﷺ فرآني فقال أفلح الوجه قال قلت قتلته يا رسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله ﷺ فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا قال قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها قالوا أولا ترجع إلى رسول الله ﷺ فتسأله عن ذلك قال فرجعت إلى رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا قال آية بيني وبينك يوم القيامة أن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. (المسند للإمام أحمد بن حنبل، 16090)

تعليق شعيب الأرنؤوط : ابن عبد الله بن أنيس - وهو عبد الله بن عبد الله بن أنيس كما جاء مبينا من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن اسحق عند البيهقي - ترجم له البخاري في التاريخ 5 / 125 وابن أبي حاتم 5 / 90 وابن حبان في الثقات 5 / 37 ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا وباقي رجال الإسناد ثقات غير محمد بن اسحق روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وقد صرح بالتحديث وأخرجه أبو يعلى 905 وابن خزيمة 982 و 983 وابن حبان 7160 وأخرجه أبو داود 1249 مختصرا وحسن الحافظ في الفتح إسناد أبي داود [

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে নুবাইহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। সে (মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে) উরানা উপত্যকায় আছে। তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আস। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি তো তাকে চিনি না) তাকে চেনার আলামত বলে দিন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তাকে চেনার আলামত হল,) যখন তুমি তাকে দেখবে, তখন তার ভয়ে তোমার মাঝে খানিকটা কম্পন অনুভব হবে।

(এ আলামত বাতলানো মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাধারণত কাউকে দেখে ভয় পেতেন না। এজন্য ঠিক এর বিপরীতে ভয় পাওয়াকে আলামত বানানো হয়েছে।)

তিনি বলেন, আমি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে উরানা উপত্যকায় ছিল। তার সাথে তার স্ত্রীরা ছিল। তাদের নিয়ে অবতরণের জন্য সে একটি ভাল জায়গা তালাশ করছিল। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন তাকে দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণ অনুযায়ী আমার মাঝে কিছুটা ভীতিজনিত কম্পন অনুভব করলাম। (এতে বুঝতে পারলাম যে, সে-ই আল্লাহর রাসূলের দুশমন খালেদ ইবনে সুফিয়ান।)

(তিনি বলেন,) আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, তার কাছে পৌঁছতে আমার কিছুটা সময় লাগবে, যার ফলে আমার নামায ছুটে যাবে। তাই আমি হাঁটতে হাঁটতে মাথার ইশারায় রুকু-সাজদা করে নামায আদায় করে নিলাম। আমি তার কাছে পৌঁছলে সে জিজ্ঞেস করল, মিয়া! তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, '(আমি) আরবের লোক, যে আপনার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছে যে, আপনি এই (মুহাম্মাদ) লোকটির বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছেন; তাই সে আপনাকে সাহায্য করতে এসেছে'। সে জওয়াব দিল, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি এরই প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি বলেন, আমি তার সাথে খানিক্ষণ চললাম। (তার সাথে কথা-বার্তা বলতে বলতে ভাব জমালাম, আর তাকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিলাম।) অবশেষে যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তরবারি চালালাম। (তরবারির আঘাতে) তাকে হত্যা করলাম। এরপর (তার কর্তিত মস্তকটি নিয়ে) সেখান থেকে পালালাম। তার স্ত্রীদেরকে তার উপর পড়ে ক্রন্দনরত রেখে আসলাম।

(এরপর তিনি পাহাড়েরর একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। হত্যাকারীকে খোঁজে বের করার জন্য লোক পাঠানো হল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা তাকে খোঁজে পায়নি। এরপর তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে মদীনায় উপস্থিত হন।)

(তিনি বলেন,) যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমাকে দেখতে পেলেন, (খুশিতে) বলে উঠলেন,

(তোমার) চেহারা কামিয়াব হোক! তিনি বলেন, আমি সংবাদ দিলাম, তাকে হত্যা করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছ। (বলা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই অহীর মাধ্যমে হত্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন।)

(তিনি বলেন,) এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে উঠলেন। তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাকে একটি লাঠি উপহার দিলেন এবং সেটি আমার কাছে রাখতে আদেশ দিলেন। আমি লাঠিটি নিয়ে লোকজনের কাছে আসলাম। তারা আমার কাছে আবেদন করলো, 'তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ লাঠির হেতু জিজ্ঞেস করতে পারবে না'? তিনি বলেন, (তাদের আবেদনে) আমি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আমাকে এ লাঠি দিয়েছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কেয়ামতের দিন তোমার ও আমার মাঝের সম্পর্কের পরিচয়বাহক হবে। (তখন আমি তোমার জন্য শাফাআত করে জান্নাতে তোমার মর্তবা বৃদ্ধি করতে পারবো। আর তুমি জান্নাতে এ লাঠিতে ভর দিয়ে যেভাবে চাও রাজত্ব করবে। আর শোন,) কেয়ামতের সেদিনে লাঠিতে ভর দেয়ার মর্যাদা কম লোকই লাভ করবে।

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু লাঠিটি তার তরবারির সাথে মিলিয়ে নিলেন। সেটি এরপর থেকে তার কাছেই ছিল। (অসীয়ত করে গেলেন, মারা গেলে যেন লাঠিটি তার কাফনে দিয়ে দেয়া হয়।) তিনি যখন মারা গেলেন, (অসীয়ত মতো) লাঠিটি তার কাফনে দিয়ে দেয়া হল এবং লাঠিসহ দাফন করা হল।"- **মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৬০৯০**

***

এ হাদিস থেকে অতিরিক্ত একটি মাসআলা জানা গেল যে, গুপ্ত হত্যার জন্য একাকী অভিযান চালানোও জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একাই পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি একাই হত্যা করে ফিরে এসেছেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৩৩

সংশয় নিরসন- ০২

খ. গুপ্ত হত্যা

হাদিস-৪: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-৩১-২০১৯

একাকী জিহাদ ও গুপ্ত হত্যার ইমাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ঘটেছে ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটা শর্ত ছিল, মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে এলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে, তবে মদীনার কেউ মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গেলে তাকে মদীনায় পাঠনো হবে না। বাহ্যত এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানকর মনে হলেও আল্লাহ তাআলা একেই ঘোষণা দিয়েছেন, 'ফাতহুম মুবিন- সুস্পষ্ট বিজয়'। আর বাস্তবেও এমনই ছিল।

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ইমাম বুখারী রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন,

ثم رجع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه (لقد رأى هذا ذعرا) . فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قتل والله صاحبي و إني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم قال النبي

صلى الله عليه و سلم (ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد) . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن آتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إليهم فأنزل الله تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية حمية الجاهلية}

“এরপর (সন্ধি শেষে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে এলেন। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু- যিনি কুরাইশ গোত্রের লোক- (পালিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু‘জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন এবং আবু বাসীরকে ফেরত দিন)। তিনি তাকে ঐ দুই ব্যাক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তাঁরা তাকে নিয়ে (মক্কায়) রওয়ানা হল। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল। সেখানে তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল।

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারিটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই। আমাকে দেখাও। লোকটি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তলোয়ারটি দিল। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছল এবং দৌঁড়তে দৌঁড়তে মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। লোকটি যখন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হল বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, (আপনার রক্ষা না করলে) আমিও শহিদ হতে যাচ্ছি। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার চুক্তি পূর্ণ করেছেন। আপনি (চুক্তিমতো) আমাকে তাদের কাছে ফেরত দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বনাশ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলনকারী। যদি তাকে সহায়তা করার কেউ থাকতো!

(মুশরিক লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা থেকে বুঝেছিল যে, যদি তার আরো কতক সাথী থাকতো তাহলে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করে পালাতে পারতো না। তবে প্রচ্ছন্নভাবে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন যে, তুমি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন জ্বালাও। এ কাজের জন্য তোমার সাথে আরো কিছু সাথী থাকলে ভাল হবে। এজন্য মক্কার নির্যাতিত মুসলমানগণ যেন পালিয়ে তোমার সাথে মিলিত হয়। চুক্তি থাকার কারণে সরাসরি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলতে পারছিলেন না। তাই ঈঙ্গিতে বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে এমনই বলেছেন।)

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ কথা শুনলেন, বুঝতে পারলেন, (এখানে থাকলে) তিনি তাকে আবার কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সমূদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চলে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দিকে আবু জানদাল ইবনু সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন যে-ই পালাতে পারতো, সে-ই আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে (চল্লিশ বা সত্তরজনের মতো) তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে, তখনই তারা তাদের পথ অবরোধ করতেন। তাদের হত্যা করতেন। তাদের মাল-সম্পদ কেড়ে নিতেন। (অবস্থা বেগতিক দেখে) কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করল, 'আপনি আবু বাসীরের কাছে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে (মক্কা থেকে) কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের কাছে (এ মর্মে) নির্দেশ পাঠালেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন: **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ** থেকে **الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ** পর্যন্ত।"- **সহীহ বুখারী ২৫৮১**

ঘটনার পরের অংশের বিবরণে হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر. اهـ

"মূসা ইবনে উকবা রহ. যুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র পাঠালেন। তার কাছে যখন চিঠি পৌঁছল, তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি হাতে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই তাকে দাফন করেন এবং তার কবরের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বলেন, (এরপর) আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা মদীনায় চলে আসেন। তখন থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি শামে জিহাদে যান এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন।"- **ফাতহুল বারি ৫/৩৫১**

এ হাদিস একাকী জিহাদ ও গুপ্ত হত্যার সুস্পষ্ট ও আমলী দলীল। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফের লোকটিকে হত্যা করলেন। অপরটিকে ধাওয়া করে মদিনা পর্যন্ত নিয়ে এলেন। সমূদ্র উপকূলে গিয়ে যখন আশ্রয় নিলেন, আস্তে আস্তে একটা তায়েফা হয়ে গেল, মুশরিকদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো টার্গেট করে আক্রমণ করলেন, হত্যা করলেন, লুণ্টন করলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের কোনটির উপরই কোন আপত্তি করলেন না। বরং প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দিলেন। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হামলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সমর্থন ও উৎসাহ সুস্পষ্ট দলীল যে, ইমাম না থাকাবস্থায় একাকী বা ছোট্ট তায়েফা মিলে জিহাদ করতে এবং হরবি কাফেরদের গুপ্ত হত্যা করতে কোন সমস্যা নেই। চুক্তি নেই এমন যেকোন কাফেরকে বাগে পেয়ে হত্যা করা যাবে। এককভাবেও করা যাবে, তায়েফাগতভাবেও করা যাবে। প্রকাশ্যেও করা যাবে, গোপনেও করা যাবে। হত্যাও করা যাবে, লুণ্টনও করা যাবে। কোনটাতেই কোন সমস্যা নেই।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي قوله ذلك وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية. اهـ

“আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা প্রমাণ যে, সীমালঙ্ঘনকারী মুশরিককে গুপ্ত হত্যা করা যাবে এবং আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা করেছেন, তা গাদ্দারি নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিতে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কেননা, তিনি তখন মক্কায় বন্দী ছিলেন। তবে যখন তার আশঙ্কা হল যে, মুশরিকটি তাকে (মক্কার) মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তাকে হত্যা করে নিজের প্রতিরক্ষা করেছে। এর মাধ্যমে তিনি

আপন দ্বীন রক্ষা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথায় কোন আপত্তি করেননি।

এ থেকে এও বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো (হত্যা ও লুণ্টন) করবে, তার উপর কিসাস বা দিয়াত কোন কিছু বর্তাবে না।”- **ফাতহুল বারি ৫/৩৫১**

আমরাও একই কথা বলি: আমাদের মুসলিম ভাইদের যদি তাগুতি শাসন বিলুপ্ত করার সামর্থ্য নাও থাকে, তথাপি তারা যেখানেই পাবেন তাগুত, তাগুত বাহিনির সৈন্য ও কাফের-মুরতাদদের হত্যা করবেন। এতে তাদের উপর না কোন কিসাস বর্তাবে, আর না কোন দিয়াত। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাবেন অশেষ প্রতিদান। আর শহিদ হলে পাবেন শাহাদাতের মর্যাদা।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৬০

গুপ্ত হত্যা (শেষ পর্ব)

বিবিধ ফাওয়ায়েদ

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-০২-২০১৯

বিবিধ ফাওয়ায়েদ

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে গুপ্ত হত্যার দালিলিক আলোচনা দেখলাম। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যদিও গুপ্ত হত্যার বৈধতা, তবে গুপ্ত হত্যার এ দলীলগুলো থেকে আরো অনেক বিষয় উৎসারিত হয়। আমরা সেসব উৎসারিত ফাওয়ায়েদের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করবো।

ফায়েদা-১: জিহাদের মাসলাহাত ও জরুরতে ক্ষেত্রবিশেষে তাওরিয়া করা (কথা ঘুরিয়ে বলা) এমনকি মিথ্যা ও কুফরি কথা বলাও জায়েয। যেমনটা কা'ব বিন আশরাফ ও খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালিকে হত্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। অবশ্য নিরেট মিথ্যা বলা বৈধ কি'না তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। তবে সবচেয়ে ভাল হল নিরেট মিথ্যা না বলে তাওরিয়া করা। অবশ্য যদি তাওরিয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মিথ্যা না বলে উপায় নেই।

ফায়েদা-২: স্বল্পসংখ্যক মুসলমান বিপুল সংখ্যক কাফেরের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া বৈধ। আমরা দেখেছি, গুপ্ত হত্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম কাফের নেতাদের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে গেছেন, যেখানে বিপুল সংখ্যক কাফের বিদ্যমান ছিল। এমনকি কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ভাবনও করেছে- যদিও আল্লাহর রহমতে তাদের ধরতে পারেনি।

ফায়েদা-৩: একাকি সারিয়্যা ও অভিযান বৈধ। যেমনটা খালেদ ইবনে সুফিয়ানের হত্যার ঘটনায় এবং আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় দেখেছি।

ফায়েদা-৪: মাসলাহাত মনে হলে কাফের নেতাদের হত্যা করে মাথা কেটে নিয়ে আসা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফ ও হুজালির মাথা নিয়ে এসেছেন।

ফায়েদা-৫: যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কটুক্তি করবে বা তার শানের অবমাননা করবে, তাদের কোন আমান নেই। তাকে আমান দিয়েও হত্যা করা যাবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফকে আমান দিয়েও হত্যা করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে দ্বিমত আছে।

ফায়েদা-৬: যেসব কাফেরের কাছে একবার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে কিন্তু সে কুফর পরিত্যাগ করেনি, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া ছাড়াই হত্যা করা যাবে।

ফায়েদা-৭: কাফেরদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালানো ও আত্মগোপন করা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফ, আবু রাফে ও হুজালিকে হত্যা করে পালিয়েছেন এবং আত্মগোপন করেছেন।

ফায়েদা-৮: ঘুমন্ত কাফেরকে হত্যা করা জায়েয- যদি জানা যায় যে, সে কুফরে অটল আছে। যেমন আবু রাফের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা করা হয়েছে।

ফায়েদা-৯: ইমাম না থাকাবস্থায় জিহাদ জায়েয; যেমনটা আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় দেখেছি যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়ত্বাধীন না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করেছেন।

ফায়েদা-১০: যদি মুসলমানদের সার্বজনীন এক ইমাম না থাকে এবং তারা বিভিন্ন শাসকের অধীনে থাকেন, তাহলে কাফেরদের সাথে এক শাসকের কৃত চুক্তি অন্য শাসক ও তার অধীনস্তদের উপর বর্তাবে না। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত চুক্তি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বর্তায়নি। ফলে তিনি মক্কার মুশরিকদের হত্যা ও লুণ্টন করেছেন।

ফায়েদা-১১: দুর্বলতা ও ভীরুতা মুমিনের শান নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা কাম্য। উল্লিখিত চারটি ঘটনাতেই আমরা সাহাবায়ে কেরামের অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় পেয়েছি।

ফায়েদা-১২: যুদ্ধের মূল উপাদান হল কৌশল। জনবল ও অস্ত্রবলের সাথে সাথে কৌশলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই দেখেছি যে, কৌশলের কারণে সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সফলতা পেয়েছেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্ভবপর মনে হচ্ছিল না।

ফায়েদা-১৩: কাফেরদের অস্ত্র দিয়ে কাফেরদের হত্যা করা বৈধ। যেমন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকটির নিজের অস্ত্র দিয়েই তাকে হত্যা করেছেন।

এছাড়াও আরো অনেক ফাওয়ায়েদ আছে। আপাত দৃষ্টিতে এ ক'টিই মনে পড়ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের জন্য ফিদা হওয়ার তাওফিক দান করুন। কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৮৩

ওয়ালা-বারা এবং শরীফ হাতেম আলআউনীর বিভ্রান্তি

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-১৩-২০১৯

ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কুরআন বা দ্বীনে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট নয়। তদ্রূপ বিশ্বাসের পাশাপাশি মহব্বত রাখাও যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস ও মহব্বতের পাশাপাশি দ্বীনে ইসলামকে তা'জিম করা, তা'জিম পরিপন্থী কোন কিছু না করা এবং দ্বীনে ইসলামের আনুগত্য অবধারিতরূপে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক।

একইভাবে ঈমান আনার পর শুধু বিশ্বাস রাখা বা মহব্বত রাখাই ঈমানের উপর বহাল থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস ও মহব্বত রেখেও যদি কোন কুফরি করে বা তা'জিম পরিপন্থী কোন কাজ করে, তাহলে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার বিশ্বাস ও মহব্বত তাকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না। এর দলীল-

ক. আহলে কিতাবরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস করতো। কিন্তু এরপরও তারা কাফের। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চেনে, যেমন চেনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে গোপন করে, অথচ তারা জানে।"- বাক্বারা ১৪৬

অন্য আয়াতে বলেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চেনে যেরূপ চেনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না।”- আনআম ২০

খ. ফিরআউন এবং তার কওমের ব্যাপারে বলেন,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।”- নামল ১৪

অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখার পরও তারা কাফের ছিল।

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস করতেন এবং মহব্বতও করতেন। কিন্তু রাসূলের দ্বীনের আনুগত্য গ্রহণ না করায় কাফের ছিলেন।

ঘ. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করতো এবং মহব্বতও করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছতে পারলে তার কদম মোবারকের ধূলি ধোয়ে দেবে বলে তামান্নাও রাখতো। কিন্তু রাসূলের দ্বীনের আনুগত্য গ্রহণ না করায় কাফের ছিলো।

কাশ্মিরি রহ. (১৩৫২ হি.) বলেন,

وهذا القرآن يشهدُ بمعرفة الكفار، قال تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ} [البقرة: 146] وهذا أبو طالب يُقِرُ بنبوتِهِ ونباهته صلى الله عليه وسلّم ويُعْلِنُ بها في أبياته، حتى دارت وسارت، فيقول:

ودعوتَني وزعمتَ أَنَّكَ صادِق ... وصدقت فيه وكنت ثَمّ أمِينًا

وعرفتُ دينَك لا محالةَ أنه ... من خيرِ أديانِ البَرِيَّةِ دِينا

لولا الملامةُ أو حَذَارِ مَسَبَّةٍ ... لوجدتَّني سمحًا بذاك مُبِينًا

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أني أَخْلُصُ إليه لتجَشَّمْتُ لقاءه، ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عن قدميه، وفي «فتح الباري»: عن مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العلم: أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأَعْلَمُ أنه نبيٌّ مرسل، ولكني أخاف الرومَ على نفسي، ولولا ذلك لاتَّبعتُهُ. فهل تريدُ من التصديق أمرًا وراء ذلك؟ فلما وُجِد منهم التصديقُ والتسليمُ والإقرارُ بهذه المثابة، وَجَبَ على التعريفِ المذكورِ أن يُحْكم عليهم بالإسلام، مع اتفاقهم على كونهم كافرين. فأقول: إنّ الجزءَ الذي يمتازبه الإيمان والكفر، هو التزام الطاعة (1) مع الردع والتبري عن دين سواه، فإذا التزم الطاعة فقد خرجَ عن ضلالة الكفرودخل في هَدْي الإسلام. وحينئذٍ تبين لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم، وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه، إلا أنه لم يلتزم طاعته، ولم يدخل في دينه، ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة .... إلخ، فآثر النار على العار. وهكذا هِرَقل، وإن تمنى لقاءه وَبجَّلَه وعظمه بظهر الغيب، لكنه خشي الرومَ أشدَّ خشية، فلم يلتزم طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم، فإنهم مع معرفتهم الحقَ، صفحوا عن كلمة الحق، ولم يَدِينُوا بدين الإسلام. اهـ فيض الباري شرح صحيح البخاري1/125 :، كتاب الإيمان.

“এই কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কাফেরদের মা’রেফত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তেমনই চেনে, যেমন চেনে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে।’ এই যে আবু তালেব! সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত ও মহত্বের স্বীকৃতি দিতো। তার কবিতার পংক্তিতে সে তা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে। সে বলছে,

*তুমি আমাকে আহ্বান করেছ এবং বলেছো যে, তুমি সত্যবাদি ... এতে তুমি সত্যই বলেছো এবং এ ব্যাপারে তুমি বিশ্বস্ত।

*আমি তোমার ধর্মকে চিনতে পেরেছি যে, ... নিঃসন্দেহে তা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

*যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... তাহলে আমাকে স্পষ্টরূপেই তা গ্রহণকারী বলে দেখতে পেতে।

এই যে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস! সে বলছে, 'আমি যদি জানতাম, আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে পৌঁছতে পারবো, তাহলে আমি অবশ্যই কষ্ট বরদাশত করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তাহলে তাঁর কদমের ধুলো◌াবালি ধুয়ে দিতাম।' ফাতহুল বারিতে ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসাল সনদে কোনো কোনো আহলে ইলম থেকে বর্ণিত আছে, হিরাক্লিয়াস বলেছিল, 'আফসোস তোমার জন্য! আল্লাহর কসম! আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী। কিন্তু আমি নিজের ব্যাপারে রোমানদের আশঙ্কা করছি। যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম।' এর চেয়েও অধিক তাসদিক আপনি চান? এমন পর্যায়ের তাসদিক, তাসলিম ও স্বীকারোক্তি যখন তাদের থেকে পাওয়া গেছে, তখন উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী তাদেরকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া আবশ্যক! অথচ তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

অতএব, আমি বলি, ঈমান ও কুফর পরস্পর থেকে আলাদা হবে যে মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে, তা হলো, (নিজের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আনুগত্য অবধারিত করে নেয়া, সাথে সাথে অন্য সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন আনুগত্য অবধারিত করে নেবে, তখন কুফরের গোমরাহি হতে বের হয়ে ইসলামের হেদায়াতে প্রবেশ করবে। আশা করি এখন আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাসদিক ও মা'রেফত থাকা সত্ত্বেও এসব কাফেরের কুফরির কারণ কি ছিল। কারণ, আবু তালেব যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম হক্ব বলে ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। তাঁর ধর্মে প্রবেশ করেনি। এ কারণেই সে বলেছে, 'যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... ।' লজ্জা (বরণের) অপেক্ষায় সে জাহান্নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হিরাক্লিয়াসও তা-ই করেছে। সে যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করেছে, অনুপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান করেছে, তা'জিম করেছে, কিন্তু সে রোমানদেরকে অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছে, ফলে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। ঐসব কাফেরদের অবস্থাও এমনই, যাদের ব্যাপারে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়েছেন: তাদের মা'রেফাত ছিল, কিন্তু হক্ব চেনার পরও তারা হকের কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেনি।"- ফায়জুল বারি, কিতাবুল ঈমান ১/১২৫

ঈমান না আনার পক্ষে কাফেরদের কতগুলো খোঁড়া যুক্তি উল্লেখ করার পর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي ﷺ ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به؛ بل لهوى النفس. اهـ

"এসব বিষয় এবং এর সমশ্রেণীর অন্যান্য বিষয় এমন কোন দলীল নয় যা রাসূলগণের সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। বরং প্রমাণ করে যে, এগুলো তাদের মনোচাহিদা, প্রবৃত্তি ও আদত-অভ্যাসের পরিপন্থী সাব্যস্ত হয়েছে। এ কারণেই তারা রাসূলগণের আনুসরণ করেনি। এদের সকলেই কাফের। বরং আবু তালেব ও আরো অনেকে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বতও করতো। তার কালিমা বলুন্দ হোক তাও চাইতো। তার প্রতি তাদের কোন প্রতিহিংসা ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু তারা জানতো যে, রাসূলের অনুসরণ করতে গেলে তাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম ছাড়তে হবে। কুরাইশরা তাদের গাল-মন্দ করবে। (পূর্ব পুরুষদের) ঐসব আদত-অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং এই গাল-মন্দ বরদাশত করার হিম্মত তাদের হয়নি। অতএব, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার সত্যতা না জানার কারণে ঈমান ছাড়েনি, বরং প্রবৃত্তির তাড়নায় ছেড়েছে।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ৭/১৯২-১৯৩

বুঝা গেল, কাফেরদের অনেকে সব কিছু জানা বুঝার পরও শুধু দুনিয়ার লোভে ঈমান আনেনি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“তা (অর্থাৎ তাদের কুফর) এ কারণে যে, তারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং (এ কারণে যে,) আল্লাহ তাআলা কাফের সম্প্রদায়কে (জোরপূর্বক) হেদায়াত দেন না।”- নাহল ১০৭

বুঝা গেল: বিশ্বাস, মহব্বত, স্বীকারোক্তি সব থাকার পরও যদি কেউ দুনিয়ার লোভে পড়ে ঈমান ত্যাগ করে, তাহলে সেও কাফেরই গণ্য হবে। তার বিশ্বাস, তার মহব্বত, তার স্বীকারোক্তি- এসব কোনই কাজে আসবে না।

একইভাবে ঈমান আনার পর যদি কেউ কোন কুফরি কাজ করে তাহলে তার বিশ্বাস, মহব্বত, স্বীকারোক্তি কোনই কাজে আসবে না। আহলে সুন্নাহর সকলের ঐক্যমতে সে মুরতাদ। যেমন, কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা সত্বেও তাকে নিয়ে কটাক্ষ করে, তাহলে সর্বসম্মতিতে সে মুরতাদ। শুধু দুনিয়ার লোভেও যদি করে তবুও মুরতাদ। অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ রাখা আবশ্যক নয়। তাকে মিথ্যা ভাবাও আবশ্যক নয়। সব ঠিকঠাক থাকার পরও যদি কোন দুনিয়াবি লোভে, অর্থ-কড়ি বা পদের বা চাকরির লোভে কটাক্ষ করে তবুও মুরতাদ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?! কোন অজুহাত দেখিও না। ঈমান আনার পর তোমরা যে কাফের হয়ে গেছো।”- তাওবা ৬৫-৬৬

***

উপরোক্ত আলোচনা বুঝার পর আশাকরি সহজে বুঝে আসবে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পরও, নিজেকে ইসলামের অনুসারি দাবি করার পরও শুধু দুনিয়ার লোভে বা চাকরি ঠিক রাখার খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরদের সহায়তা করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"- মায়েদা ৫১

এ ব্যাপারে আহলে ইলমদের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করছি:

এক. ইবনে হাযম রহ. (৪৫৬ হি.)

من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك. اهـ

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দারুল কুফর ও দারুল হরবে চলে যাবে এবং গিয়ে (দারুল হরবের) নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে তার এ কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে। মুরতাদের সকল বিধি বিধান তার উপর বর্তাবে। যেমন- ধরতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা ফরয, তার মাল হালাল, তার বিবাহ বাতিল ইত্যাদি।"- আলমুহাল্লাহ ১১/২৫০

আরো বলেন,

وكذلك: من سكن بأرض الهند، والسند، والصين، والترك، والسودان والروم، من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق، فهو معذور. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة، أو كتابة: فهو كافر. اهـ

"তদ্রূপ যে মুসলমান হিন্দুস্তান, সিন্দু, চীন, তুর্কিদের ভূমি, সুদান বা রোমে বসবাস করে; যদি সে পরিবার বড়, সম্পদের স্বল্পতা, শারীরিক দুর্বলতা বা রাস্তা অনিরাপদ হওয়ার কারণে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে সে মা'জূর। পক্ষান্তরে যদি সেখানে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খেদমত বা লিখনীর (মতো সামান্য কিছুর) দ্বারাও কাফেরদের সহায়তা করে, তাহলে সে কাফের।"- আলমুহাল্লা ১১/২৫০

উল্লেখ্য, এসব ভূমি তখন কাফেরদের ভূমি ছিল।

আরো বলেন,

ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام، و أقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه، و أقام معه - وإن ادعى أنه مسلم .اهـ

"যদি কোন সুস্পষ্ট কাফের মুসলমানদের কোন ভূমি দখল করে নেয় কিন্তু মুসলমানদেরকে আপন হালতে সেখানে বহাল রাখে; তবে উক্ত ভূমির মালিক সে-ই এবং সে-ই তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক, পাশাপাশি সে প্রকাশ্যে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম অনুসরণের দাবিদার হয়, তাহলে সেখানে থেকে গিয়ে যে-ই তাকে সহায়তা করবে এবং তার সাথে অবস্থান করবে, সে-ই কাফের হয়ে যাবে; যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে।"- আলমুহাল্লা ১১/২৫১

উল্লেখ্য, দারুল হরবে চলে যাওয়া বা থেকে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য নয়, মূলকথা হলো, যে ব্যক্তিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করবে, সেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

প্রথম বক্তব্যে فهو بهذا الفعل مرتد -'সে তার এ কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে'- কথাটা থেকে সুস্পষ্ট যে, কাফেরদের সহায়তা করা কাজটাই কুফর। আকীদা যা-ই হোক, এ কাজের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে। তদ্রূপ, শেষ বক্তব্যে وإن ادعى أنه مسلم-' যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে' থেকেও বিষয়টা স্পষ্ট। সহায়তা কি হালাল মনে করে করলো, না'কি হারাম মনে করে করলো; কাফেরদের মহব্বতে করলো বা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে করলো: এসব কিছু দেখার দরকার নেই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করলেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

দুই. হামদ ইবনে আতিক আননজদি রহ. (১৩০১ হি.)

مظاهرة المشركين ، ودلالتهم على عورات المسلمين ، أو الذب عنهم بلسان ، أو رضي بما هم عليه ، كل هذه مكفرات ، فمن صدرت منه – من غير الإكراه المذكور– فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين .اهـ

“কাফেরদের সহায়তা করা, মুসলমানদের গোপন খবরাখবর তাদের অবগত করা, যবান দিয়ে তাদের পক্ষ নেয়া, তাদের মত ও পথের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা: এ সবগুলোই কুফর। পূর্বোক্ত ইকরাহ-জবরদস্তী ব্যতীত যার থেকে এসব প্রকাশ পাবে, সে মুরতাদ; যদিও সে পাশাপাশি কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে এবং মুসলমানদের মহব্বত করে থাকে।”- আদদিফা আন আহলিস সুন্নাহ ৩০

লক্ষ করুন, **‘যদিও সে পাশাপাশি কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে এবং মুসলমানদের মহব্বত করে থাকে।’**

তিন. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) যেসব মুসলমান তাতারদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, তাদের তাকফির করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون. ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين - فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. اهـ

“সেনাবাহিনির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা অন্যান্য মুসলমানের মধ্য থেকে যারাই তাতারদের দলে যোগ দেবে, তাদের বিধান তাতারদেরই অনুরূপ হবে। চেঙ্গিস খান ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলী থেকে যে পরিমাণ রিদ্দাহ্য় লিপ্ত, তাদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ ইরতিদাদ বিদ্যমান। সালাফগণ যেখানে যাকাত আদায়ে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন; অথচ তারা নামাযও পড়তো, রোযাও রাখতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেনি; তখন ঐ ব্যক্তির কি বিধান হবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনদের সাথে মিলে মুসলমানদের হত্যা করে?!”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫৩০

অর্থাৎ সে আরো আগেই মুরতাদ হয়ে যাবে। এখানে তিনি এ শর্ত করেননি যে, যারা কাফেরদের মহব্বতে তাতারদের সাথে যোগ দেবে তারাই কেবল কাফের হবে, বাকিরা হবে না। ঢালাওভাবে সকলের উপর হুকুম লাগিয়েছেন।

চার. আহমাদ শাকের রহ. (১৩৭৭ হি.)

আগ্রাসী ইংরেজ ও ফরাসীদের সহায়তার বিধান আলোচনাকল্পে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও কাযি আহমাদ শাকের রহ. (১৩৭৭ হি.) বলেন,

أما التعاون مع الإنجليز، بأي نوع من أنواع التعاون، قل أو كثر، فهو الردة الجامحة، والكفر الصُّراح ... سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفروالردة سواء. اهـ

"ইংরেজদেরকে যেকোন প্রকারে সাহায্য করা- কম হোক বেশি হোক- তা সুনিশ্চিত রিদ্দাহ ও সুস্পষ্ট কুফর। ...সাহায্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক, রাষ্ট্রীয় হোক বা নেতৃস্থানীয় লোকদের থেকে হোক- রিদ্দাহ ও কুফরে সকলেই বরাবর।"- কালিমাতুল হক ৭৬

আরো বলেন,

ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أياً كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه. اهـ

"কোন ভূখণ্ডেই কোন মুসলিমের জন্য ফরাসীদের কোন রকম সহায়তা করা জায়েয হবে না। তাদেরকে সহায়তা করার বিধান ইংরেজদের সহায়তা করার অনুরূপ। অর্থাৎ, রিদ্দাহ ও সম্পূর্ণরূপে দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাওয়া; সহায়তাকারী যে বর্ণেরই হোক, যে শ্রেণীরই হোক আর যে জাতীরই হোক।"- কালিমাতুল হক ৭৭

এ শর্ত করেননি যে, ইংরেজদের বা ফরাসিদের মহব্বতে সহায়তা করলে কাফের হবে, অন্যথায় নয়।

উপরোক্ত আলোচনার পর আশাকরি শরীফ হাতেম আলআউনীর বিভ্রান্তি বুঝতে পারবেন। তিনি এ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন যে, কাফেরদের ও কাফেরদের দ্বীনের মহব্বত নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করলে কাফের হবে, অন্যথায় হবে না। দুনিয়ার লোভে, চাকরির লোভে কেউ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করলে

কাফের হবে না। অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মহব্বত থাকলে এবং কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ থাকলে সহায়তা যতই করুক, যতই মুসলমান হত্যা করুক, আল্লাহর দ্বীনের যতই ক্ষতি করুক- কাফের হবে না। এটি সুস্পষ্ট জাহমিয়াদের মতবাদ।

প্রথমত কথা হল, যে কাফেরদের সাথে মিলে ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যুদ্ধে লিপ্ত, তার অন্তরে ইসলামের সত্যতার বিশ্বাস যদিও থাকতে পারে, কিন্তু ঐ পরিমাণ তা'জিম নেই, যেই পরিমাণ তা'জিম থাকলে তাকে মুসলমান ধরা যায়। বেশির চেয়ে বেশি আবু তালেবের মতো মহব্বত আছে, যা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত পূর্ণ তা'জিমও যদি থাকে, তথাপি সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে এ তা'জিম তাকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না; যেমন পারে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটাক্ষকারীকে বাঁচাতে। কাজেই আউনীর এ শর্তটি কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী জাহমি মতবাদের বক্তব্য। আমার মনে হয় এসব জাহমি, মুরজি ও দরবারিদের কিতাবাদি আগে অধ্যয়ন করাও মারকাযের বড়দের বিভ্রান্তির একটা বড় কারণ। আল্লাহ আমাদেরকে আলেমদের বিচ্যুতি এবং মুনাফিক ও দরবারি আলেমদের থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৯৪

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০১

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-১৩-২০১৯

ঢালকানগরের পীর আব্দুল মতীন বিন হোসাইন সাহেবের একটি বয়ান বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ৩১শে মে ২০১৯ ইং, ২৬ নং তারাবি বাদ বয়ান। বয়ানটি শুরু হয়েছিল একটি হাদিস দিয়ে, যাতে যিকিরকারীকে জিহাদকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এরপর সেখান থেকে হযরতওয়ালা শুরু করেছেন মুজাহিদদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য।

হযরতওয়ালার ভাষায় মুজাহিদ হচ্ছে: এমন কতক জযবাতি লোক, যারা তাদের পাগলামী ও জযবাকে, তাদের বুঝ-বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে- শরীয়তের ফায়সালার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না; যারা কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে দ্বীনের ফায়সালার অনুসরণের স্থলে নিজেদের খাহেশের অনুসরণকে অগ্রাধিকার দেয়; যারা হত্যা ও খুন করে উল্লাসবাজি করে; দ্বীন যিন্দা করার নামে এদিক সেদিক বোম মেরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে; যাদের দ্বারা উম্মাহর ফায়দার স্থলে ক্ষতি হচ্ছে বেশি এবং যাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে সারা বিশ্বে মুসলমানগণ অনিরাপত্তায় ভুগছে।

মোটামুটি হযরতওয়ালার যবানে এ হচ্ছে মুজাহিদদের পরিচিতি। হযরতওয়ালার ভাষায়: কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এ ধরণের জিহাদনামী ফাসাদের প্রচার ঘটছে। আরো বলেন, এ পথে তারা যে কুরবানি পেশ করছে তা বন্ধ করে যদি তারা লোকদের দাওয়াত দিত, তাহলে এর চেয়ে লাখো-কোটি গুণ বেশি ফায়দা হতো।

এ প্রসঙ্গে তিনি বড় চার ইমামের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। প্রথমে ইমাম মালেকের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন,

“তিনি মোট কয়টা জিহাদ করছেন? ... করছিলেন কোনো জিহাদ? হ্যাঁ!? (ধমক ও আপত্তির সুরে।)”

এরপর ইমাম আহমাদ রহ. ও খালকে কুরআনের ফিতনা প্রসঙ্গ এনে বলেন,

"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সেই নিজের সহী মসলক প্রচার করতে থাকছেন। কিন্তু ঐ যারা কুরআন মাখলূক বলছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কি করছিলেন!? তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরছিলেন?!"

এরপর ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এর প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি,

"বড় কঠিন জুলুমের শিকার হইছেন। ... রক্তাক্ত হইছেন। কিন্তু কোথায় কোন্ জিহাদ করছেন যে, ভক্তরা আস! অস্ত্র ধর! তলোয়ার লও?! জিহাদ করছিলেন?!"

এভাবে তিনি চার ইমামের প্রসঙ্গ এনে শেষে বলেন,

"এরা জিহাদ কয়টার মধ্যে যোগ দিছে? ব..ল.. ভাই। তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?"

শেষমেশ বক্তব্য, এমন কিছু জযবাতি লোকের সীমালঙ্ঘনের কারণে সারা দুনিয়াতে মুসলমান আজ অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গভরে এভাবে তিনি যতটুকু পেরেছেন মুজাহিদদের অপমান করার চেষ্টা করেছেন।

এ হল জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে হযরতওয়ালার আকিদা ও বক্তব্য।

অভিব্যক্তি:

আব্দুল মতীন সাহেবের পীর হাকিম আক্তার সাহেব রহ.। হাকিম আক্তার সাহেব রহ. জিহাদ ও মুজাহিদদের কতটুকু ভালবাসতেন এবং তালেবানদের তিনি কি পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তা অনেকের আশাকরি জানা আছে। শুনেছি জিহাদের কথা বলার কারণে আব্দুল মতীন সাহেব নিজ পীরের প্রতি একবার অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে তিনি জিহাদবিদ্বেষী হবেন স্বাভাবিক। মুজাহিদদের নিয়ে কটাক্ষ করবেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন (যেমনটা অন্য দশজন জিহাদবিদ্বেষী করে থাকে) এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হল, তারা তাদের এ ধরণের বদ আকীদাকে শরীয়তের আবরণে চালিয়ে থাকে। বাতিল কখনই নিজেকে সরাসরি হকের বিরুদ্ধে দাড় করায় না। বরং বাতিলকে হকের আবরণে পেশ করে। আর এভাবেই এদের দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) কত বাস্তব কথাই না বলেছেন,

ولا يشتبه على الناس الباطل المحض؛ بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. اهـ

"নিরেট বাতিলের দ্বারা লোকজন সংশয়ে পড়ে না। (সংশয়ে পড়ার জন্য) বরং কিছুটা হকের সংমিশ্রণ আবশ্যক।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ৮/৩৭

হযরতওয়ালারা যদি সত্য করে বলতেন যে, আমরা জিহাদ অপছন্দ করি বা জিহাদে জান-মালের আশঙ্কা তাই আমরা তা করতে রাজি না, খানকার আরামের জিন্দেগি আমরা ছাড়তে পারবো না, তাহলে কেউই তাদের কথা সমর্থন করতো না। কেউ তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হতো না। কিন্তু দুঃখজনক হল, তারা নিজেদের দুর্বলতা গোপন রেখে নিজেদের বাতিল অবস্থানটির পক্ষে চতুরতার সাথে এমন কিছু যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরে, যেগুলোর অসাড়তা সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে না। আর এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিরই আশঙ্কা করে গেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন,

إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين (سنن ابي داود: 4254، جامع الترمذي 2229، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ)

"গোমরাহকারী ইমাম-নেতাদের তরফ থেকে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।"- আবু দাউদ ৪২৫৪, তিরমিযি ২২২৯

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

الأئمة: جمع إمام وهو مقتدى القوم ورئيسهم، ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد. اهـ

"... ইমাম-নেতা হচ্ছে কওমের অনুসৃত ব্যক্তি এবং তাদের প্রধান। তাছাড়াও এমন ব্যক্তি, যে কওমকে কোন কথা, কাজ বা আকীদার দিকে দাওয়াত দেয়।"- মিরকাত ১৫/৩৫৫

ইমামের এ ব্যাপক অর্থে আমাদের অনেক হযরতওয়ালাও পড়বেন, যাদের দ্বারা

উম্মত বিভ্রান্ত হবেন বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করে গেছেন। আজ আমরা এরই বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াইলাল্লাহিল মুশতাকা!

যিকির প্রসঙ্গ: যিকিরের ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে। তাই এ নিয়ে কথা বাড়াবো না। তবে জিহাদের ফজিলতের ব্যাপারে **সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করছি-**

عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عزو جل ؟ قال (لا تستطيعوه) قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول (لا تستطيعونه) وقال في الثالثة (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى)

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল, এমন কি আমল আছে যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। এভাবে দুই/তিন বার তারা একই প্রশ্নটি করলো আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারেই জওয়াব দিলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। শেষে তৃতীয়বারে বললেন, রোযাদারের দৃষ্টান্ত হল এমন এক (ইবাদতগুজার) ব্যক্তির মতো যে (দিনভর) অনবরত রোযা রেখে চলেছে এবং আল্লাহ তাআলার (কুরআনের) আয়াতগুলোর (তিলাওয়াতের) মাধ্যমে খুশু-খুজুর সাথে (রাতভর) অনবরত নামায পড়ে চলেছে। আল্লাহর পথের মুজাহিদ (জিহাদ থেকে) ফিরে আসা পর্যন্ত সে রোযা ও নামাযে একটুও বিরতি দিচ্ছে না।"- সহীহ মুসলিম ১৮৭৮

খানকাহবাসীরা জয়ীফ-মুনকার হাদিসগুলো বাদ দিয়ে যদি এসব সহীহ হাদিসের দিকে তাকাতেন তাহলে সহজেই মুজাহিদের ফজিলত বুঝতে পারতেন। এ হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের পক্ষে অন্য কোন আমলের মাধ্যমে জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরামের বার বার প্রশ্নের জওয়াবের তিনি এমন একটি আমলের কথা বলেছেন, যা কেউ করতে সক্ষম নয়। আর তা হল, লাগাতার রোযা

এবং এক মূহুর্তও বিরতি ব্যতীত লাগাতার খুশু-খুজুর সাথে নামায। উদ্দেশ্য, এ আমল তোমরা করতেও পারবে না, মুজাহিদের জিহাদের সমান সওয়াবও লাভ করতে পারবে না।

ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهد مثل من لايفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لايتأتى لأحد ولهذا قال ﷺ لاتستطيعونه. اهـ

"এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদের ফজিলত মহা ফজিলত। কেননা, নামায, রোযা ও আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের আনুগত্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আর এখানে মুজাহিদকে গণ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির মতো যে এগুলো থেকে এক পলকও বিরত হয় না। আর সকলেরই জানা কথা যে, এটা কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তা করতে সক্ষম নও'।"- আলমিনহাজ ১৩/২৫

যখন লাগাতার নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাও মুজাহিদের সমান সওয়াব পাওয়া যাচ্ছে না- অথচ এগুলো সকল যিকির এবং সকল আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আমল- তাহলে এমন কোন যিকিরকারী আছে যে তার যিকিরের দ্বারা মুজাহিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে!?

বুঝা গেল, সকল নফল নামাযীর নামায, সকল নফল রোযাদারের রোযা এবং সকল যিকিরকারীর যিকিরের চেয়েও মুজাহিদের জিহাদের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কিন্তু এ ধরণের ফজিলত যেহেতু সহীহ হাদিসে এসেছে, তাই এগুলো হযরতওয়ালাদের নজরে পড়ে না!!

যাহোক, এখন কথা হল, কোনো কোনো হাদিসে যে জিহাদের চেয়ে যিকির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে-হাদিস সহীহই হোক আর জয়ীফই হোক- তার কি জওয়াব?

উত্তর:

এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র পোস্টে আলোচনা হয়েছে। তাই কথা বাড়াবো না। সংক্ষেপ উত্তর হল যা হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) দিয়েছেন: যে জিহাদে আল্লাহ

তাআলার ইয়াদ, যিকির, আজমত ও ইস্তিহজার নেই তার চেয়ে আজমত, মহব্বত ও ইস্তিহজারওয়ালা যিকির শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে যে জিহাদ আল্লাহর ইয়াদ, যিকির ও আজমতের সাথে হয় তা সকল প্রকার যিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর স্পষ্ট যে, জিহাদ সাধারণত আল্লাহ তাআলার ইয়াদ সহই হয়ে থাকে। যে মুজাহিদের উপর বিমান থেকে মিসাইল ছোঁড়া হচ্ছে, যার সম্মুখে শত্রুর শতটি ট্যাংক ধেয়ে আসছে, যার ডান-বাম সকল দিক দিয়ে শো শো শব্দে বুলেটগুরো ছুটে যাচ্ছে, যার সামনে তারই দশটি ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে- তার আল্লাহর ইয়াদের সাথে খানকাহর যিকিরের কি-ই বা তুলনা হতে পারে? শত বৎসর খানকাহয় পড়ে থাকলেও মুজাহিদের এমন একটা মূহুর্তের যিকিরের সমান হবে কি'না সন্দেহ! আর জান-মাল বিলিয়ে দেয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম।

হ্যাঁ, কিছু মুজাহিদ এমন থাকাও অসম্ভব নয় যে, জিহাদের এমন ভয়াবহ ময়দানেও তাদের আল্লাহর ইয়াদ হয় না। দুনিয়ার মহব্বতই তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। তাদের কথা ভিন্ন। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ আসবে। হযরতওয়ালা এ প্রসঙ্গে কেমন অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৬৬৭

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০২

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-১৪-২০১৯

আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ প্রসঙ্গ: হযরতওয়ালা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দলীল দিয়েছেন আইম্মায়ে আরবাআ (আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল) রাহিমাহুমুল্লাহর সীরাত দিয়ে। হযরতওয়ালার দাবি, তারা বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করেছেন, তথাপি তাদের কেউ জিহাদ করেননি। তাহলে জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল? তার অবস্থানকে মজবুত করতে তিনি এ প্রশ্নও রেখেছেন, "তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?"

প্রথমে বলে নিই, বর্তমান মুসলমানগণ মৌলিকভাবে দু ধরণের কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন:

এক. দখলদার প্রকাশ্য কাফের। যেমন- ইয়াহুদ, নাসারা, রাফেযী, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

দুই. মুসলিমনামধারী গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক তাগুত-মুরতাদ শাসক শ্রেণী।

হযরতওয়ালার বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, উভয় প্রকার মুজাহিদদেরই তিনি জযবাতি-খাহেশপূজারি আখ্যা দিয়েছেন। শুধু বিশেষ কোন মুজাহিদ দল তার উদ্দেশ্য না। এক কথায়- চলমান বিশ্বের সকল মুজাহিদকেই তিনি আক্রমণের নিশানা বানিয়েছেন। আমার ভুল হয়ে থাকলে হযরতওয়ালারা ইচ্ছে করলে সংশোধন করে দিতে পারবেন।

***

আইম্মায়ে আরবাআ জিহাদ করেছেন কি করেননি সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কয়েকটি মৌলিক কথা বলা জরুরী মনে হচ্ছে:

এক.

হযরতওয়ালা দলীল হিসেবে আইম্মায়ে আরবাআকে বেছে নিলেন কেন?

কুরআন, সুন্নাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সীরাতে কি এর কোন দলীল বা নজীর বিদ্যমান নেই যে, সব কিছু বাদ দিয়ে আইম্মায়ে আরবাআকে ধরতে হচ্ছে? আইম্মায়ে আরবাআর কথা-কাজ তো শরীয়তের দলীল নয়। আইম্মায়ে আরবাআ স্বয়ং নিজেরাই যে কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, হযরতওয়ালা সেগুলোকে দলীলরূপে পেশ করতে নারাজ হলেন কেন? তিনি তো বলতে পারতেন: **"ওহে জযবাতির দল! তোমরা যে জিহাদ জিহাদ কর, কুরআনে কোথায় জিহাদের কথা আছে? হাদিসের কোথায় জিহাদের কথা আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? কোনো সাহাবি কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? তাদের কেউ তো কোন একটা জিহাদও করেননি, তাহলে তোমরা জিহাদ কোথায় পেলে?"**

এভাবে কুরআন সুন্নাহকে তিনি দলীলরূপে পেশ করতে পারতেন না কি? কিন্তু কেন করলেন না?

এর উত্তর মোটামুটি সকলের কাছেই পরিষ্কার যে- কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবা দেখতে গেলে দেখা যাবে: কুরআনের পাতায় পাতায় জিহাদের কথা, হাদিসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিহাদের কথা, রাসূলের সমগ্র জিন্দেগিই জিহাদ, প্রত্যেকজন সাহাবিই মুজাহিদ। এদিকে হাত দিতে গেলেই মুশকিল।

অধিকন্তু তখন প্রশ্ন আসবে যে, রাসূল কি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কোনো সাহাবির কি কোনো খানকাহ বা কোনো মুরীদ ছিল? যদি না থাকে, তাহলে ওহে হযরতওয়ালারা, তোমরা খানকাহ কোথায় পেলে?

দুই.

প্রথম ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জন্ম ৮০ হিজরিতে আর চতুর্থ ইমাম আহমাদ রহ. এর ইন্তেকাল ২৪১ হিজরিতে। এর মাঝখানে সময় হল ১৬১ বছর। বলতে গেলে সাহাবায়ে কেরামের পর বিশ্বজোড়া ইসলামের বিজয় এ সময়টাতেই হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফারা কাফের রাষ্ট্রগুলো বিজয় করে ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করেছেন। হযরতওয়ালার কাছে প্রশ্ন: এ বিজয়গুলো কিভাবে হয়েছে? বাহিনি পাঠানো হয়েছিল কি'না? অস্ত্র চালানো হয়েছিল কি'না? যুদ্ধ হয়েছিল কি'না? মানুষ হত্যা হয়েছিল কি'না?

যদি বলেন, এগুলোর কিছুই হয়নি, যিকিরের দ্বারা বিজয় হয়েছিল: তাহলে লোকজন আপনাকে পাগল বলবে। অতএব, না বলে উপায় নেই যে, এসব কিছুই হয়েছিল।

প্রশ্ন হল, সেগুলো জিহাদ ছিল কি'না? সেগুলোতে উলামায়ে কেরামের সম্মতি ও অংশগ্রহণ ছিল কি'না? সেগুলো উলামায়ে কেরামের নির্দেশনায় শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতো কি'না? মুজাহিদিনে কেরামের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল উলামায়ে কেরাম বলতেন কি'না? তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ কাজি সাহেবগণ মীমাংসা করতেন কি'না? গনিমতের মাল এবং গোলাম-বাঁদি কাজি সাহেবগণের তত্বাবধানে বণ্টন হতো কি'না? না বলে উপায় নেই যে, এ সব কিছুই হয়েছে।

হযরত ওয়ালার কাছে আরো প্রশ্ন: এসব জিহাদ আইম্মায়ে আরবাআর সামনেই সংঘটিত হয়েছিল কি'না? তাদের সম্মতি ছিল কি'না?

না বলে উপায় নেই যে, তাদের সম্মতিতেই হয়েছিল। বরং বলতে গেলে হানাফি, মালেকি, শাফিয়ি ও হাম্বলিরা এবং আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দরাই এসব জিহাদ করেছে, আর আইম্মায়ে আরবাআ মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল বলে ও সংকলন করে মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। এগুলো অস্বীকার করার কোন জু নেই। যদি তাই হয়, তাহলে জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল- এ প্রশ্নের আর উত্তর দেয়ার দরকার নেই আশাকরি। আইম্মায়ে আরবাআসহ অন্য সকল উলামায়ে কেরামের সামনে এবং তাদের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ নির্দেশনা ও তত্বাবধানে যেসব জিহাদ হতো, জযবাতিরা সেগুলোই যিন্দা করছে- যখন হযরতওয়ালারা সেগুলো মিটিয়ে দিয়েছে।

তিন.

এ সময়কালে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না'কি ফরযে কিফায়া ছিল?

উত্তর: ফরযে কিফায়া ছিল। কারণ, তখন কোন মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে ছিল না। সাময়িক সময়ে যদি কোথাও কাফেরদের থেকে আক্রমণ হতো, মুসলমানগণ দ্রুত তা প্রতিহত করে দিতেন। মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো না। বরং মুসলমানগণ নতুন নতুন বিজয়াভিযান পরিচালনা করে দিন দিন কাফেরদের ভূমি দখল করতে থাকতেন। মোটকথা তখন

জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, ফরযে আইন ছিল না। আর ফরযে কিফায়ার বিধান আমাদের জানা আছে যে, কতক মুসলমান জিহাদ করতে থাকলে বাকি মুসলমানদের উপর জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক থাকে না। ইচ্ছে করলে বের হতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে অন্যান্য কাজ-খেদমতেও মশগুল থাকতে পারেন। এ সময়ে জিহাদ উত্তম না'কি ইলম নিয়ে মশগুল থাকা উত্তম তা একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। কারও কারও মতে জিহাদ উত্তম, আবার কারও কারও মতে ইলমী মাশগালা উত্তম।

যেহেতু সে সময়ে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না, তাই যার ইচ্ছা জিহাদ করতেন, যার ইচ্ছা ইলমসহ অন্যান্য খিদমত করতেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটাতেই কোন বাধা নিষেধ নেই। পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম ভূমিগুলো কাফের-মুরতাদদের দখলদারিত্বের শিকার হওয়ায় জিহাদ ফরযে আইন। মা'জূর নয় এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া নামায-রোযার মতোই ফরযে আইন। এ সময়ে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আইম্মায়ে আরবাআর যামানা তার ব্যতিক্রম ছিল। অতএব, সে যামানার কোন আলেম যদি জিহাদে শরীক নাও হতেন, তাহলেও তা এ বিষয়ের দলীল হতো না যে, আলেমদের জন্য বা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য জিহাদ নাজায়েয। তখন জিহাদও ফরযে কিফায়া ছিল, ইলমও ফরযে কিফায়া ছিল। যার যেটা ইচ্ছা করতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা ব্যতিক্রম। এ সময়ে জিহাদ একেবারে তরক করে দিয়ে অন্যান্য খিদমতে লিপ্ত থাকা নাজায়েয। আইম্মায়ে আরবাআর যামানা দিয়ে বর্তমান যামানার উপর আপত্তি করা হযরতওয়ালাদের ইলমী কমতি বরং জাহালত ও অজ্ঞতার প্রমাণ।

চার.

আইম্মায়ে আরবাআ যদি জিহাদ না করে থাকেন (অবশ্য তাদের ব্যাপারে এ কথা সঠিক নয়, আমরা পরে তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ), তাহলে এর দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণ হয় না। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যক্তির জন্য জিহাদ না করে থাকার বৈধতা আছে। স্বয়ং আইম্মায়ে আরবাআর যামানাতেই আরো শত-হাজারো উলামা জিহাদ করে গেছেন। যদি আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ না করার দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণিত হয়, তাহলে তখনকার সময়ে যেসকল উলামা ও মুসলমান জিহাদ করেছেন, তারা

কি সব হারাম করেছেন? তখন যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেগুলো কি সব হারাম হয়েছে? বরং প্রমাণিত আছে যে, আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদগণই সেসব জিহাদ করেছেন এবং আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করে গেছেন। এরপরও হযরতওয়ালারা কিভাবে যে আইম্মায়ে আরবাআকে জিহাদের বিপক্ষে দাড় করাচ্ছেন এবং জিহাদ হারাম সাব্যস্থ করছেন বোধগম্য নয়।

পাঁচ.

আইম্মায়ে আরবাআসহ তখনকার সকল উলামা-মাশায়েখ মূলত জিহাদি ছিলেন। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্নভাবে তারা জিহাদ করে গেছেন ও সমর্থন করে গেছেন। তাদের জিহাদি খিদমাতগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির ছিল। যেমন:

ক. তখনকার বহু ইমাম সরাসরি জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। যেমন- আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও ফিকহি বোর্ডের অন্যতম সদস্য, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৭/৩৬৫, ৩৭৬]; ইমাম মালেক, কাযি আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৮/৩৫০-৩৫১]।

খ. অনেকে রিবাত তথা সীমান্ত পাহারার জন্য দূর-দূরান্তের সীমান্তে চলে গেছেন এবং রিবাতরত অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছেন। যেমন- ইমামু আহলিশ শাম ইমাম আওযায়ী রহ. (১৫৭ হি.)। [দেখুন: আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনে কাসীর: ১০/১২৮]; হাফেয আবু ইসহাক আলজাওহারি রহ. (২৪৭ হি.) (ইমাম মুসলিমসহ সুনানে আরবাআর সকলেই যার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৯/৫১০-৫১১]।

গ. জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং জিহাদের প্রয়োজনীয় মাসআয়েল বয়ানের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব লিখে দিয়েছেন। যেমন: কিতাবুল জিহাদ- ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.); আসসিয়ারুস সগীর ও আসসিয়ারুল কাবীর- ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.)।

ঘ. হাদিসের কিতাবাদিতে জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো স্বতন্ত্রভাবে এবং স্বতন্ত্র ও উপযুক্ত শিরোনামে বিভক্ত করে করে বর্ণনা করেছেন; যেন মুজাহিদদের হাদিসের প্রয়োজনও পূরণ হয়, হাদিস থেকে উদঘাটিত মাসআলারও অবগতি হয়।

যেমন: কিতাবুল আসার- আবু হানিফা, মুআত্তা- মালেক, কুতুবে সিত্তাহ ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের কিতাব।

ঙ. ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের কিতাবাদিতে কিতাবুল জিহাদ, সিয়ার, মাগাজি, কিতালু আহলির রিদ্দাহ, কিতালু আহলিল বাগি ইত্যাদি শিরোনামে জিহাদের প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা বলে দিয়েছেন, যেন মুজাহিদগণের মাসআলার প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

চ. কাযি ও বিচারকগণ মুজাহিদদের মাঝে সংঘটিত সকল বিবাদ-বিসম্বাদের সুরাহা করে দিয়েছেন। গনিমত, গোলাম-বাঁদি ও বিজিত ভূমি মুসলিম উমারা, উলামা ও কাযিগণের সুষ্ঠু তত্বাবধানে বণ্টিত হয়েছে।

ছ. যারা জিহাদে সরাসরি অংশ নিতে পারেননি, তারা নিজেদের সম্পদ দিয়ে অন্য মুসলমানদের জিহাদে পাঠিয়ে জিহাদে অংশ নিয়েছেন।

জ. উলামায়ে কেরাম সাধারণ মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এজন্য প্রতি বছরই কাফের ভূমিতে মুসলিম সেনাবাহিনি হামলা করতেন আর নতুন নতুন এলাকা বিজয় করতেন। কোথাও কখনও হামলা হলে নিজেদের জান-মাল উৎস্বর্গ করে মুসলমানগণ তা প্রতিহত করতেন। এজন্য তখন এমন হয়নি যে, কোন মুসলিম ভূখণ্ড কাফেররা দখল করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ঝ. মুজাহিদগণ জিহাদে যাওয়ার পর থেকে নামাযান্তে মসজিদে মসজিদে তাদের জন্য দোয়া হতো। তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দিতেন।

ঞ. জিহাদ থেকে ফেরার পর মুজাহিদদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ইস্তেকবাল করা হতো এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা হতো।

এ ছিল আইম্মায়ে আরবাআর যামানার উলামা-মাশায়েখ ও তাদের জিহাদ প্রেমের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান হযরতওয়ালাদের অবস্থা হল:

- নামাযে পর্যন্ত তারা জিহাদের আয়াতগুলোর তিলাওয়াত শুনতে নারাজ। এতে না'কি তাদের খুশু-খুজু নষ্ট হয়। যদি কেউ তাদের সামনে সঠিক জিহাদের আলোচনা তোলেন, তাহলে তাদের অবস্থা হয়ে যায়:

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

"তারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায়।"- মুহাম্মাদ ২০

- জিহাদের আয়াত ও হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সে সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল তো পরের কথা কথা; তাফসির, হাদিস বা ফিকহের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখতেও তারা নারাজ। আর দু'চার পৃষ্ঠা উল্টালেও সঠিকভাবে বুঝতে চান না। উল্টো বুঝেন। আল্লাহ রক্ষা করুন, অবস্থা যেন আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন:

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাকেই পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।"- তাওবা ৮৭

কিন্তু ফতোয়াবাজি করার সময় এমন ভাব দেখান, এসব ব্যাপারে যেন তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকটি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

"যখন তারা কথা বলবে, (বাকপটুতার কারণে) তুমি তাদের কথা শুনতেও চাইবে।"- মুনাফিকুন ৪

- গা বাঁচিয়ে যে শুধু খানকাহে পড়ে থাকেন তাই না, নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে জিহাদ হারাম ফতোয়া দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা বলতো:

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ

"যদি (শরয়ী) যুদ্ধ বলে জানতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুরসণ করতাম।"- আলে ইমরান ১৬৭

- মুজাহিদদের আলোচনা আসলে অতি জযবাতি, দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, সন্ত্রাসী, ফাসাদি, অপরিণামদর্শী, খাহেশপূজারি ইত্যাদি গালিগালাজ মুখে ফেনা আসা পর্যন্ত করতে থাকেন। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা মুজাহিদদের ব্যাপারে বলতো:

غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

"এদের ধর্ম এদের বিভ্রান্ত করেছে।"- আনফাল ৪৯

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

"এরা যদি আমাদের কাছে থেকে যেতো তাহলে মারাও যেতো না, (অন্যদের হাতে) মারাও পড়তো না।"- আলে ইমরান ১৫৬

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

"এরা যদি আমাদের কথা শুনতো (এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করতো) তাহলে (অন্যদের হাতে) মারা পড়তে হতো না।"- আলে ইমরান ১৬৮

- কোন মুরীদ বা ছাত্রের মাঝে জিহাদের আভাস দেখলে তার সনদ কেটে দেন এবং খানকাহ ও মাদ্রাসা থেকে বের করে দেন। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা করতে চাইতো:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

"আমরা মদীনায় ফিরে গেলে মর্যাদাবান লোকেরা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।"- মুনাফিকুন ৮

এ হল হযরতওয়ালাদের মোটামুটি অবস্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজতে রাখুন। আমীন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি হযরতওয়ালার এ আপত্তির জওয়াব পেয়ে যাবেন, "তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?"

উত্তর পরিষ্কার যে, তারা জাহান্নামীও হবে না, কবীরা গুনাহেও লিপ্ত না। কারণ, তারা সকলেই মুজাহিদ বা অন্তত জিহাদপ্রেমী ছিলেন। হযরতওয়ালাদের মতো জিহাদবিদ্বেষী ছিলেন না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যেভাবে সম্ভব জিহাদের খেদমত করে গেছেন। অধিকন্তু যদি তারা কিছু নাও করতেন, তথাপি জাহান্নামী হতেন না বা কবীরা গুনাহ হতো না। কারণ, এখনকার মতো জিহাদ তখন ফরযে আইন ছিল না। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৬৮০

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৩

(আবু হানিফা রহ. এর জিহাদ)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-১৬-২০১৯

আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ:

হযরতওয়ালা বহু জোর গলায় দাবি করেছেন যে, আইম্মায়ে আরবাআ কেউ জিহাদ করেননি। তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এর দ্বারা তিনি জিহাদ হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল দিয়েছেন।

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন এমন কারো কাছেই অস্পষ্ট নয় যে, হযরতওয়ালা এখানে কত মাত্রার অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। যদি ইতিহাসের কিতাবাদির দিকে একটু নজর দেন, তাহলে তিনি নিজেও লজ্জিত হবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করবো।

এর আগে প্রথমেই বলে রাখি- যেমনটা আগেও বলেছি:

- আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। তাই তখন কেউ জিহাদে না গেলে আপত্তির কিছু নেই। এর দ্বারা ফরযে আইনের সময়েও জিহাদে না যাওয়ার দ্বারা জিহাদ হারাম সাব্যস্ত হয় না।

- দ্বিতীয়ত তখনকার সময়ে যত জিহাদ হয়েছে আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করেছেন। হাদিস ও ফিকহ সংকলন করে জিহাদের মাসআলা মুজাহিদদের সামনে তুলে ধরেছেন। অধিকন্তু আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ, অনুসারি ও ভক্তবৃন্দদের দ্বারাই তখনকার জিহাদগুলো হয়েছিল। এরপরও তাদেরকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করানো তাদের নামে অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং জিহাদ: আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরতওয়ালা আবু হানিফা রহ. এর মুকাল্লিদ হয়েও নিজ ইমাম সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ। অথচ সকলেরই

জানা যে, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণেই আবু হানিফা রহ. নির্যাতিত হয়েছেন এবং অবশেষে শহীদি মৃত্যু লাভ করেছেন। উমাইয়া-আব্বাসী উভয় আমলেই জালেম শাসকের বিরুদ্ধে আবু হানিফা রহ. বিদ্রোহ করেছিলেন। এ কারণে উভয় যামানাতেই তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

জুলুম-অত্যাচার এবং আহলে বাইতের প্রতি নির্যাতনের কারণে আবু হানিফা রহ. উমাইয়াদের প্রতি নারাজ হয়ে পড়েছিলেন। এ শাসন পরিবর্তন হয়ে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার তিনি স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে ১২১ হিজরিতে আহলে বাইতের হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি যাইনুল আবিদিন হযরত যায়দ বিন আলি রহ. গোপনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। আস্তে আস্তে তার দল ভারি হতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে উলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান গোপনে তার হাতে বাইয়াত হতে থাকে।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

استمر يبايع الناس في الباطن في الكوفة، على كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن. اهـ

“যায়দ বিন আলী রহ. গোপনে কূফায় কুরআন সুন্নাহর উপর লোকদের থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। এভাবে গোপনে গোপনে সেখানে তার দল ভারি হতে থাকে।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৩৫৮

আবু হানিফা রহ. গোপনে যায়দ বিন আলি রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজে অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যায়দ বিন আলি রহ. কামিয়াব হতে পারেননি। বিপদ মূহুর্তে কূফাবাসী তাকে পরিত্যাগ করে। বর্ণিত আছে, আবু হানিফা রহ. এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন। তথাপি তিনি গোপনে তার পক্ষাবলম্বন করেন।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، وكان من قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف، على ما روي عن النبي ﷺ ... وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. اهـ

"জালেম ও অত্যাচারি শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এর অভিমত প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আওযায়ী রহ. বলেন, 'আবু হানিফাকে আমরা সকল বিষয়ে বরদাশত করেছি। কিন্তু যখন তিনি তরবারি তথা জালেমদের বিরুদ্ধে কিতালের পর্ব নিয়ে আসলেন, তখন আর বরদাশত করতে পারিনি'। আবু হানিফা রহ. এর অভিমত ছিল, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (প্রথমে) যবান দ্বারা ফরয, তাতে কাজ না হলে তরবারি দ্বারা; যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ...

যায়দ বিন আলী রহ. এর সাথে তার ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি গোপনে তার কাছে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন এবং ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাকে নুসরত করা এবং তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা আবশ্যক। তদ্রূপ, আব্দুল্লাহ বিন হাসান তনয় মুহাম্মাদ ও ইব্রাহিমের সাথেও তার ঘটনা প্রসিদ্ধ।"- আহাকমুল কুরআন ১/৮৭

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. ও ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ রহ.- এর আলোচনা ইনশাআল্লাহ আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আলোচনায় আসবে।

১২১ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين، رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ... وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، وابن شبرمة، ومسعر بن

كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

"এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ... তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু'তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাযি হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। **আবু হানিফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)।**"- শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০

তবে আল্লাহ তাআলার ফায়াসালা ভিন্ন ছিল। যায়দ বিন আলী রহ. পরাজিত ও শহিদ হন। তার পর আহলে বাইতের আরো কয়েকজন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তবে সবাই পরাজিত হন। আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করায় আবু হানিফা রহ.কে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। জেলে বন্দী হন। অমানবিক প্রহারের শিকার হন। অবশেষে নির্যাতনের মুখে তিনি কূফা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানকার মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহাদের থেকে ইলম তলব ও গবেষণায় মগ্ন হন। অবশেষে যখন আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতন হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবার কূফায় ফিরে আসেন।

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতনের পর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবু হানিফা রহ. মক্কা থেকে আবার কূফায় ফিরে আসেন। আব্বাসীরা ক্ষমতা লাভের পূর্বে আহলে বাইতের পক্ষে ছিল। অধিকন্তু তারা ছিল রাসূল বংশের লোক। তিনি ধারণা করেছিলেন, আব্বাসীরা ইনসাফ করবে। আহলে বাইতের প্রতি সুবিচার করবে। জুলুম-অত্যাচারমুক্ত শাসন করবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর আব্বাসীরা জুলুম শুরু করে। আহলে বাইতের লোকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকে। অমানবিক পন্থায় নির্যাতন করতে থাকে। সন্দেহজনকভাবে মুসলমানদের হত্যা

করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে থাকে। আবু হানিফা রহ. এর ধারণা পাল্টে যায়। পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে পড়ে। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মেঘ দানা বাঁধতে থাকে।

একসময় আহলে বাইতের দুই ভাই **মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. (নফসে যাকিয়্যা)** এবং **ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ.** গোপনে আব্বাসী খলিফা আবু জা'ফর মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং ইব্রাহিম রহ. বসরায় লোকদের থেকে বাইয়াত নেন। প্রথমে নফসে যাকিয়্যা রহ. মদীনায় বিদ্রোহ করেন। ইমাম মালেক রহ. তার হাতে বাইয়াত হওয়ার ফতোয়া দেন (যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ)। তবে তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। ১৪৫ হিজরিতে তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।

নফসে যাকিয়্যা রহ. শহীদ হওয়ার পর তার ভাই ইব্রাহিম রহ. বসরায় মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাইয়াত নেন। গোপনে গোপনে তার দল যথেষ্ট ভারি হতে থাকে। সৈন্য সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে যায়। আবু হানিফা রহ. কূফায় ছিলেন। তিনি ইব্রাহিম রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য গোপনে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। অবশ্য শেষে তিনিও কামিয়াব হতে পারেননি। পরাজিত ও শহীদ হন। খলিফা মানসূর বিভিন্নভাবে আন্দাজ করতে পারে যে, আবু হানিফা তার বিরোধী। ফলে তার উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে। অবশেষে নির্যাতনের মুখেই তিনি শহীদ হন।

ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وكان خرج مع إبراهيم كثير من القرّاء، والعلماء، منهم: هشيم، و أبو خالد الأحمر [3] وعيسى بن يونس، وعبّاد بن العوّام، ويزيد بن هارون، و أبو حنيفة، وكان يجاهر في أمره، ويحثّ النّاس على الخروج معه، كما كان مالك يحثّ النّاس على الخروج مع أخيه محمّد .وقال أبو إسحاق الفزاريّ لأبي حنيفة: ما اتّقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم فقتل، فقال: إنه كما لو قتل يوم بدر. اهـ

“ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষ হয়ে অনেক মাশায়েখ ও আলেম-উলামা বিদ্রোহ করেছিলেন। যেমন: হুশাইম, আবু খালেদ আলআহমার, ঈসা বিন ইউনুস, আব্বাদ ইবুল আওয়াম, ইয়াজিদ বিন হারুন ও আবু হানিফা রহ.। আবু হানিফা রহ. প্রকাশ্যেই তার পক্ষ নিয়েছিলেন। তার সাথে মিলে বিদ্রোহ করার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন, যেমন ইমাম মালেক রহ. তার ভাই মুহাম্মাদের সাথে মিলে বিদ্রোহের জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু ইসহাক ফাযারি রহ. আপত্তি করে আবু হানিফা রহ.কে বলেছিলো, ‘আপনি তো আল্লাহকে ভয় করেননি। আপনি আমার ভাইকে ইব্রাহিমের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহে করতে উৎসাহ দিয়েছেন ফলে সে শহিদ হয়েছে।’ তিনি উত্তর দেন, ‘তোমার ভাইয়ের শাহাদাত বদরের দিনে শহীদ হওয়ার মতোই মর্যাদাপূর্ণ’।”- শাজারাতুয যাহাব ২/২০৩

খতীব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) আবু ইসহাক ফাযারি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة، فركبت لأنظر في تركته، فلقيت أبا حنيفة، فقال لي: من أين أقبلت؟ و أين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة، وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم، فقال لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه، قلت: فما منعك أنت من ذاك؟ قال: لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس، ما استأنيت في ذلك. اهـ

“ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশধর ইব্রাহিমের সাথে বসরায় আমার ভাই শহিদ হয়। আমি তার রেখে যাওয়া সম্পদ দেখার জন্য সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে আবু হানিফার সাথে দেখা হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছে, আর কোথায় যাচ্ছে? আমি জানালাম যে, মিসসিসাহ্ থেকে এসেছি। আমার এক ভাই যে ইব্রাহিমের সাথে শহিদ হয়েছে, তাকে দেখতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যেখান থেকে এসেছো, তার চেয়ে যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে শহিদ হতে তাহলে সেটাই তোমার জন্য অধিক ভাল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাহলে এ থেকে আপনাকে কিসে বাঁধা দিল? তিনি উত্তর দিলেন, যদি আমার কাছে লোকজনের রাখা অনেকগুলো আমানত ও গচ্ছিত সম্পদ না

থাকতো, তাহলে আমি এতে কোন শিথিলতা করতাম না।"- তারিখে বাগদাদ ১৫/৫১৬-৫১৭

অর্থাৎ আবু হানিফা রহ. এর কাছে অনেকের রাখা অনেক আমানতের মাল ছিল। তিনি ভয় করছিলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান, তাহলে এ আমানতের মালগুলো লোকজনের হাতে পৌঁছাতে পারবেন না। এ জন্য তিনি সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বলেন,

وقد روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً رحمه الله؛ سمّه لقيامه مع إبراهيم. اهـ

"বর্ণিত আছে, ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষালম্বনের কারণেই খলিফা মানসূর আবু হানিফা রহ.কে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে।"- আলইবার ফি খাবারি মান গাবার ১/১৬৪

প্রিয় পাঠক! এই হলেন আবু হানিফা রহ.। জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যিনি শহীদ হয়েছেন। আর আমাদের হযরতওয়ালার বলছেন, আবু হানিফা রহ. না'কি কোনো জিহাদ করেননি। কোনো তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এ যেন দিবালোকে সূর্য অস্বীকার করারই নামান্তর।

লক্ষ্যণীয়, উমাইয়া-আব্বাসী উভয় খেলাফতই কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ক্ষমতার দখল ও টিকানোর স্বার্থে তারা অনেকের উপর জুলুম করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অনেক সময় অন্যায় ব্যবহার করেছে। কিন্তু শাসন সম্পূর্ণই ইসলামী ছিল। বরং সে যুগটাই তো ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগ। হাদিস ও ফিকহ সংকলনের কাজ তো সে যামানাতেই হয়েছে। সালাফে সালেহিন আইম্মায়ে কেরাম তো সে যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এতদসত্বেও শুধু ফিসক-জুলুমের কারণে আবু হানিফা রহ. তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে আজ যদি তিনি এ তাগুতি শাসন দেখতেন- যারা ইসলামকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করে কুফর গ্রহণ করেছে এবং ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সর্ব-সামর্থ্য ব্যয় করছে- যদি আবু হানিফা রহ. এ তাগুতি শাসন দেখতেন, তাহলে তিনি কি করতেন? উত্তরের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উম্মাহর বীর সন্তানরা যখন সালাফে সালেহিনের পথ

ধরে জীবন বাজি রেখে আল্লাহর শরীয়তের জন্য তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন, তখন আমাদের হযরতওয়ালারা তাদের শানে খাহেশপূজারি, জযবাতি ইত্যাদি ঘৃণ্য বিশেষণ ব্যবহার করছেন। হে আল্লাহ! তোমার কাছেই সকল অভিযোগ। তুমিই তোমার দ্বীনের হিফাজতকারী।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৬৯৭

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৪

ইমাম মালেক রহ. এর জিহাদ

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-২১-২০১৯

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, নফসে যাকিয়্যাহ মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং তার ভাই ইব্রাহিম রহ. বসরায় খলিফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইব্রাহিম রহ.কে আবু হানিফা রহ. সমর্থন করেন, সহায়তা করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন। আর মুহাম্মাদ রহ.কে ইমাম মালেক রহ. সমর্থন করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,

وقد روى ابن جرير عن الإمام مالك: أنه أفتى الناس بمبايعته، فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته. اهـ

“ইবনে জারির (ত্বাবারি) রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লোকদের মুহাম্মাদ রহ. এর হাতে বাইয়াত হতে ফতোয়া দেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের গর্দানে তো মানসূরের বাইয়াত বিদ্যমান আছে (তা ভঙ্গ করে আমরা কিভাবে মুহাম্মাদকে বাইয়াত দেবো)? তিনি উত্তর দেন, তোমাদেরকে তো (বাইয়াত দিতে) জবরদস্তি বাধ্য করা হয়েছিল। আর যাকে জবরদস্তি বাধ্য করা হয় (শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে) তার বাইয়াত কার্যকর হয় না। মালেক রহ. এর ফতোয়ার কারণে তখন লোকজন তার হাতে বাইয়াত দেয়। আর মালেক রহ. আপন গৃহে বসে পড়েন (এবং বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেন)।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৮৭

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪হি.) দারাওয়ারদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

أفتى الناس عند قيام محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه. اهـ

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান- যিনি মাহদি উপাধী ধারণ করেছিলেন- তিনি যখন বিদ্রোহ করেন, তখন মালেক রহ. ফতোয়া দেন যে, আবু জা'ফর (মানসূর)- এর বাইয়াত মেনে চলা আবশ্যক নয়। কেননা, তা জবরদস্তি গ্রহণ করা হয়েছিল।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৪

ইমাম মালেক রহ. এর উক্ত ফতোয়ার কথা কতক হিংসুক লোক মদীনায় মানসূরের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তৎকালীন গভর্নর জা'ফর বিন সুলাইমানের কাছে পৌঁছায়। এতে জা'ফর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং মালেক রহ.কে অমানবিক নির্যাতন করে। ফলে মালেক রহ. আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। এ পঙ্গু অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়, নির্যাতনের পর মালেক রহ. আর কখনোও বাহিরে যেতেন না। মসজিদে জামাতে শরীক হতেন না। জুমআতেও যেতেন না। কারণ, বেত্রাঘাতের কারণে তার অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, বেশিক্ষণ অজু ধরে রাখতে পারতেন না। বলা হয়, এজন্যই তিনি জুমআয় ও জামাতে শরীক হতেন না।

কাজি ইয়াজ রহ. মুনযির রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী মাখযুমের এক ব্যক্তি মালেক রহ. এর ফতোয়ার ব্যাপারে জা'ফর বিন সুলাইমানের কাছে নালিশ করেছিল। এরপর জা'ফর তা মানসূরকে পত্র মারফত অবগত করে। মানসূর মালেক রহ.কে প্রহার করার আদেশ দেয়। **কাজি ইয়াজ রহ. বর্ণনা করেন,**

فكتب بذلك جعفر إلى الخليفة فكتب إليه: أن اجلده. فجلده ومد يده بين العقابين فلذلك كان لا يأتي المسجد لإنزال ريح تخرج من موضع الكتف. اهـ

"জা'ফর এ ব্যাপারে খলিফার কাছে পত্র লিখে। খলিফা উত্তর পাঠায়, 'মালেককে প্রহার কর'। এতে জা'ফর তাকে বেত্রাঘাত করে। দু'টি পিলারের মাঝখানে তার হাত টানা দেয়া হয়। এ কারণেই তিনি মসজিদে যেতেন না। কারণ, কাঁধের দিক থেকে বায়ু বের হতো।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৬

কাজি ইয়াজ রহ. ওয়াকিদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

فغضب جعفر ودعا به فاحتج عليه فما رفع إليه. ثم جره ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وفي رواية عنه ومدت يداه حتى انخلع كتفاه وكذلك اختلف على مصعب الزبيري. وقال الحنيني بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين لا يستطيع أن يدفعهما وارتكب منه أمر عظيم فو الله لمالك بعد ذلك الضرب في رفعة في الناس وعلو وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها. اهـ

"নালিশ শুনে জা'ফর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। মালেক রহ.কে ডেকে দরবারে হাজির করায়। উত্থাপিত নালিশের ভিত্তিতে তাকে অভিযুক্ত করে। এরপর তাকে নিয়ে টানা-হেঁচরা করে। সটান করে টানা দেয়। তারপর চাবুক দ্বারা বেত্রাঘাত করে। তার এক হাত এত সজোরে টানা হয় যে, কাঁধ আপন জায়গা থেকে সরে পড়ে। তার থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় হাত ধরে সজোরে টানা হয় ফলে উভয় কাঁধ আপন স্থান থেকে সরে পড়ে। ... হুনাইনি রহ. বলেন, এরপর থেকে মালেক রহ. এর উভয় হাত পঙ্গু হয়ে পড়ে। হাত নাড়ানোর সামর্থ্য তার ছিল না। তার সাথে নিদারুন অমানবিক আচরণ করা হয়। আল্লাহর কসম! এ নির্যাতনের পর থেকে লোকজনের নিকট মালেকের সম্মান ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। যেন ঐসব চাবুক কতগুলো অলংকার ছিল আর তিনি সেগুলো পরিধান করে সুসজ্জিত হয়েছেন।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩০-১৩১

মুতাররিফ রহ. বলেন,

فرأيت آثار السياط في ظهره قد شرحته تشريحاً ... خلعوا كتفيه حتى كان ما يستطيع أن يسوي رداءه.اهـ

"মালেক রহ. এর পৃষ্ঠে আমি চাবুকের চিহ্ন দেখেছি। আঘাতে পৃষ্ঠে গভীর ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ... তারা তার কাঁধ আপন স্থান থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। এমনকি তিনি তার চাদরও সোজা করতে পারতেন না।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৩

কাজি ইয়াজ রহ. আরো বর্ণনা করেন,

لما ضرب مالك رحمه الله تعالى ونيل منه حمل مغشياً عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل. اهـ

"মালেক রহ.কে যখন বেত্রাঘাত ও নির্যাতন করা হল, তখন বেহুঁশ অবস্থায় তাকে বহন করে আনা হল। এরপর লোকজন তার ঘরে প্রবেশ করল। তখন তিনি হুঁশে আসেন। হুঁশে এসে বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্যি রাখছি যে, আমি আমার বেত্রাঘাতকারীকে মাফ করে দিয়েছি।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২

উল্লেখ্য, বেত্রাঘাতকারী মুসলামান ছিল তাই তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর আমাদের বর্তমান তাগুতগুলো মুরতাদ। এদেরকে মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে থাকতে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর (চড়াও হয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার) কোন রাস্তা রাখবেন না।"- নিসা: ১৪১

নির্যাতিত হওয়ার পর মালেক রহ. বলেছিলেন,

ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدروربيعة و ابن المسيب ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر. اهـ

"যে পথে আমি প্রহৃত হয়েছি, সে পথে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রবিআ ও ইবনুল মুসায়্যিব প্রহৃত হয়েছেন। এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২, ছাপা: আলমাগরিব

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ করুন, **"এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"** দ্বীনের জন্য যার উপর নির্যাতন আসে না, জেল-জরিমানা, বন্দী বা রিমান্ডের শিকার হয় না: তিনি বলছেন, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। হতে পারেন তিনি অনেক বড় হযরতওয়ালা, কিন্তু মালেক রহ. এর দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কোথায় মালেক আর কোথায় আমরা! আজ যদি কোন আলেম বা কোনো মুজাহিদ দ্বীনের কারণে, জিহাদের কারণে গ্রেফতার

হন, রিমান্ডে যান বা ফাঁসি দেয়া হয়, তাহলে বলা হয়: সে অতি জযবাতি ছিল, ভাসা ভাসা বুঝের ছিল- গভীর বুঝ ছিল না, মাসলাহাত বুঝতো না, হেকমত জানতো না, বেশি বুঝে ফেলেছিল, বড়দের সাথে বেয়াদবির ফল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিশেষণ। ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে এদের মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আর যারা বড় বড় হযরতওয়ালা বা বড় বড় মুদীর, আমীন, মুরুব্বী ও শাইখুল হাদিস হয়ে বসে আছেন কিন্তু দ্বীনের পথে একটা ফুলের টোকাও তাদের শরীরে পড়েনি: ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে তাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই। হে আল্লাহ আমাদের হেফাজত কর। তোমার দ্বীনের জন্য কবুল কর। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৭২২

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৫

(ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-২৩-২০১৯

যুদ্ধবিদ্যা ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অন্যতম শখের বিষয় ছিল। ছোট বেলা থেকেই এটি তার প্রিয় বিষয় ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশিষ্ট তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার মুজাহিদে পরিণত হন। **তিনি বলেন,**

ولدت بعسقلان، فلما أتى عليّ سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نَهْمتي في شيئين: في الرّمي، وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشَرة عشرة. اهـ

“আমার জন্ম আসকালানে। দু’ বছর বয়সে আমার মা আমাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। আমার শখ ছিল দু’টি বিষয়: ১. তীরন্দাজি; ২. ইলম অন্বেষণ। তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৭-১২৮

অন্য বর্ণনায় আছে যে তিনি বলেন,

تمنيت من الدنيا شيئين: العلم والرمي. فأما الرّمي فإني كنت أصيب من عشرة عشرة. اهـ

“দুনিয়াতে আমার আকাঙ্খার বস্তু ছিল দু’টি: ইলম ও তীরন্দাজি। তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৮

অন্য বর্ণনায় বলেন,

كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. اهـ

"আমি তীরন্দাজি নিয়ে পড়ে থাকতাম। এমনকি ডাক্তার আমাকে বলতো, 'তুমি রোদ্রে যেভাবে পড়ে থাক, আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে।"- তারিখে বাগদাদ ২/৩৯২

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

كان الشافعي أفرس خلق الله وأشجعه، وكان يأخذ بأذنه وأذن الفرس، والفرس يعدو، فيثب على ظهره وهو يعدو. اهـ

"শাফিয়ী রহ. অতুলনীয় ঘোড় সওয়ার এবং নেহায়েত বীর বাহাদুর ছিলেন। (এমনকি) তিনি এক হাতে নিজের কান আরেক হাতে ঘোড়ার কান ধরে ঘোড়া দৌড়াতে পারতেন। ঘোড়া প্রবল বেগে দৌড়তে থাকতো। ঘোড়া দৌড়তো আর তিনি ঘোড়ার পিঠে লাফাতে থাকতেন।"- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯

তার আরেক শাগরেদ ইমাম মুযানী রহ. বলেন,

كان الشافعي يسميني القطامي الرامي، ووضع «كتاب السبق والرمي» بسببي، وأملاه عليّ. اهـ

"শাফিয়ী রহ. আমাকে তীরন্দাজ কাতামি নামে ডাকতেন। আমার জন্যই তিনি كتاب السبق والرمي (ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজির বিধি বিধান) কিতাবটি লেখেন এবং ইমলা করিয়ে আমাকে তা লিখিয়ে দেন।"- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯

ইমলা বলা হয়: উস্তাদ বসে মুখস্থ বলবেন আর শাগরেদরা লিখবে। আগের যুগে এভাবেই পাঠ দেয়া হতো।

লক্ষণীয়, তীরন্দাজি শাফিয়ী রহ. এর কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তার প্রিয় শাগরেদ মুযানী রহ.কে তীরন্দাজ বলে ডাকতেন। সম্ভবত তিনি দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। পাশাপাশি শাগরেদের জন্য তিনি তীরন্দাজি ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার

বিধিবিধান সম্বলিত একটা কিতাবই রচনা করেছেন এবং ইমলা করিয়ে শাগরেদকে তা লিখিয়েও দিয়েছেন।

শাফিয়ী রহ. এর মূল ব্যস্ততা যদিও ইলম নিয়ে ছিল, তথাপি তিনি আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা ইসলামী সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

তার বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

خرجت مع محمد بن إدريس الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطا، وكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع، ثم يسير إلى المَحْرَس فيستقبل البحر بوجهه جالساً يقرأ القرآن في الليل والنهار حتى أُحصيت عليه ستين ختمة في شهر رمضان. اهـ

"মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ী রহ. এর সাথে একবার ফুসতাত থেকে ইস্কানদারিয়ায় রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় বের হলাম। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তিনি জামে মসজিদে পড়তেন। এরপর পাহারার স্থানে চলে যেতেন। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে পড়তেন। বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দিন-রাত সর্বক্ষণ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এমনকি আমি রমজান মাসে হিসেব করে দেখিছি যে, তিনি ষাট খতম করেছেন।"- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১৫৮

সীমান্ত অঞ্চল, যেদিক দিয়ে কাফেরদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, সেখানে গিয়ে পাহারাদারি করাকে রিবাত বলে।

হাদিসে এসেছে,

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

"একদিন রিবাতের দায়িত্ব পালন করা দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।"- সহীহ বুখারি ২৮৯২

অন্য হাদিসে এসেছে,

»رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان«

“এক দিন ও এক রাত রিবাতের দায়িত্ব পালন করা এক মাসের নামায ও রোযা থেকেও উত্তম। যদি রিবাতরত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে যেসকল নেক আমল করতো, সেগুলো তার নামে জারি থাকবে (তথা সেগুলোর সওয়াব পেতে থাকবে)। তার রিযিক জারি হয়ে যাবে এবং কবরে আযাবের ফিরিশতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।”- সহীহ মুসলিম ১৯১৩

রিবাতের এত ফজিলতের কারণেই বড় বড় উলামায়ে কেরাম সীমান্ত অঞ্চলে চলে যেতেন রিবাতের জন্য। অনেকে সপরিবারে গিয়ে বসবাস করতেন। উদ্দেশ্য থাকতো সীমান্ত পাহারা। বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, ইমাম শাফিয়ী রহ. সুযোগ মতো রিবাতে চলে যেতেন। পাহারা দিতেন আর ইবাদাত বন্দেগী করতেন। কারণ, ঘরে বসে যিকির আযকার, তিলাওয়াত ও ইবাদাত বন্দেগী করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, ময়দানে গিয়ে করলে তার শত-হাজারো গুণ বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের হযরতওয়ালারা বুঝেছেন উল্টো।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৭৫৭

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৬

(ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) এর জিহাদ)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-২৬-২০১৯

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর জিহাদের স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন। **তিনি বলেন,**

من جهاده قال عبد الله بن محمود بن الفرج: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: خرج أبي إلى طرسوس، ورابط بها، وغزا ... وعن أحمد، أنه قال لرجل: عليك بالثغر، عليك بقزوين، وكانت ثغرا. اهـ

"ইমাম আহমাদ রহ. এর জিহাদ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাহমূদ ইবনুল ফারাজ বলেন, আমি আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, 'আমার পিতা (সীমান্ত এলাকা) ত্বরাসূসে গিয়েছেন। সেখানে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন'। ... আহমাদ রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছেন, 'তুমি সীমান্তে চলে যাও। কাযবিনে চলে যাও'। কাযবিন তখন সীমান্ত এলাকা ছিল।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩৩১

যাহাবি রহ. আরো বর্ণনা করেন,

قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا. اهـ

"আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা ত্বরাসূস গিয়েছেন পায়ে হেঁটে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২২১

আরো বর্ণনা করেন,

وعن أحمد، قال: ... كنا خرجنا إلى طرسوس على أرجلنا. اهـ

“আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা ত্বরাসূস গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১১/৩০৮

যাহাবি রহ. এর বর্ণনা থেকে বুঝা গেল,

ক. আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে সীমান্তে গিয়েছেন।

খ. সীমান্তে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন তথা সীমান্ত পাহারা দিয়েছেন।

গ. যুদ্ধও করেছেন।

ঘ. অন্যদেরকে সীমান্ত পাহারায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সীমান্তবাসী মুজাহিদিনে কেরাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনেক সময় তারা আহমাদ রহ. এর তরফ থেকে গোলা ছোঁড়তেন। আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করতেন। **যেমন এক বর্ণনায় এসেছে,**

قدم رجل من طرسوس، فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا أصواتهم بالدعاء، ادعوا لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق، ونرمي عن أبي عبد الله. ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة، فذهب برأسه وبالدرقة. اهـ

“এক লোক ত্বরাসূস থেকে আসল। বলল, আমরা রোমে যুদ্ধে ছিলাম। যখন নিঝুম রাত হল দোয়ায় সকলে জোরো জোরো বলতে লাগল, সকলে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল)- এর জন্য দোয়া কর। আমরা অনেক সময় ক্ষেপণাস্ত্র ফিট করে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল) এর তরফ থেকে ছোঁড়তাম। একবার তার তরফ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হল। শত্রু সৈন্যটি দূর্গের উপর ছিল। একটি ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। পাথরটি সৈন্যটির ঢালসহ মাথা গুঁড়িয়ে দিল।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১১/২১০

অনেক সময় সীমান্তবাসী মুজাহিদিনে কেরাম বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর কাছে চিঠি পাঠাতেন। তিনিও প্রতিউত্তর লিখে চিঠি পাঠাতেন। যেমন, একবার তারা এক বিদআতি লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান। **আহমাদ রহ. বলেন,**

كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره، فكتبت إليهم، فأخبرتهم بمذهبه وما أحدث، وأمرتهم أن لا يجالسوه. اهـ

"সীমান্তবাসীরা আমার কাছে এ লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। আমি তার মাযহাব-মতাদর্শ ও তার আবিষ্কৃত বিদআত সম্পর্কে তাদের অবগত করিয়ে প্রতিউত্তর পাঠাই এবং তাদের আদেশ দিই, যেন তারা তার সাথে উঠাবসা না করে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২১১

আহমাদ বিন হাম্বল রহ. জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন এবং জিহাদের কথা স্বরণ হলে কাঁদতেন। **ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,**

قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه، قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟ فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. اهـ

"আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল রহ.) বলেন, 'ফরযের পর আমার জানা মতে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই'।

আহমাদ রহ. এর অনেক শাগরেদ তার থেকে এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। আসরাম রহ. বলেন, আহমাদ রহ. বলেছেন, 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল আছে বলে আমার জানা নেই'।

ফজল বিন যিয়াদ রহ. বলেন, 'একবার শত্রুর (তথা কাফেরদের) আলোচনা উঠল। আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ রহ.) কাঁদতে লাগলেন এবং আমি শুনেছি যে, তিনি বলতে লাগলেন, 'জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই'। অন্য কেউ কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন, 'শত্রুর মোকাবেলার চেয়ে উত্তম কিছু নেই'।"- আলমুগনি ৯/১৯৯

আহমাদ রহ. এর কাছে জিহাদ এতই প্রিয় ছিল যে, খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ- যিনি খালকে কুরআনকে সমর্থন না করায় আহমাদ রহ.কে নিদারুণ ও নির্মম

নির্যাতন করেছেন- তিনি যখন বাতেনী কাফের বাবাক আলখুররামি ও তার বাহিনিকে পরাজিত করতে সক্ষম হন, তখন আহমাদ রহ. খুশি হয়ে তাকে মাফ করে দেন। **ইমাম যাহাবি রহ. আহমাদ বিন সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন,**

بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك، وظفر به، أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي. اهـ

"আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মু'তাসিম বিল্লাহ যেদিন বাবাকের রাজধানী বিজয় করেন এবং বাবাককে পাকড়াও করতে সক্ষম হন কিংবা যখন তিনি আমুরিয়া বিজয় করেন, তখন আহমাদ রহ. তাকে মাফ করে দেন এবং বলেন, 'আমি তাকে আমার প্রহারের অপরাধ মাফ করে দিলাম।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২৫৭-২৫৮

মু'তাসিম বিল্লাহ আহমাদ রহ.কে কতটুকু নির্মম নির্যাতন করেছিল তা সকলের জানা। আড়াই বছর পর্যন্ত জেলে ভরে রেখেছেন। তাকে এমনও শিকল পরানো হতো যে, শিকলের ভারেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খালি গায়ে দু' হাত দুই দিকে টানা দিয়ে বেঁধে মু'তাসিম বিল্লাহর সামনে হাজির করা হল ইমাম আহমাদ রহ.কে। মু'তাসিম বিল্লাহ বললেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদিস যদি পারেন দেখান। মু'তাসিম বিল্লাহ ভড়কে গেল। কিন্তু দরবারি মোল্লারা বুঝাল, আমীরুল মু'মিনীন! এ লোকটা কাফের হয়ে গেছে। একে হত্যা করুন। মু'তাসিম জল্লাদকে আদেশ দিল, একে চাবুক মারো। চাবুক শুরু হল। একেকটা আঘাত এমন ছিল যেন, মৃত্যু প্রতিক্ষা করছে। মু'তাসিম বিল্লাহ আবারও প্রস্তাব দিলেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. আগের মতোই জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদিস যদি পারেন দেখান। মু'তাসিম আবারও জল্লাদকে আদেশ দিল। আবারও চাবুক শুরু হল। আহমাদ রহ. জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ চাবুক বন্ধ রইল। কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরল, আবার শুরু হল চাবুক। আবারও তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আবার হুঁশে

আসলেন। আবার শুরু হল। এভাবেই আহমাদ রহ.কে নির্যাতন করতো মু'তাসিম বিল্লাহ। কিন্তু যিন্দিক বাবাক আলখুররামি- যাকে বিশ বছর যাবৎ পরাজিত করা যাচ্ছিল না- তার বিরুদ্ধে যখন তিনি জয় লাভ করলেন, আহমাদ রহ. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। জিহাদকে তিনি এমনই ভালবাসতেন।

ইমাম আহমাদ রহ. যদিও জালেম খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু আহলে সুন্নাহর বিশিষ্ট ইমাম আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. যখন মু'তাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহীদ হন, তখন তিন তার প্রশংসা করেন। **২৩১ হিজরির আলোচনায় ইবনে কাসীর রহ. বলেন,**

فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها. اهـ

"এ বছরের শা'বান মাসে গোপনে আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর হাতে বাইয়াত সংঘটিত হয়। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সুলতানের বিদআত, খালকে কুরআনের দিকে দাওয়াত এবং তার উমারা ও ঘনিষ্টজনদের পাপাচারসহ আরো বিভিন্ন কারণে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এ বাইয়াত সংঘটিত হয়।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬

কিন্তু তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। সুলতানের হাতে বন্দী হন এবং শহীদ হন। **একদিন আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর সামনে তার আলোচনা উঠলে তিনি তার প্রতি আপ্লুত হয়ে বলেন,**

رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له. اهـ

"আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর জন্য আপন প্রাণ বিলিয়ে দিতে তিনি কতই না অগ্রগামী ছিলেন। তার জন্য তিনি আপন প্রাণ উৎস্বর্গ করে গেছেন।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইনশাআল্লাহ যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একজন প্রকৃত মুজাহিদ ছিলেন। আল্লাহর

রাস্তায় রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বীনের পথে স্বশরীরে জিহাদ করেছেন। অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। জিহাদকে ভালবেসেছেন। জিহাদে খুশি হয়েছেন। জিহাদকে সকল আমলের চেয়ে উত্তম মনে করেছেন।

***

শেষকথা

আইম্মায়ে আরবাআরা ব্যাপারে এ হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আশাকরি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই পরিষ্কার যে, তাদের সকলেই মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের পথে জীবন দিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন। আমাদের জিহাদে তারাই আমাদের অনুসরণীয়। মুজাহিদিনে কেরাম যা করছেন তাদেরই অনুসরণে করছেন। তাদের দিয়ে যাওয়া ফতোয়ার ভিত্তিতেই করছেন। কিন্তু হায়! এমনসব লোকই আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসে গেছেন, যারা নিজেদেরকে আইম্মায়ে আরবাআর অনুসারি বলে দাবি তো করেন, কিন্তু তাদের সীরতের ব্যাপারে কোন ধারণাই তারা রাখেন না। তাদের রেখে যাওয়া আদর্শের ব্যাপারেও তারা বেখবর। যে পথে তারা জীবন দিয়ে গেছেন, সে পথকেই তারা অস্বীকার করছেন। কোনো দিন তারা সে পথে চলেননি বলেও দাবি করছেন। বরং সে পথকে অস্বীকার করতে তাদেরকেই দলীল হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন। কত বড় অজ্ঞতা! কত বড় জাহালত! নয়তো কত বড় ইফতিরা! কত বড় বুহতান! কত সাংঘাতিক অপবাদ।

***

ফাওয়ায়েদ

আইম্মায়ে আরবাআর সীরত থেকে আমাদের বেশ কিছু সমকালীন মাসআলার সমাধান পাওয়া যাবে। আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

- আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ.সহ তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐ সকল উলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে দ্বীন, যারা নিজ নিজ যামানার জালেম শাকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছেন, তাদের সকলের মতেই জালেম শাসক- কাফের না হলেও- তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয। অতএব, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে ইজমার কথা বলা হয় তা সঠিক নয়। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম বিদ্রোহ না করার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

- যিন্দিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জরুরী। এতে কোনো দ্বিমত নেই। এজন্যই যিন্দিক বাবাক আলখুররামির বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিজয়ে আহমাদ রহ. যারপরনাই খুশি হয়েছেন।

- জিহাদ ফরয বা সহীহ হওয়ার জন্য ইসলাহে নফস আবশ্যক নয়। আমরা দেখেছি, আবু হানিফা, মালেক ও আহমাদ রহ.কে যারা নির্যাতন করেছে, তারাই কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। আইম্মায়ে কেরাম সেগুলো সমর্থন করেছেন বরং উৎসাহিত করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব শাসক ফাসেক ও জালেম ছিল। এতদসত্বেও আইম্মায়ে কেরাম তাদের সাথে মিলে কাফের-মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তাদের জিহাদগুলোকে সমর্থন করেছেন। বুঝা গেল, ইসলাহে নফস জিহাদের জন্য শর্ত নয়- যেমন নামায রোযার জন্য শর্ত নয়।

- জিহাদের জন্য গোপনে বাইয়াত হওয়া এবং বাইয়াত গোপন রাখা জায়েয। যেমন, নফসে যাকিয়্যা রহ. ও তার ভাই ইব্রাহিম রহ. এর বাইয়াত গোপনে হয়েছিল। আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. গোপনে গোপনেই ফতোয়া দিয়েছিলেন। তদ্রূপ, আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর বাইয়াতও গোপনেই হয়েছিল।

- জিহাদের পক্ষে গোপনে গোপনে ফতোয়া দেয়া জায়েয। যেমন ইমাম মালেক রহ. ও আবু হানিফা রহ. দিয়েছিলেন।

- জিহাদের জন্য গোপনে গোপনে আর্থিক সহায়তা দেয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যায়দ বিন আলী রহ.কে গোপনে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।

- জিহাদের পক্ষে থেকে নির্যাতিত হওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. নির্যাতিত হয়েছেন।

- জিহাদের অপরাধে জেলে যাওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. জেলে গিয়েছেন।

- জিহাদের জন্য শহীদ হওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. ও আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. শহীদ হয়েছেন।

- জিহাদের জন্য ট্রেনিং নেয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ট্রেনিং নিয়েছেন।

- আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা পাহারাদারি করা জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ও আহমাদ রহ. রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

- আল্লাহর রাস্তায় স্বশরীরে যুদ্ধ করা জায়েয, যেমন আহমাদ রহ. যুদ্ধ করেছেন।

- অন্যকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা জায়েয। যেমন, আব হানিফা রহ. মানসূরের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আহমাদ রহ. এক ব্যক্তিকে সীমান্তে গিয়ে পাহারাদারি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

- জিহাদের কথা স্বরণ হলে কাঁদা জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. কেঁদেছেন।

- শহীদের প্রশংসা করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. আবু ইসহাক ফাযারির ভাইয়ের প্রশংসা করেছেন। আহমাদ রহ. আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর প্রশংসা করেছেন।

- মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল ও জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়া জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. সীমান্তবাসীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চিঠি লিখেছেন। মালেক রহ.কে মানসূরের বাইয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা মানা আবশ্যক নয় বলে জওয়াব দিয়েছেন।

- মুজাহিদদের বিজয়ে খুশি হওয়া জায়েয (যদিও মুজাহিদরা বা তাদের আমীর ফাসেক হয়)। যেমন, বাবাকের বিরুদ্ধে মু'তাসিমের বিজয়ে আহমাদ রহ. খুশি হয়েছেন, অথচ মু'তাসিম ফাসেক ছিল। তার বাহিনির বহু মুজাহিদিই ফাসেক ছিল।

- জিহাদের জন্য পায়ে হেঁটে চলাও জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে ত্বরাতূস গিয়েছেন।

- বড় আলেম বরং সবচেয়ে বড় আলেমদের জন্যও জিহাদ জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরবাআর সকলেই যুগের শ্রেষ্ট আলেম ছিলেন।

- শাগরেদকেও জিহাদের ময়দানে নিয়ে যাওয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. তার শাগরেদ রবি বিন সুলাইমানকে নিয়ে ইস্কান্দারিয়ায় রিবাতে গিয়েছেন।

- শাগরেদের জন্যও উস্তাদের সাথে জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, রবি বিন সুলাইমান আপন উস্তাদ শাফিয়ি রহ. এর সাথে রিবাতে গিয়েছেন।

- ছোট বেলা থেকেই জিহাদের ট্রেনিং নেয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ছোট বেলা থেকেই জিহাদের ট্রেনিং নিতেন।

- যুবক বয়সে জিহাদ করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তার বয়স ৪১ বছর।

- বৃদ্ধ বয়সেও জিহাদ করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তার বয়স ৬৭ বছর।

- জিহাদের জন্য যুবক বয়সেও নির্যাতিত হওয়া জায়েয, বৃদ্ধ বয়সেও জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন উমাইয়াদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তিনি যুবক আর যখন আব্বাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তিনি বৃদ্ধ।

- উলূমে হাদিসে মাহের হলেও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরবাআ সকলেই (বিশেষত ইমাম আহমাদ রহ.) উলূমে হাদিসে মাহের ছিলেন।

- ফিকহে মাহের হলেও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরআবা সকলেই ফিকহে মাহের ছিলেন (বিশেষত আবু হানিফা রহ.)।

- হাদিসের উস্তাদদের জন্যও জিহাদে যাওয়া জায়েয। মেযন, মালেক রহ. ও আহমাদ রহ. উভয়ই নিয়মতান্ত্রিক হাদিসের দরস দিতেন।

- জাস্টিস তথা বিচারকদের জন্যও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. এক সময় জাস্টিস ছিলেন।

***

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৭৭৬

মজলিসে শূরায় মহিলা সদস্য থাকতে পারবে কি?-

তাকি উসমানী সাহেবের বিভ্রান্তি

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-০৩-২০১৯

ইমামুল মুসলিমীনের একটি বড় দায়িত্ব হল, পরামর্শ করে কাজ করা। এ ব্যাপারে কুরআন হাদিসে অনেক তারগীব এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় পরামর্শ করে কাজ করতেন। ছোট-খাট বিষয়েও পরামর্শ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যও এমনই ছিল। এটিই মুমিনদের সিফাত।

অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বা খুলাফায়ে রাশেদার নির্দিষ্ট সদস্যবিশিষ্ট নির্ধারিত কোন বোর্ড ছিল না। যখন দরকার পড়তো বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে পরামর্শ করতেন। নির্দিষ্ট কোন মজলিসে শূরা ছিল না। যাহোক, এখন যদি আমীরুল মু'মিন পরামর্শের জন্য কোনো বোর্ড তথা মজলিসে শূরা গঠন করেন, তাহলে মহিলাদেরকে সে বোর্ডের নিয়মতান্ত্রিক সদস্য রাখা যাবে কি'না যে: শূরার তারিখে মহিলারাও উপস্থিত হবে, তাদের কাছেও পরামর্শ চাওয়া হবে এবং তাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজও করা হবে?

যদি আমরা শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির দিকে তাকাই, তাহলে এটার বৈধতা পাওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। যেমন,

এক. মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

"তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে অবস্থান করবে।"- আহযাব ৩৩

মজলিসে শূরায় শরীক হওয়ার জন্য মহিলারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানী, জেলা শহর বা যেখানে মজলিসে শূরা বসবে সেখানে উপস্থিত হতে যাওয়া বিনা দরকারে এ আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ। অধিকন্তু ফিতনার আশঙ্কায় যেখানে মসজিদে

যেতেও মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে পুরুষদের সাথে এসে এক মজলিসে শরীক হওয়ার অনুমতি কিভাবে হবে? বরং মহিলারা ঘরে থাকবে, ঘরেই প্রতিপালিত হবে- এটাই শরীয়তের কাম্য। বাহিরের কাজে অংশ নেয়া শরীয়তের কাম্য নয়। মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হল,

مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

"যারা অলংকার মণ্ডিত হয়ে প্রতিপালিত হয় আর তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদানে অসমর্থ্য।"- যুখরুফ ১৮

দুই. সাধারণত মহিলাদের শারীরিক শক্তি, স্বরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সব কিছুই পুরুষের তুলনায় কম। পুরুষের তুলনায় তাদের দ্বীনও অপূর্ণাঙ্গ, বিবেক-বুদ্ধিও অপূর্ণাঙ্গ। হাদিসে তাদেরকে বলা হয়েছে,

ناقصات عقل ودين

"যাদের আকল ও দ্বীন উভয়ই অপূর্ণ।"- সহীহ বুখারী ৩০৪, সহীহ মুসলিম ২৫০

এ কারণে শরীয়ত মহিলাদের একক সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। সাথে পুরুষ থাকলেই কেবল গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। তখনও আবার দুই মহিলা মিলে এক পুরুষের সমান। অর্থাৎ এক মহিলা এক পুরুষের অর্ধেক।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

"যেসকল সাক্ষীর প্রতি তোমরা রাজি-খুশি তাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা; যাতে এক মহিলা ভুলে গেলে একজন অপরজনকে স্বরণ করিয়ে দিতে পারে।"- বাকারা ২৮২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

»أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين .«

"তাদের আকল অপূর্ণ হওয়ার দলীল এই যে, দুই মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটি আকলের অপূর্ণতার কারণে। আর (হায়েযের দিনগুলোতে) তারা অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করে যে, তাদের নামায পড়তে হয় না এবং রমযানের দিনে রোযাও রাখতে হয় না। এটিই তাদের দ্বীনের অপূর্ণতা।"- সহীহ মুসলিম ২৫০

সৃষ্টিগতভাবেই যারা দুর্বল এবং অপূর্ণাঙ্গ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও যারা অপূর্ণাঙ্গ, তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর স্পর্শকাতর বিষয়াশয়ে শরীক করা, তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া, সে অনুযায়ী কাজ করা নিশ্চয়ই উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা না হয়ে তাদের সাথে খিয়ানত হবে। পুরুষ তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়নি যে, তাদের বাদ দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে মজলিসে শুরায় শরীক করতে হবে। নিশ্চয়ই এটা আমানতদারি নয়। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ তাআলার এ আদেশের পরিপন্থী,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা অবশ্যই আমানতসমূহ উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবে।"- নিসা ৫৮

তিন. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, তারা কখনও মহিলাদেরকে পরামর্শের মজলিসে আরো দশ পুরুষের সামনে উপস্থিত করে পরামর্শ নিতেন না। আর নিয়মিত মহিলাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য বানানোর তো কোন প্রশ্নই আসে না।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, মহিলাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য করে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়াশয়ে তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া শরীয়তের নির্দেশও নয়, কাম্যও নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীকাও নয়। এটি সম্পূর্ণই একটি নব আবিষ্কৃত বিদআতি বিষয়। শরীয়তের উসূল-মূলনীতি ও মেজাজ পরিপন্থী একটি কাজ। আর ফিতনার

আশঙ্কার কথা তো বলাই বাহুল্য। এ গেল আম দলীল। আর যদি খাস দলীলের দিকে যাই, তাহলে দেখতে পাবো

হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণী,

"كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله، رأينا لهن بذلك علينا حقا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا". (صحيح البخاري 5843، كتاب اللباس، باب ما كان [ص:152] النبي ﷺ يتجوز من اللباس والبسط)

"জাহিলি যামানায় আমরা মহিলাদের কোন পজিশন আছে বলেই মনে করতাম না। এরপর যখন ইসলাম আসল, আল্লাহ তাআলা মহিলাদের কথা আলোচনায় আনলেন, তখন মনে হল যে, আমাদের কাছে তাদের কিছু হক পাওনা আছে। **কিন্তু আমাদের (রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক) বিষয়াশয়ের কোনো কিছুতেই আমরা তাদেরকে শরীক করতে পারি না।"**- সহীহ বুখারি ৫৮৪৩, কিতাবুল লিবাস।

বর্ণনার শুরুর অংশটি অন্য রিওয়াতে এভাবে এসেছে,

"والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم". (صحيح البخاري 4913، كتاب التفسير، باب {تبتغي مرضاة أزواجك}

"আল্লাহর কসম! জাহিলি যামানায় আমরা মহিলাদের কোনো অবস্থান আছে বলেই মনে করতাম না। (এভাবেই চলছিল) অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের (সাথে সদাচরণের) ব্যাপারে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন এবং যে হক তাদেরকে দেয়ার তা দিলেন।"- সহীহ বুখারি ৪৯১৩, কিতাবুত তাফসীর।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে ভাল আচরণের আদেশ দিলেন এবং তারা নাফাকা ও মিরাস পাবে বলে বিধান দিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়াশয় তেমনই রয়ে গেল যেমন আগে ছিল। আগেও যেমন সেখানে তাদের কোন অধিকার ও অংশগ্রহণ ছিল না, ইসলাম আসার পরেও তাদের কোন অধিকার নেই। অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

আল্লামা কিরমানী রহ. (৭৮৬হি.) উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

(أمراً) أي شأناً بحيث يدخلن في المشورة؛ وأنزل الله فيهن مثل «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» وقسم مثل «ولهن الربع مما تركتم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن». اهـ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: 18\156-157، كتاب التفسير، بَاب {تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ})

"অর্থাৎ **মহিলারা পরামর্শে শরীক হতে পারে মতো কোনো অবস্থান রাখে বলে মনে করতাম না।** এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে এ ধরণের আয়াত নাযিল করেন, 'তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাবন করবে'। 'ক্ষতির উদ্দেশ্যে তোমরা তাদেরকে আটকে রাখবে না'। 'অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না'। এবং তাদেরকে এ ধরণের হক দিলেন, '(তোমাদের সন্তানাদি না থাকলে) তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ তাদের'। 'মায়েদের ভরণ-পোষণ পিতাদের দায়িত্বে'।"- আলকাওয়াকিবুদ দারারি ১৮/১৫৬-১৫৭

মোটকথা, শারীরিক দুর্বলতা ও বুদ্ধিমত্তার কমতির কারণে জাহিলি যামানাতেও মহিলারা অপূর্ণ বিবেচিত হতো। প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয়ে অংশ নেয়ার অনুপযুক্ত বিবেচিত হতো। এমনকি তাদের কোন হক আছে বলেই মনে করা হতো না। পুরুষরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদের ব্যবহার করতো। ইসলাম এসে পুরুষদেরকে আদেশ দিল নারীদের সাথে সদাচরণ করতে। তাদের দেখাশুনা করতে। তাদের ভরণ-পোষণ দিতে। মৃত আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তাদেরকেও একটা অংশ দিতে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়াশয় আগের মতোই রয়ে গেল। সেখানে তাদের কোন অংশ নেই। শারীরিক দুর্বলতা ও আকল-বুদ্ধির কমতির কারণে সেখানে অংশ নেয়ার কোন যোগ্যতা তাদের নেই।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বিষয়টিই পরিষ্কার করে বলেছেন,

من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا

‘কিন্তু আমাদের (রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক) বিষয়াশয়ের কোনো কিছুতেই আমরা তাদেরকে শরীক করতে পারি না।’

বড়ই আফসোসের বিষয়! সাহাবায়ে কেরাম যেখানে নববী ও সাহাবি যামানাতেও মহিলাদেরকে রাষ্ট্রীয় সামান্য থেকে সামান্য বিষয়ে অংশ গ্রহণের যোগ্য মনে করতেন না, সেখানে আজকের সমাজের রাহবারগণ এ ফিতনা ফাসাদের যামানাতেও না’কি মহিলাদেরকে রাষ্ট্রীয় মজলিসে শূরার নিয়মিত সদস্য রাখাতে এবং তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করাতে শরীয়তের বিপরীত কিছু দেখেন না। **বড়ই আফসোস তাকি সাহেবের উপর**, যিনি সাহাবায়ে কেরামের বিপরীতে এমন কথা বলতেও কোন দ্বিধা করলেন না,

کوئي ايسي واضح نص بھي موجود نہيں ھے، جس کي بنا پر کہا جائے کہ انہيں شوری میں شامل نہيں کيا جا سکتا-

“এমন কোন সুস্পষ্ট দলীলও অবশ্য বিদ্যমান নেই, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মহিলাদেরকে শূরাতে শামিল করা যাবে না।”- ইসলাম আউর সিয়াসি নজরিয়্যাত ২৬৯

বড়ই আফসোস যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুস্পষ্ট বক্তব্যটি উনার কেন নজরে পড়লো না! কেনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের পাতাগুলো উনার নজরে আসলো না! যামানার বাতিল মতবাদের চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে গেলে এভাবেই মানুষ চক্ষুষ্মান হয়েও চোখে দেখে না। হে আল্লাহ তোমার কাছে এ থেকে পানাহ চাই। অহীর নূর থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৫৭

শাসকদের দরবারে যাতায়াতকারী আলেম হতে সাবধান !!!

abu ahmad

Senior Member

০৮-০৬-২০১৯

শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আমি মুসলমানদেরকে বলি, তোমরা ঐ সকল লোকদের থেকে হক্ব ঘোষণার অপেক্ষায় থেকো না, যারা শাসকদের দরবারে যায়, তাদের সাথে উঠা-বসা করে, তাদের হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করে। যদিও এরূপ কারো কারো থেকে এমনটি হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ এমনটিই ঘটেছে যে, তারা তাদের ক্ষমতার অনুগত হয়ে যায় এবং এই প্রবাদ বচনের মত হয়, "যে তাদের খেজুর খেয়েছে, সে তাদের আদেশেই চলেছে"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে পল্লী এলাকায় বাস করে সে সভ্যতা বঞ্চিত হয়, যে শিকারের পিছনে পড়ে সে গাফেল হয়ে যায়, আর যে শাসকদের নিকট আসে সে (ফিতনার) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়"। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালাফে সালেহীনগণ শাসকদের দরবার থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিতেন, কারণ সেখানকার ফিতনা ভয়ংকর। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন, তুমি যথাসম্ভব শাসকদের দরবার থেকে দূরে থাকবে, তাদের সাক্ষাতে যাবে না, তাদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ এটি সর্বনিকৃষ্ট স্থান। যা দ্বীনকে ছোট করে এবং তোমাকে মহা অপরাধের নিকটবর্তী করে দিবে। হে প্রবঞ্চিত, কূপের গর্তে পড়ার আগেই সতর্ক হও।" এ কথা বলেছেন ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক খলীফা হারূনুর রশীদের যামানায়, যিনি শরীয়তের হেফাজত করেছেন আর খ্রিস্টানদের উপর জিযিয়া আরোপ করেছেন। যিনি রোমের বাদশার নিকট এই মর্মে পত্র লিখেছিলেন, "আমিরুল মুমিনীন হারূনুর রশীদের পক্ষ থেকে রোমের কুকুর নাকফূরের প্রতি"। যিনি এক বছর হজ্জ করতেন আর এক বছর জিহাদ করতেন। তাহলে আমাদের যামানার শাসকদের ব্যাপারে তারা কী বলতেন, যারা ক্রুশের পূজারীদের ভালবাসা অর্জনের প্রতিযোগিতা করছে? আপনি কি ভেবে

দেখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক ও ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাহিমাহুমাল্লাহ যদি আমাদের যামানার আলেমদের দেখতেন, দেখতেন শাসকদের দরজায় তাদের ভিড়, তাদের নিকট সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের এমন অতিশয় প্রশংসা, যা খলীফা হারূনুর রশীদের ব্যাপারে করা হলেও অতিরঞ্জন হত, তাহলে তারা কী বলতেন?

কালেক্টেড...

****

সম্মানিত ভাইয়েরা, উম্মাহর আসল হিতকামী উলামায়ে মুজাহিদীনকে চিনুন...তাদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করুন...তাদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন...তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করুন...! আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে কবুল করুন এবং তাওফিক দান করুন। আমীন

আজ মুসলিম উম্মাহ চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত। তাদের মুক্তির জন্য কোন দরবারী আলেমরা ডাক দিবে না। আপনারা এই মিথ্যে আশায় থাকবেন না...বাস্তবতা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন...এখনই সতর্ক হোন, নতুবা কঠিন পরিস্থিতির অপেক্ষা করুন...! যেমনটা ইতিমধ্যেই কাশ্মিরে শুরু হয়ে গেছে... আল্লাহ তা'আলা কাশ্মিরী মুসলিদেরকে হেফাযত করুন। আমীন)পরবর্তী টার্গেট হয়ত আপনি/আমি..! অতএব, আজ থেকেই প্রস্তুতি শুরু করুন...ইনশা আল্লাহ হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন এবং হিদায়াতের পথে অটল, অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন...আল্লাহুম্মা আমীন

আপনাদের নেক দুআয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলে যাবেন না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৮৬

শাসকদের ব্যাপারে সাবধান-

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. এর উপদেশমালা ও শিক্ষা

Munshi Abdur Rahman

Moderator

০৮-০৪-২০১৯

ডাউনলোড লিংক:

ওয়ার্ড:

https://archive.org/download/shasokd...২০shabdan.docx

পিডিএফ:

https://archive.org/download/shasokd...%২০shabdan.pdf

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. আব্বাদ ইবন আব্বাদ আল খাওয়াস আল-আরসুফি[iii] কে একটি চিঠিতে বলেছিলেন-

"তুমি এমন এক সময়ে বসবাস করছ যে সময়ে বসবাস করা থেকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পানাহ চাইতেন। অবশ্যই দ্বীন এর যেকোনো ব্যাপারে তারা আমাদের চাইতে ভাল বুঝতেন। দ্বীন এর ব্যাপারে অন্যান্যদের মতামতের চাইতে তাদের মতামত আমাদের কাছে অগ্রগণ্য। ভাববার বিষয় হল সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে সময়টাকে অপছন্দ করতেন সে সময়ে আমরা যারা অবস্থান করছি তাদের কী অবস্থা? যেখানে আমাদের সাহাবাদের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তুলনায় জ্ঞান কম, ধৈর্য কম, ভাল কাজে সাহায্যকারী কম, মানুষের মধ্যে মহামারীর মত দুর্নীতির বিস্তার সর্বোপরি একটি ভয়াবহ দূষণযুক্ত পৃথিবীতে আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে। তোমার প্রতি নসীহা হচ্ছে দ্বীনের সঠিক ও মূল রাস্তাটি খুঁজে নাও এবং একে আঁকড়ে ধরে রাখ।[iv] তোমার প্রতি আমার উপদেশ থাকবে গুরাবা হয়ে থাকো যেহেতু সময়টায় গুরাবা হয়ে থাকার।[v]

একাকী থাকো এবং মানুষজনের সাথে কম মেশার চেষ্টা করো। পূর্ববর্তী সময়ে লোকেরা একজন আরেকজন দ্বারা উপকৃত হতেন। কিন্তু বর্তমানে উপকারের চাইতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই আমাদের মতে লোকজনকে পরিত্যাগ করার মধ্যেই তোমার ঈমানের নিরাপত্তা নিহিত।[vi]

শাসকদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। যে কোন উদ্দেশ্যেই তাদের কাছে যাওয়া ও তাদের সংশ্রব এর ব্যাপারে সাবধান থেকো। তাদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাবধান। শয়তানের খুব সূক্ষ্ম চাল হল সে মানুষের অন্তরে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যে "আমিতো শুধু মাত্র অসহায় লোকদের সাহায্য করার জন্য বা কারো উপর আরোপ করা জুলুমের ভার লাঘব করার জন্য শাসকদের সাথে আছি বা তাদের কাছে আসা যাওয়া করি। এই ধোঁকায় অনেকেই পড়ে আছে যারা এই যুক্তিকে শাসকের কাছে প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য অজুহাত হিসেবে কাজে লাগায়।[vii]

এটা বলা হয়ে থাকে যে- "জাহিল আবিদ ও উলামায়ে সু এর ফিতনা এর ব্যাপারে সাবধান থেকো। কারণ এই দু'দলের ফিতনা এমন ধরণের যা সকলকেই সহজেই গোমরাহীতে ফেলে দেয়"।

যদি তোমার কাছে কোন প্রশ্ন আসে ও এর জন্য কোন ফতোয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে এটি করতে যেয়ে এর সুবিধাটুকু গ্রহণ করো। কিন্তু সাবধান এর জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে যেয়ো না। ঐ সকল লোকদের মত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হও যারা তাদের ফতোয়াগুলো মানা হলে খুশি হয়, যারা তাদের কথাগুলো প্রচার হলে বা অনেক মানুষ শুনলে আত্মতুষ্টিতে ভোগে। যখন এর উলটোটা ঘটে তখন তার প্রভাব এই সকল আত্মতুষ্টিতে ভোগা লোকজনের মধ্যে দেখা যায়।[viii] নেতৃত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সতর্ক হও। যদিও যে কোনো মানুষের কাছে নেতৃত্ব স্বর্ণ-রুপার চাইতেও বেশি পছন্দের তবু এটি কঠিন ও অস্পষ্টতায় ভরপুর। এবং বিজ্ঞ উলামাগণ ছাড়া এটি অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারেনা।[ix] তাই নিজের নফসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ ও সহীহ নিয়তে কাজ করতে থাকো। মনে রেখ মানুষের জীবনে এমন কিছু ব্যাপার আসে যার চাইতে মৃত্যু তার কাছে অনেক বেশি পছন্দের মনে হয়।

ওয়াসসালাম।[x]

মন্তব্য:

[i] সায়েখ সালিম আল-হিলালি এর "ওয়াসাউস-সালাফ" নামক বই থেকে উপরোক্ত ওসিয়াত এর ব্যাখ্যা নেয়া হয়েছে।

[ii] তার পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ সুফিয়ান ইবন সাইদ ইবন মাসরুক আস সাওরি (৯৭-১৬১ হিজরি)।

তার সাওরি খেতাবটি এসেছে ইবন আবদ মানাত থেকে। হামদান এর সাওরি থেকে নয়। তার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তাকে বলা যায় জ্ঞানের এক বিশাল আধার। পূর্ববর্তী উলামাগণের মধ্যে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার জীবনী সুবিদিত এবং জারহ ও তা'দীল (বর্ণনাকারীগণের ন্যায়পরায়ণতা বা দোষত্রুটি সংক্রান্ত ইলম), ইতিহাস এবং ফিকহ গ্রন্থে ভরপুর।

সুফিয়ান সাওরি রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর ব্যাপারে কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল যেগুলো যাহাবী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর "সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা" ও আল-হাফিজ ইবন হাজার আল-আসকালানী রহ. এর "তাহযীবুত তাহযীব" থেকে নেওয়া হয়েছে।

তার উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন-"আবু ইসহাক আস-শা'বী, আল-আ'মাশ, সুলায়মান আত-তাইমী, ইব্রাহিম ইবনে মাইসারাহ, ইবন আওন, যাইদ ইবনে আসলাম, আমর ইবনে দিনার, ইবনে আজলান, ইবনুল মুনকাদির, আবু-যুবায়ের, ইয়াহইয়া ইবন সাইদ আল আনসারী প্রমুখ।

তার ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন : শু'বাহ, আল- আওযায়ী, মালিক, আব্দুর রাহমান ইবনে মাহদি, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাত্তান, ইবনুল মুবারাক, হাফস ইবন গিয়াস, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব, আব্দুর রাযযাক, ফুযাইল ইবন ইয়ায, ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম, ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, আবু নুয়াইম, এবং আলী ইবনুল জাদ- যিনি সুফিয়ান সাওরি থেকে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন।

শু'বাহ, ইবনে উয়াইনাহ, আবু আসিম। ইবনে মায়ীন ও অন্যান্য আরও অনেকে বলেছেন-"হাদীস বিশারদগণের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছেন সুফিয়ান সাওরী। ইবনুল মুবারাক বলেন যে : আমি এক হাজার একশো শাইখের নাম লিখতে পারব কিন্তু সুফিয়ান তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। একলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন -"হে আবু

আবদুল্লাহ, আপনি তো সাইদ ইবনে জুবায়ের সহ অন্যান্যদের দেখেছেন" আবু আবদুল্লাহ উত্তরে বলেন- "সেটা ছিল পূর্ব সময়কার ব্যাপার। আমি একথা বলিনি যে আমি সুফিয়ান এর চাইতে উত্তম আর কাউকে দেখিনি।

"ইবন মাহদী বলেছেন- "ওয়াহহাব 'মালিক' এর চাইতে 'সুফিয়ান' এর স্মরণশক্তিকে প্রাধান্য দিতেন"।

আদ-দুওয়ারি বলেছেন-" আমি ইয়াহইয়া ইবন মাইন কে দেখেছি যে তিনি তার সময়কালে ফিকহ, হাদিস, যুহদ সহ যেকোনো বিষয়ে অন্য যে কারো চেয়ে সুফিয়ানকেই প্রাধান্য দিতেন।

আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. বলেন- "আমার অন্তরে যে সকল শাইখদের জন্য ভালবাসা আছে সুফিয়ান এক্ষেত্রে অগ্রগামী"

আন-নাসাই বলেছেন-" তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চাইতেও তিনি অনেক বড়। আমি আশা করি তিনি সে সকল ইমামদের একজন যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বাসীদের জন্য ইমাম হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

ইবনু আবী যিহব বলেন –"আমল, আখলাক, জ্ঞান ও দ্বীন এর সঠিক বুঝের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের সবচাইতে কাছাকাছি হিসেবে আমি সুফিয়ান কে পেয়েছি। তাবেয়ীগণের কাছাকাছি হওয়ার ক্ষেত্রে তার চাইতে উত্তম কাউকে পাইনি। ইবন হিব্বান বলেছেন- "ফিকহ, জিহাদ ও ন্যায়পরায়ণতায় তিনি ছিলেন অগ্রগামীদের একজন" ইবন উয়াইনাহ বলেছেন- "হালাল-হারাম সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরির চেয়ে অভিজ্ঞ আর কাউকে আমি দেখিনি।

ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ বলেন – "আমি আব্দুর রাহমান ইবন মাহদি কে সুফিয়ান, শু'বাহ, মালিক ও ইবনুল মুবারাক এর নাম উল্লেখ করার পর বলতে শুনেছি -এদের মধ্যে সুফিয়ানই সবচাইতে জ্ঞানী।

মুহাম্মাদ ইবন যুনবুর বলেন -"আমি ফুযাইল কে বলতে শুনেছি- আল্লাহর শপথ, সুফিয়ান আবু হানিফার চাইতেও জ্ঞানী ছিলেন।

বিশর আল হাফি বলেন -"সাওরি আমাদের কাছে জনসাধারণের ইমাম"।

কাবীসাহ বলেন – "আমি সুফিয়ান সাওরির সাথে বসেছি অথচ মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়নি এমনটা কখনো ঘটেনি। তার মত এত বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করতে আর কাউকে দেখিনি।

সুফিয়ান সাওরিকে বলা হয়েছিলো "আপনি আর কত বছর হাদীস নিয়ে গবেষণা করতে চান? উত্তরে তিনি বলেছিলেন- হাদীস নিয়ে গবেষণা করার চাইতে উত্তম আর কি আছে? হাদীসের জ্ঞান পৃথিবীর সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আব্দুর রাহমান ইবনে মাহদি বলেন – "আল্লাহ রাসুল (সাঃ) থেকে আমি যত হাদীস পেয়েছি প্রত্যেকটি হাদীসে আমি অন্তত একবার হলেও আমল করেছি। সম্পাদকের সংযোজন এখানেই শেষ হল।

তার জীবন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে তাহযীবুল কামাল (১১/৫৪), আত-তাবাকাতুল কুবরা (৬/৩৭১), তারিখ বাগদাদ (৯/১৫১), সিয়ারু আলামিন নুবালা (৭/২২৯) এই বইগুলোতে । আবু নুয়াইম ইসফাহানী 'হিলয়াতুল আওলিয়া' বইতে তার পরিপুর্ণ ও বিস্তারিত জীবনী লিখেছেন। এই বই এর মত আর কোন বই পাওয়া যায় না।

৩) তার নাম আবু উতবাহ আব্বাদ ইবন আব্বাদ ইবন খাওয়াস আল-আরসুফি আস-শামি। শামের একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। (এখানে শাম বলতে সিরিয়া, জর্ডান ও ফিলিস্তীনকে বোঝানো হয়েছে)। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল ফাসায়ি ও অন্যান্যরা তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তার জীবন সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে তারীখ দারিমি (নং ৪৯৫), আল ফাসায়ির লিখিত আল-মা'রিফাহ ওয়াত-তারিখ (২/৪৩) এবং হিলায়াতুল আওলিয়া বইতে।

৪) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ও পথ চলা থেকে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে প্রত্যেকের মাঝে ইত্তিবা (রাসুলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ) থাকা জরুরী। যে পথে রাসুল ও তার সাহাবাগণ চলেছেন সে পথকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। ইবন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সাহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে-**"সুন্নাহ অনুসরণ কর ও বিদআতের উদ্ভাবন কর না, এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"**

উপরোক্ত হাদীসটি ওয়াকি' তার আয-যুহদে (৩১৫ নং), আহমাদ তার আয-যুহদে (পৃষ্ঠা ২০২), আদ-দারিমি তার সুনান এর ভুমিকায় (১/৬৯) সহ আরও অনেকে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটির বেশ কয়েকটি সনদ হওয়ায় এর সনদ অনেক শক্তিশালী হয়েছ। এছাড়া আহমাদ ও আত-তাবারানি তাদের আল-কাবির ও সাহিহ গ্রন্থে এটার পাশে অনেক অনুলিখন লিখার কারণে এর সনদ আরও শক্তিশালী হয়েছে।

৫) যারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে, নিজেদেরকে খুব বেশি মানুষের সামনে প্রকাশিত করে না বা মেশে না তাদেরকে 'খামিল' বলা হয়। এটি উত্তম আখলাক ও তাকওয়ার একটি লক্ষণ, কেননা যারা ঈমানের হেফাজতের কথা চিন্তা করে তারা কখনোই "রিয়া" প্রদর্শনের আশংকা থেকে গাফেল হয়ে যায় না। তাই তারা খুব সতর্কতার সাথে চেষ্টা করে মানুষ যেন তাদের ভালো কাজগুলোর কথা জানতে না পারে। তারা নিজেরাও তাদের ভালো কাজগুলোর কথা ভুলে যেতে বা খুব বেশি গুরুত্বের সাথে মনে রাখা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। তারা সাধারণ মানুষ যেভাবে নিজেদের পাপের কথা লুকিয়ে রাখে তার চাইতেও বেশি সতর্কতার সাথে তারা তাদের ভাল কাজগুলোর কথা গোপন রাখে। তারা আশা করে ভালো কাজের ক্ষেত্রে এই আন্তরিকতার জন্য আল্লাহ কেয়ামতের মাঠে তাদেরকে উত্তম পুরষ্কার দান করবেন। এই লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকা লোকগুলো প্রশংসিত হতে চান না, হওয়ার চেষ্টাও করেন না এবং যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে তার যে কোন একটি কাজ তাকে প্রশংসিত করার দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ চাইলে সে কাজ থেকে তারা সরে যান। তারা লোকজনের কাছে প্রকাশিত হতে চান না। ইমাম মুসলিম তার সাহিহ গ্রন্থে (১৮/১০) ও আল বাগভী 'শারহুস সুন্নাহ' (১৫/২১-২২) তে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-"আমির ইবন সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস বর্ণনা করেন-

একদিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মরুভুমিতে তার মেষ ও উটগুলোকে দেখাশোনা করছিলেন, এ সময় তার ছেলে উমর তার কাছে আসলেন। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ছেলেকে দেখতে পেয়ে বললেন-"আমি এই আরোহণকারীর শয়তানী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই"। উমর তার পিতার কাছে এসে বলল; বাবা, আপনি কি মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে মেষ ও উট চরানো আরব হিসেবেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যখন লোকজন আলোচনা করছে যে মদিনার

পরবর্তী শাসক কে হবে?"। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার এর বুকে হালকা করে আঘাত করে বললেন- চুপ কর! "আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- "নিশ্চয় আল্লাহ ধর্মভীরু, নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা বান্দাদের ভালবাসেন"।

তাই সুফিয়ান সাওরী রহ. "সময়টা লোকচক্ষুর অন্তরালে গুরাবা হয়ে থাকার সময়" বলতে বুঝাতে চেয়েছেন এটা এমন একটা সময় যখন লোকজনকে তাদের ভাল কাজগুলোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে হবে। তার মানে এই নয় যে অজ্ঞাত হিসাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে গুরাবা হয়ে থাকতে যেয়ে সে সব কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে অলস অকর্মণ্য হয়ে যাবে। এর স্বপক্ষে ২ টি প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত, নবীজি (সাঃ) বলেছেন-**"আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শক্তিশালী ঈমানদার দুর্বল ঈমানদার থেকে বেশি পছন্দের"**

দ্বিতীয়ত, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত ও বহুল বর্ণিত হাদিস যে নবীজি (সাঃ) সবসময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কুঁড়েমি ও অলসতা থেকে পানাহ চাইতেন।

৬) উযলাহ শব্দের অর্থ একাকী থাকা। এখানে উযলাহ শব্দ দিয়ে লোকজনের সাথে কম মেশার কথা বুঝানো হয়েছে যদিও এখনো লোকজনের কাছ থেকে পারস্পরিক কিছু উপকার নেয়ার রাস্তা রয়েছে। তাই তিনি এ কথা বুঝাতে চাননি যে সকল কে পরিত্যাগ করে থাকতে হবে কারণ একজন দায়ী যদি লোকজনকে আল্লাহ এর পথে নাই ডাকেন তাহলে অজ্ঞ-বিধর্মী এরা কিভাবে আল্লাহর কথা জানবে? সংশয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি কিভাবে সঠিক পথের খোঁজ পাবে? যে আল্লাহকে না মেনে নিজের উপর নিজেই জুলুম করছে সে কিভাবে মুক্তির পথ পাবে? আর এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে যিনি ধৈর্যের সাথে এই সকল লোকজনের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য মেশেন, তাদেরকে আল্লাহ সংশয় দূর করা, জুলুম থেকে উত্তরণের পথ দেখান। তাদের জন্য পরকালে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক পুরষ্কার রয়েছে।

৭) ইবনুল জাওযী (মৃত্যু; ৫৯৭ হিজরি) (রহিমাহুল্লাহ) তার 'তালবীস ইবলিস' বইতে (পৃষ্ঠা ১২১-১২২) বলেছেন-**"উলামাগণ যখন শাসকদের সাথে মেশা শুরু করেন ইবলিস তখন তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। এই ধোঁকার ফলে আলেমগণ শাসকদের তোষামোদ করা শুরু করেন এবং সুযোগ থাকা স্বত্বেও**

তাদেরকে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান থেকে বিরত থাকেন। তারা শাসকদের সে সকল ক্ষেত্রেও ছাড় দেয়া শুরু করেন যেখানে ইসলাম কোন ছাড় দেয়না। এর ফলে তারা দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। আর এভেবেই অন্যায় ও দুর্নীতির রাস্তা তারা খুলে দেন।

প্রথমত, শাসকরা বলে থাকে- আমি যদি সঠিক না হতাম, তাহলে এই সকল আলেমরা অবশ্যই আমাকে বাধা প্রধান করতেন। আর যেহেতু তারা আমার দেয়া সম্পদ-হাদিয়া গ্রহণ করছেন সেহেতু অবশ্যই আমার সম্পদ-হাদিয়া হালাল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ জনগণ বলে থাকে- এই শাসকের শাসন ব্যবস্থা, তার সম্পত্তি, তার কাজ কর্ম সবকিছুই ঠিক আছে। যদি ঠিক না থাকতো তাহলে অবশ্যই উলামাগণ তার সম্পর্কে সমালোচনা করতেন।

তৃতীয়ত, আলেমগণ বলে থাকেন- যেহেতু তারা তাদের দ্বীনকে কলুষিত করেছেন তাই শয়তান ইবলিস তাদের দ্বারা শাসকের উক্তির স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করায়। তারা বলে থাকেন আমরা শাসক ও সাধারণ মুসলিমদের মাঝে মধ্যস্থতা করার জন্য শাসকদের কাছে গিয়ে থাকি। তবে তাদের এই মিথ্যা ধোঁকা প্রকাশিত হয়ে যায় যখন অন্য কেউ শাসক ও মুসলিমদের মাঝে মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে আসে। তারা এই নতুন আগুন্তুককে নিয়ে খুশি হয় না। তারা শাসকের কাছে নতুন আগুন্তুককে নিয়ে আজে বাজে কথা বলে থাকে কারণ তারা শাসকদের একমাত্র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে চায়।

তাই শাসকদের সাথে থাকা ঈমানদারদের জন্য খুব বিপদজনক। যখন আলেম উলামারা শাসকদের দরবারে যান, তখন হয়ত সঠিক নিয়তেই যান, কিন্তু যখন শাসক তাদেরকে সম্মান করা শুরু করেন ও তাদের উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া শুরু করেন, তখন তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা চলে আসে। এর ফলে তারা শাসকদের তোষামোদি করা শুরু করেন ও তাদেরকে তাদের অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। আর এভাবেই তাদের নিয়তের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সুফিয়ান সাওরি বলতেন- "শাসকরা আমাকে অপমান করবে বা ছোট করে দেখবে, এটাতে আমি ভয় পাই না। আমি ভয় পাই যে তারা আমাকে সম্মান করবে, যার ফলে আমার অন্তর তাদের দিকে ঝুকে পড়বে।"

হাফিজ ইবন রজব হাম্বালি (মৃত্যু ৭৯৫ হিজরি) তার শারহুল হাদীস মা'যিবান (পৃষ্ঠা ৫৩) তে বলেন" অনেক সালাফগণ আলেম উলামাদের শাসকদের দরবারে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে যেতেও নিষেধ করে থাকেন। এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যারা তারা হলেন-

উমার ইবন আব্দুল আযিয, ইবনুল মুবারাক, সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ। ইবনুল মুবারাক রহ. বলেছেন – **"আমাদের সাথে যারা তারা এমন নয় যে তারা শাসকদের সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে তাদের দরবারে প্রবেশ করেন। বরং তারা তো এমন; শাসকদের দরবারের বাইরে থেকে তাদেরকে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেন। এই পদ্ধতিতে কাজ করার কারণ একটাই যে, কেউ যখন শাসকদের দরবারে প্রবেশ করে, তখন তার ধোঁকায় পরার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। একজন আলেম যখন শাসকদের দরবার থেকে দূরে থাকবেন, তখন তার ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এক্ষেত্রে তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পূর্বক সে বিষয়ের উপর অটল থাকতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি শাসকদের দরবারে তাদের মুখোমুখি হন তখন তার অন্তর শাসকদের দিকে ঝুকে পড়ে। কেননা সম্মানিত হওয়া ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা মানুষের জন্মগত ভাবেই অন্তরে লুকিয়ে থাকে। এর ফলে তিনি তাদের তোষামোদ করা শুরু করেন ও তাদের প্রতি কোমল হওয়া শুরু করেন, তার অন্তর শাসকদের দিকে ঝুকে পরে, তিনি শাসকদের ভালবাসতে শুরু করেন। শাসক যদি আলেম-উলামাগণকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে গ্রহণ করে, আলেমগণও শাসকদের ভালবাসার সাথে গ্রহণ করা শুরু করেন।** এমন ঘটনাই ঘটেছিল আব্দুল্লাহ ইবন তাউস ও তার সময়কালের একজন শাসকের মধ্যে। ফলে তাউস ছেলেকে বকা দেন ও বিতাড়িত করেন। আর সুফিয়ান সাওরি আব্বাদ ইবন আব্বাদ কে "শাসকদের ব্যাপারে সাবধান-" বলে একটি চিঠি লিখেন।

আন্দালুসের আলেম ইবনু আব্দিল বার (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) তার 'জামিউ বায়ানিল ইলম' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১/১৮৫-১৮৬) অধ্যায়টি এটা বলে শেষ করেছেন যে, **সালাফরা শাসকদের দরবারে যাওয়াকে ঘৃণা করতেন।**

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের সাথে আলেমদের আচরণ কেমন হবে। যাইহোক শাসক যদি মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে তার

দরবারে যাওয়া, তার সাথে দেখা করা, তাকে ভালো ও উত্তম কাজে সাহায্য করা, নিঃসন্দেহে অনেক সওয়াব পাওয়ার মত কাজ। এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই উমার ইবনে আব্দুল আযীয এর জীবনিতে। তার দরবারে সেসময়কার শ্রেষ্ঠ আলেমরা যেমন উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের ও ইবনে শিহাব আয-যুহরি এর মত উলামারা ছিলেন।

উমার ইবন আব্দুল আযিয এরপর ইবনে শিহাব আব্দুল মালিকের দরবারে আসা যাওয়া করতেন। ইবনে শিহাবের পর তার ছেলেও আব্দুল মালিকের দরবারে আসা যাওয়া করেছেন। এ ছাড়াও আরও অন্যান্য যে সকল আলেম উলামাগণের শাসকদের দরবারে আসা যাওয়া ছিল তারা হলেন আশ-শা'বী কাবীসাহ, ইবনে যু'আইব, ইবনে হায়াত আল কিন্দি, আবুল মিকদাম (যিনি অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন), আল হাসান, আবুয যিনাদ, মালিক ইবন আনাস, আল আওযাই, আশ-শাফিই এবং আরও অনেকেই। যদি আলেম উলামাগণ শাসকদের দরবারে প্রয়োজন অনুযায়ী যান ও তাদেরকে বিভিন্ন কাজে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সৎ উপদেশ দেন, তাহলে অবশ্যই তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার উপর আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টির কারণ। **কিন্তু শাসকদের দরবারগুলো ফেতনা ও পরীক্ষার যায়গা তাই নিজেদের ঈমানের নিরাপত্তার স্বার্থে এগুলো এড়িয়ে চলাই উত্তম।**
অবশ্যই তাঁরা সত্য বলছেন, হক কাজটি করেছেন ও হিকমাতের সাথে সঠিক উপদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ এর রাসুলের নিচের কথাটি শোনার পর তারা যা করেছেন, বলেছেন এ ছাড়া আর কী-ইবা বলতে বা করতে পারেন। আল্লাহ এর রাসুল (সাঃ) বলেছেন **"শাসকদের কাছে যারা আসে তাদেরকেই পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়।"** হাদিসটি আবু দাউদ (নং ২৮৫৯), তিরমিজি (নং ২২৫৬), নাসায়ী (৭/১৯৫-১৯৬), আহমাদ (১/৩৫৭) এবং অন্যান্য আরও অনেকেই আবু মুসা আশ'আরী রাঃ থেকে বর্ণনা করেন।

৮) এটি হল রিয়া। সাধারনভাবে যেটাকে লোক দেখানোর বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইবাদাত করাকে বুঝায়। আমি রিয়ার কারণ, এটি কিভাবে হয়, এর

প্রকারভেদ, এবং এটি থেকে মুক্তির উপায় আমার "আর-রিয়া" নামক বইতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

৯) ইবন আব্দুল-বার তার "জামিউ বায়ানিল-ইলম " বইতে (১/১৪৩-১৪৪) লিখছেন-

নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসা বিষের মত যা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়, এবং এর প্রেমিককে যুদ্ধের প্রতি আকর্ষিত করে, এটি সম্পর্কের বন্ধন ও জিহ্বার বাধ ভেঙ্গে দেয়, ফলে চরিত্র ও দ্বীন দু'টিই ধ্বংস হয়ে যায়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়া যে নেতৃত্ব পেয়ে যায় সত্যানুরাগীদের শত্রু ছাড়া সে আর কিছু নয়, মানুষকে ধাবিত করে তারচেয়েও নিকৃষ্ট দিকে এর দ্বারা নবীজির শত্রুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

লেখক এখানে যা বলতে ও বুঝাতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন তালিবুল ইলম এ ব্যাপারে বিস্তর পড়াশোনা করে তাহলে অবশ্যই সে লাভবান হবে।

১০) আবু নুয়াইম তার 'আল-হিলইয়াহ' তে (৬/৩৭৬-৩৭৭) , ইবন রজব তার 'শারহুল হাদিস মা'যীবান' (পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪) তে এবং আয-যাহাবি তার 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' বইতে সুফিয়ান সাওরির জীবনী অধ্যায়ে এই উক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। এটি আলেম উলামাদের অনেক পছন্দের ও বহুল আলোচিত একটি উক্তি।

হাফিজ আল মিযযী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'তাহযীবুল কামাল' বইতে (পৃষ্ঠা ১৪/১৪৩) আব্বাদ ইবন আব্বাদ এর জীবনীতে লিখেছেন- "তিনি ছিলেন শাম ও এখানকার ঈমানদারদের মধ্যে উত্তমদের মধ্যে অন্যতম। এবং সুফিয়ান সাওরি তাকে তার সেই বিখ্যাত অসিয়তনামাটি লিখেছিলেন যেখানে জ্ঞান, শিষ্টাচার, উদ্বৃতি ও উপদেশের সমন্বয় ছিল"।

সূত্রঃ

http://darulilm.org/tag/%e০%a৬%a৬%e০...৬%bf%e০%a৬%ae/

****

পুনশ্চ: আজকে সকালে দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামে "উম্মাহ্ নিউজ ll ০২রা যিলহজ্ব, ১৪৪০ হিজরী ll ০৩রা আগস্ট, ২০১৯ ঈসায়ী" তে দেখতে পেলাম যে, **সরকারী খরচে হজ্বে যাওয়া আলেমরা রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে অংশ নিতে আজ যাবে বঙ্গভবনে!**

এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরের আর্টকেলটা দারুল ইলম থেকে এখানে পোষ্ট করলাম। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা- তিনি যেন এই উম্মাহকে দরবারী আলেমদের ফিৎনা থেকে হিফাযত করেন এবং আমাদের সকলকে উম্মাহর আসল হিতাকাঙ্খী মুজাহিদ উলামায়ে কেরাম সাথে থাকার তাওফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন

আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনকে ভুলে যাবেন না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৭১

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-২২-২০১৯

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

জিহাদ দমানোর জন্য যেসকল ষড়যন্ত্র হয়েছে, তার মধ্যে বড় একটি ষড়যন্ত্র: ইলমকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানো। যার ফলে আমাদের সমাজের উলামা-তুলাবাদের মাঝে ব্যাপকভাবে এই ভ্রান্ত ধারণা গেড়ে বসেছে যে, ইলম আর জিহাদ একত্র হতে পারে না। যারা ইলম নিয়ে থাকবে, তারা জিহাদ করবে না। জিহাদ করে ইলম শিখা যায় না। পাশাপাশি এ ধারণাও আছে যে, ইলম হল সর্বশ্রেষ্ঠ। যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত তারা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজে লিপ্ত। ইলম ছেড়ে জিহাদে যাওয়ার অর্থ আফজাল ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছেড়ে নিম্নমানের কাজে লিপ্ত হওয়া।

এই ভ্রান্ত আকীদার পক্ষে কুরআন সুন্নাহর কোনো দলীল তো অবশ্যই তারা দিতে সক্ষম নয়, তবে যে কাজটি তারা করেছে, তা হলো- জেনে না জেনে- আইম্মায়ে কেরামের সীরাতকে বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করেছে। আপনি যদি জিহাদবিরোধী কোনো আলেমের সাথে কথা বলেন, তাহলে তিনি অকপটেই বলে দেবেন যে, আপনি কি বেশি বুঝেন? আবু হানিফা, শাফিয়ি, মালেক, আহমাদ, বুখারি, মুসলিম- এরা কি আপনার চেয়ে কম বুঝে? এরা তো কেউ ইলম ছেড়ে জিহাদে যায়নি?

মোটকথা তাদের বিশ্বাস, আমাদের পূর্বসূরি সালাফে সালেহীন আইম্মায়ে কেরাম জিহাদ করেননি। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে জিহাদ বিরোধী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকের দ্বিধা হয় না। গত রমযানে ঢালকানগরের পীর আব্দুল মতীন সাহেবের একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য হয়তো অনেকে শুনেছেনও।

সালাফে সালেহীনকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানোর পেছনে বড় কয়েকটি কারণ হল:

ক. অজ্ঞতা। আপনি দেখবেন যে, যারা সালাফে সালেহীনকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করায়, তারা আসলে সালাফের জীবন চরিত সম্পর্কে অজ্ঞ। যেমন, ঢালাকানগরের পীর সাহেবের বক্তব্যে হয়তো আপনারা লক্ষ করেছেন যে, অজ্ঞতার কারণে তিনি আইম্মায়ে আরবাআ সকলকেই জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাদেরকে জিহাদ নাজায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল বানিয়েছেন। যদি তারা মন্তব্য করার আগে একটু কষ্ট করে সালাফের জীবনী পড়ে দেখতো, তাহলে হয়তো এমন আজগুবি কথা মুখে আসতো না।

খ. একপেশে ভাবনা। সালাফকে জিহাদ বিরোধী ধারণা করার এটাও একটা বড় কারণ। আমাদের বর্তমান উলামা-তুলাবারা ইলমকেই সবচেয়ে বড় করে দেখে। সালাফের কারো জীবনী যদি তারা পড়েও, তাহলেও সালাফের ইলমী দিকটিই শুধু তাদের নজরে পড়ে। তাদের সিয়াসী ও জিহাদি জীবন, আমর বিল মা'রূফ-নাহি আনিল মুনকার, হকের পথে জীবন দেয়া: এগুলো তাদের নজরে তেমন পড়ে না। এগুলো ভাসা ভাসা নজরে দেখে চলে যায়। তারা শুধু দেখে যে, তিনি হাদিসের কি কি খিদমাত করেছেন, ফিকহে তার কি অবদান ইত্যাদি। এই একপেশে ভাবনা প্রবল হওয়ার কারণে অন্য দিকগুলো তাদের নজর কাড়ে না।

গ. উলামাদের জীবনীতে ইলমী দিকের প্রাবল্য। উলামায়ে কেরামের জীবনের মৌলিক দিকটি হচ্ছে ইলম। কেউ যখন তাদের জীবনী অধ্যয়ন করতে যাবে, তাদের ইলমী দিকটিই স্বাভাবিক বেশি নজরে আসবে। অন্যান্য দিকগুলো তাদের মৌলিক ব্যস্ততা না হওয়ায় সেগুলোর আলোচনা আসে প্রসঙ্গত। এ কারণে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে যারা সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করে তাদের কাছে ইলমী দিকটিই প্রবল হয়ে আসে। অন্যান্য দিকগুলো প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ঘ. পাঠকদের জিহাদ বিমুখীতা। জিহাদ বিরোধীরা যদি সালাফের জীবনী পড়েও, তাহলেও নিজেদের অন্তরে সুপ্ত জিহাদ বিমুখীতার কারণে সালাফের জিহাদি জীবনটা তাদের দৃষ্টি কাড়ে না। নজরে পড়ে গেলে বা কেউ দেখিয়ে দিলে নিজেদের জিহাদ বিমুখীতার কারণে সালাফকেও তারা নিজেদের মতো জিহাদবিমুখী ধারণা

করে এবং সালাফের জিহাদি দিকগুলোকে তাবিল, তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করে নিজেদের অনুকূল বানিয়ে নেয়।

এ সমস্ত কারণসহ আরো বিভিন্ন কারণে সালাফে সালিহীনের জিহাদি দিকগুলো প্রচ্ছন্ন থেকে যায় এবং অপব্যাখ্যার শিকার হয়। জিহাদবিরোধীরা গর্বভরে বলে বেড়ায়, আমাদের সালাফ জিহাদ করেননি, তাহলে আমাদের না করাতে কি দোষ? শুধু তাই নয়, বরং সালাফকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করিয়ে জিহাদ নাজায়েয-হারাম ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়।

ঢালকানগরের পীর সাহেবের অজ্ঞতাপ্রসূত বিভ্রান্তিমূলক বয়ানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার তাওফিকে কিছু দিন আগে আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদি জীবনের মতো আরো কতক আইম্মার জিহাদি জীবনটাও যদি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়, তাহলে একটা বড় খিদমাত হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটা বিভ্রান্তির কিছুটা হলেও অপনোদন হয়। বিশেষত আমাদের নিজেদের ভাইদের উপকার হবে এবং দাওয়াতের কাজে সহায়ক হবে। এ ধারণা থেকেই এ ব্যাপারে কলম ধরা। আল্লাহ চাহেন তো আমাদের আইম্মায়ে কেরাম যে ইলমের পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও বিচরণ করেছেন তার কিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা তো তাদের থেকেই জিহাদ শিখেছি। তাদেরকে জিহাদবিরোধী দাঁড় করানো অজ্ঞতা, অপবাদ ও স্বার্থপরতা ছাড়া কিছুই নয়। সকল ভাইয়ের কাছে দোয়ার দরখাস্ত। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৯৬

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা - ২)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-২৫-২০১৯

ইলম নিয়ে ব্যস্ততার অজুহাত

জিহাদবিমুখ উলামা-তুলাবাদের একটি মুখরোচক অজুহাত হল, **'আমরা ইলম নিয়ে ব্যস্ত আছি। জিহাদ করতে গেলে ইলম ছুটে যাবে। সমাজের মানুষের ইলম ও মাসায়েলের সমাধান তাহলে দেবে কে- যদি আমরা জিহাদে চলে যাই'?**

বাহ্যত যুক্তিটি অনেক সুন্দর। যে কেউ কথাটি শুনবে আপাত দৃষ্টিতে সমর্থন না করে পারবে না। তবে আমি এখানে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই: **ইলম কি শুধু অজু-গোসল, হায়েয-নেফাস, নামায-রোযা, নিকাহ-তালাকের মাঝেই সীমাবদ্ধ? না'কি গোটা শরীয়তের সকল দিক, সকল বিধি-বিধানই ইলম? ঈমান-কুফর, তাকফিরুত তাওয়াগিত, সিয়াসত-খিলাফত-ইমারাত, জিহাদ-কিতাল-সিয়ার এগুলো কি ইলমের গণ্ডিতে পড়ে?**

যদি বলেন, পড়ে; তাহলে আপনারা কি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত? স্বাভাবিক প্রায় সকলেরই উত্তর আসবে, না। একান্ত যারা কিছুটা অধ্যয়ন করেনও তারাও বলতে গেলে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে। নিকাহ-তালাকের মাসআলা যেভাবে বুঝতে পারছেন এবং ফতোয়া দিতে পারছেন, এসব মাসআলায় তার দশ ভাগের এক ভাগ বরং বলতে গেলে একশ ভাগের এক ভাগেরও দক্ষতা নেই। তাহলে এখন যদি পর্যালোচনা করা হয় দেখা যাবে আপনারা ইলমের খুব কম অংশ নিয়েই লিপ্ত আছেন, আর বাকি সকল ইলমই আপনাদের ব্যস্ততার বাহিরে। তাহলে বলা যায় ইলমের অজুহাতের দাবিতেও আপনারা সত্যবাদি নন।

যদি সত্য সত্যই আপনারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে তো আপনারাই আমাদের রাহবার হতেন। আপনারা যা বলতেন আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতাম। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উম্মাহর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ইলমটুকুর ধারে কাছেও আপনারা নেই বরং বিনা ইলমে উল্টো উল্টো

ফতোয়া দিয়ে দিয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আপনাদের কথা মেনে চলতে পারি? বরং আপনাদের অজুহাত কবূল করার মতো কোন সুযোগও তো দেখছি না। বরং সত্য কথা বলতে গেলে: আপনারা ইলমের কেবল ততটুকু নিয়েই ব্যস্ত যতটুকুতে আপনাদের রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত হবে, যতটুকুতে রাষ্ট্রের বিরোধীতার কিছু নেই এবং যতটুকুতে তাগুত শাসক শ্রেণী আপনাদের প্রতি নারাজ হবে না। তাহলে বলা যায়, 'ইলম নিয়ে ব্যস্ত আছি'- উজরটা একেবারেরই অবাস্তব।

আমরা তো ইলমের দাবিই জানাচ্ছি

ইলমী ব্যস্ততার অজুহাত অবাস্তব হওয়ার একটা বড় দলীল হচ্ছে, আপনাদের জিহাদ বিমুখতা। কারণ, মুজাহিদরা যখন আপনাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তখন তো আপনাদেরকে এ কথা বলছেন না যে, আপনারা এখনই অস্ত্র হাতে রাস্তায় বেরিয়ে শহীদ হয়ে যান। আপনাদের কাছে দাবি হচ্ছে, আপনারা প্রথমে সত্য জানুন। সত্য জেনে উম্মাহর সামনে সত্য তুলে ধরুন। উম্মাহকে দ্বীন ও জিহাদ বুঝান। তাহলে বলা যায়, যে ইলম নিয়ে আপনারা ব্যস্ত বলে দাবি করছেন, মুজাহিদগণ আপনাদের কাছে সে ইলমই দাবি করছেন এবং আপনাদের সামনে ইলমের বিশাল এক ময়দান খুলে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনারা যদি সারা না দেন, তাহলে কিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, আপনারা ইলম নিয়ে আছেন? বরং তখন তো সন্দেহ জাগে যে, আপনারা ইলমের নামে ইলম ও জিহাদ উভয়টা থেকেই বিমুখ হয়ে আছেন।

বি.দ্র.

আমার এ কথা শুধু ঐসব উলামা-তুলাবার ব্যাপারে যারা আসলেই নিজেদের দাবিতে মিথ্যাবাদি। সকলের ব্যাপারে নয়।

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় ইলমী ব্যস্ততায় জিহাদ ছাড়ার সুযোগ নেই

সর্বোপরি জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে ইলম নিয়ে পড়ে থেকে জিহাদ ছাড়ার কোন অবকাশ নেই। ইলমী ব্যস্ততা যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ একটি আমল, কিন্তু যখন উম্মাহর উপর কাফের-মুরতাদরা সওয়ার হয়ে পড়ে, তখন আলেম-গাইরে আলেম সকলেরই প্রথম দায়িত্ব শত্রু প্রতিহত করা। এমন সময় ইলম নিয়ে পড়ে থাকা হারাম। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলম-জিহাদ উভয়টাই ফরযে কিফায়া।

মুজাহিদগণ যদি জিহাদের ফরয আঞ্জাম দিতে থাকেন, তাহলে জিহাদের প্রয়োজনে যে সংখ্যক আলেম জিহাদে অংশগ্রহণ জরুরী, তারা বাদে বাকি আলেমদের উপর জিহাদে যাওয়া জরুরী নয়। তাদের জন্য তখন ইলম-জিহাদ উভয়টিই বরাবর। ইচ্ছা করলে জিহাদও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ইলমেও লিপ্ত থাকতে পারেন। অবশ্য এ সময় কোনটা উত্তম তা নিয়ে মতভেদ আছে।

জিহাদবিরোধীরা যেসকল আইম্মাদের দোহাই দিয়ে জিহাদ হারাম-নাজায়েয ফতোয়া দেয়, সেসকল আইম্মার যামানায় জিহাদের মূলত এ অবস্থাটিই ছিল। তাদের জন্য ইলম-জিহাদ উভয়টিই বরাবর ছিল। তখন কেউ কেউ ইলমের পাশাপাশি জিহাদ ও রিবাতের দায়িত্বও পালন করেছেন, আর কেউ কেউ ইলম নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। তবে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় হাদিস ও মাসায়েল বর্ণনা ও সংকলন করে দিয়েছেন। এভাবে ময়দানে না গিয়েও তারা জিহাদের খিদমাত করেছেন। আর উলামায়ে কেরামের অনেকের জন্য তখন জিহাদের ময়দানে যাওয়া জায়েযেও ছিল না। কারণ: শীয়া, খাওয়ারিজ, মু'তাজিলি, বাতিনি ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলো তো তখনই মাথাচাড়া দিয়ে গজিয়েছিল। এদেরকে দমন করা উলামাদের উপর ফরযে আইন ছিল। সকলেই যদি জিহাদে চলে যেতো তাহলে এদের দমন কে করতো? এমতাবস্থায় জিহাদে যাওয়ার অর্থ ছিল ফরযে কিফায়া আদায় করতে গিয়ে ফরযে আইন তরক করা যা হারাম। তাই, উলামায়ে কেরামের বিশাল একটা অংশ সার্বক্ষণিক ইলমে লিপ্ত থাকা আবশ্যক ছিল। তাদের জন্য জিহাদে যাওয়া নাজায়েয ছিল।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত। এখন জিহাদ ফরযে আইন। আর জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন অন্য সব বাদ দিয়ে আগে শত্রু প্রতিহত করা ফরয। কারণ, এখন যদি শত্রু প্রতিহত করা না যায়, তাহলে দ্বীন-দুনিয়া সবই বরবাদ হয়ে যাবে। শত্রু প্রতিহত হয়ে গেলে তখন দ্বীনের সকল শাখার সকল খিদমাত করা যাবে। এজন্য উম্মাহর আইম্মায়ে কেরামের ইজমা: জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে তখন আলেমদেরকেও জিহাদে চলে যেতে হবে।

তবে বর্তমান বিশ্বের সকল এলাকার অবস্থা এক রকম নয়। যেখানে সরাসরি যুদ্ধ চলছে, সেখানে আলেমদেরকেও জিহাদে বের হতে হবে। আর আমাদের দেশের মতো যেসব এলাকায় দাওয়াত ও ই'দাদি কাজ চলছে, সেখানে ময়দানে যাওয়া

আবশ্যক নয়। দাওয়াত ও ই'দাদের জন্য আলেমদের যে ধরণের ভূমিকা প্রয়োজন, সে ধরণের ভূমিকা রাখাই তাদের কাজ। বিশেষত ইলমী কাজটাই তাদের মূল কাজ। হ্যাঁ, কখনও যদি সরাসরি ময়দানে নেমে পড়ার দরকার পড়ে- এদেশে হোক বা অন্য দেশে- তাহলে তখনকার কথা ভিন্ন।

মোটকথা, সালাফে সালিহীন আইম্মায়ে কেরামের যামানায় আলেমদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন ছিল না। জিহাদ তরক করাতে কোন সমস্যা ছিল না। বরং অনেকের জন্য ইলমে লিপ্ত থাকাই ফরযে আইন ছিল, জিহাদে যাওয়া নাজায়েয ছিল। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ভিন্ন। এখন ইলমের নাম করে জিহাদের ইলমী-আমলী সকল ধরণের সহায়তা থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই।

যাহোক, ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ মুজাহিদ ও মুরাবিত উলামাদের আলোচনা শুরু করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০২৬

সরকারের অনুগত দুনিয়ালোভী আলেম

শাইখ আব্দুল্লাহ

Munshi Abdur Rahman

Moderator

০৮-২২-২০১৯

► সরকারের অনুগত দুনিয়ালোভী আলেম

জেনে রাখুন, শান শওকত আর মান মর্যাদার কামনা বাসনা অনিবার্যভাবে একটি ব্যাপক ক্ষতির কারণ। এই মান মর্যাদা আর শান শওকত অর্জনের জন্যে আপনাকে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তখন থেকেই এই ক্ষতির সূত্রপাত হয়। আর মান মর্যাদা, শান শওকত অর্জনের পরেও এই ক্ষতি হতেই থাকে, কারণ এবার আপনার পরিশ্রম ব্যয় হবে তা ধরে রাখার সুতীব্র বাসনার পিছনে, যা জন্ম দিবে অবিচার, ঔদ্ধত্য, বেপরোয়া মনোভাব আর বাদবাকী অন্যায় কাজ।

আবু বকর আল-আজুরি, যিনি ছিলেন চতুর্থ শতকের শুরুর দিকের একজন অন্যতম বিচক্ষণ আলেম, তিনি আলেমদের আচার-আচরণ এবং সংবেদনশীলতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, আর তাঁর রচিত এ প্রবন্ধটি এ বিষয়ের উপর লেখা বাছাইকৃত সেরা কিছু কাজের মধ্যে একটি।

যদি কেউ এটি পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি জানতে পারবেন সত্যনিষ্ঠ (সালাফ) আলেমগণের অনুসৃত পথ সম্পর্কে, আরও জানতে পারবেন অভিশপ্ত নব আবিষ্কৃত বিষয়াদি, বিদ'আত পথভ্রষ্টতা, যা তাদের পথের বিপরীত সে সম্পর্কে। তাই তিনি সবিস্তারে দুনিয়ালোভী আলেমদের কথা বর্ণনা করেছেন, তার রচনার নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করা হলঃ

"দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মোহ, প্রশংসা, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের মাঝে সুমর্যাদা ইত্যাদি কারণে তিনি (দুনিয়ালোভী আলেম) ধোঁকার শিকার হয়েছেন। একজন সুন্দরী নারী যেভাবে অলংকার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে এই দুনিয়ার জন্যে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে ঠিক সেভাবে একজন দুনিয়ালোভী আলেম গহনা হিসেবে ব্যবহার করে তার ইলম-জ্ঞানকে, কিন্তু সে আলেম তার অর্জিত

জ্ঞানের উপর আমল করে না। (ইলমের উপর) আমলের সৌন্দর্য দিয়ে সে নিজেকে সজ্জিত করে না।”

এরপর তিনি একটি দীর্ঘ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

“কাজেই এই স্বভাব আর অনুরূপ আচরণসমূহ, তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সে তার অর্জিত ইলম থেকে উপকৃত হয় না, সে তার মর্যাদা, উপাধি ইত্যাদি বহন করে। আর তার নফস বহন করে সম্মান, খ্যাতি, মর্যাদার প্রতি মোহ- (আর এ সম্মান ও খ্যাতির প্রতি মোহের কারণে) সে পছন্দ করে রাজাদের সাথে ও রাজপুত্রদের সাথে উঠাবসা করতে। এরপর সে তাদের মত বিলাসী জীবন যাপনের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাদের মত জৌলুসপূর্ণ সাজপোশাক পরে, আরামদায়ক বাহনের ব্যবস্থা করে, চাকর বাকর, মিহি কাপড়, বিলাসবহুল শয়নকক্ষ ও খাদ্য ইত্যাদির দিকে মোহগ্রস্ত হয়। সে আরও পছন্দ করে লোকেরা যেন তার দরজায় ভিড় করে থাকে, যাতে তার প্রতিটি কথা শোনা হয়, যাতে তার কথা মান্য করা হয়- আর এগুলোর শেষেরটি (মান্য করা) পূরণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, যদি সে কাজীর (বিচারক) পদটি লাভ করতে পারে- তাই সে এ পর্যায়ে এসে এদিকে ধাবিত হয়।

কিন্তু এরপরও সে এগুলো (বিলাস,দুনিয়া) অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের দীনকে বিক্রি করে, তাই সে নিজের স্থানচ্যুত করে শাসকদের কাছে, আর তার দোসরদের কাছে, তাদের সেবায় নিয়োজিত করে নিজেকে আর তাদের কাছে স্মারক হিসেবে উপঢৌকন পাঠাতে শুরু করে। যখন সে শাসকদের দরবারে, প্রাসাদে প্রবেশ করে, সেখানকার মন্দ কাজ দেখতে পায়, তখন সে চুপ করে থাকে ।

এর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যাপার হল সে শাসকদের কাছে নিজের অবস্থানকে আরও উঁচুতে নেয়ার জন্যে তাদের মন্দ কাজগুলোর প্রশংসা শুরু করে, এমনকি কিছু কিছু মন্দ কাজকে ভালো কাজ বলেও অপব্যাখ্যা দান করে। তাই, যখন সে নিজেকে একটি দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরণের আচরণে অভ্যস্ত করে নেয়, তখন বাতিল তার ভিতরে শিকড় গেঁড়ে বসে- তখন এগুলো দেখে সেই শাসকেরা তাকে বিচারক (কাজী) পদে নিয়োগ দেয়। আর এভাবেই তারা সেই আলেমকে জবাই করে, যে জবাই করতে কোন ছুরি লাগে না”।

[প্রসংগত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাদীস, **"যাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হয়েছে"**, আহমাদ, আবু দাউদ ৩৫৩৩, ৩৫৩৪ইফা; তিরমিযি]

এবারে (বিচারকের আসন দান করে) শাসকেরা তাকে এমন একটি অনুগ্রহ করেছে, যার কারণে সেই আলেমকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হয়। কাজেই এবার তাকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়, যেন সে নিশ্চিত হতে পারে, যেন শাসকদের রাগিয়ে দেয়ার মত কিছু না ঘটে যায়, যাতে শাসকেরা তাকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে না দেয়।

একদিকে যখন সে শাসকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্যে একের পর এক কষ্ট স্বীকার করে চলে, অপরদিকে সে ভুলে যায় আরেকজন ক্ষমতাশালী, সর্বশক্তিমান, বিশ্ব জাহানের শাসক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা, তাঁর সন্তুষ্টি, তিনি যেন রাগান্বিত না হন, সেদিক সে বেমালুম ভুলে যায়। কাজেই সে এতিমদের সম্পদের সুষম বণ্টন করে না, বিধবা, ফকির মিসকিন, ওয়াকফ সম্পত্তি যারা জিহাদে নিয়োজিত রয়েছে, মক্কা ও মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকেরা, আর সর্বোপরি যে সম্পদ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় হবার কথা- বরং সে সম্পদ ব্যয় করে তার কর্মচারীদের পিছনে, সভাসদ, চাকরদের পিছনে। কাজেই সে যা খায় তাও হারাম এবং যা খাওয়ায় তাও হারাম, আর যা বৃদ্ধি করতে থাকে, তা হল নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী। কাজেই তার জন্যে দুর্ভোগ, তার জন্যে অভিশাপ, যার ইলম থাকা সত্ত্বেও সে এ ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পতিত হয়।

নিশ্চয়ই এটাই সে ইলম, যা থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদের প্রতিও আদেশ করেছেন, যেন আমরাও এ ধরণের ইলম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এ ধরণের ইলমের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"কেয়ামতের দিন সব থেকে ভয়াবহ আযাব যাকে দেয়া হবে সে হচ্ছে এমন আলেম, যার ইলম দ্বারা তাকে আল্লাহ উপকৃত করেননি।" [বর্ণনায় ইবন আব্দুল বার, জামি' বাইয়্যানিল 'ইলম(১/১৬২), তাবারানী, দারেমী]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শই এই দু'আ করতেন,

“হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি অসার জ্ঞান হতে, অশ্রুত দো’আ হতে,এবং এমন প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না,এমন অন্তর হতে যা বিগলিত হয় না” (আবু দাউদ, সহীহ)

তিনি আরও দু’আ করতেন,

اللهم إنى أسألك علما نافعا إنى وأعوذ بك من علم لا ينفع

অর্থঃ “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এমন জ্ঞান যা কাজে লাগে, আর আমি আপনার নিকট এমন জ্ঞান হতে আশ্রয় চাই যা কোন কাজে আসে না” [ইবন মাজাহ ৩৪৮৩]

ইমাম আবু বকর আল-আজুরি রাহিমাহুল্লাহর উক্তি এখানেই শেষ হলো, যিনি তার ইহকালের জীবন কাটিয়েছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে (মৃত্যু ৩৬০হিজরী) আর সেই সময় থেকেই ফিতনা, ফাসাদ দুর্নীতি বাড়তে লাগল-এরপর তা বহুগুণে বেড়েই চলেছে – লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আস’আলুকা ইলমান নাফি’আন, ওয়া আউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা’উ” ।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন,"যে কোন যুগে তুমি যদি সঠিক ইসলামপন্থী দলটি খুজে না পাও তাহলে চিহ্নিত ইসলাম বিদ্বেষী এবং ইসলামের শত্রুদের দিকে তাকাও, তারা কোন দলটির প্রতি সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত । কারন সঠিক ইসলামি দল চিনতে মুসলমানেরা ভুল করলেও ইসলামের চিহ্নিত শত্রুরা কখনো ভুল করেনা।"

মূলঃ The Evil scholar

লেখকঃ হাফিয ইবন রজব আল হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৯৮

উলামায়ে সূ'দের থেকে সাবধান!!!

abu ahmad

Senior Member

০৮-২৩-২০১৯

সকল প্রশংসা ঐ সত্ত্বার, যিনি মুজাহিদিনে কেরামের রাহবার হয়ে আলমে জিহাদের জিম্মাদারি গ্রহণ করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক; ঐ নবীর উপর, যিনি তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠত করেছেন সাইফের মাধ্যমে ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর, যারা এভাবেই তাঁর দ্বীনকে আগে বাড়িয়েছেন। অতঃপর শান্তি বর্ষিত হোক, ঐ সমস্ত উলামায়ে হকের উপর, যারা নিজেদের খুতবা ও আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দ্বীন উম্মাহর সামনে পেশ করছেন। আরো প্রশংসা করছি- উম্মাহর সেসব নওজোয়ানদের, যারা খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ পুন: প্রতিষ্ঠার লক্ষে কালো পতাকার তলে সমবেত হয়েছেন। আল্লাহর পথে জীবন বিলাবার জন্য তারা মারেকার পর মারেকা চষে বেড়াচ্ছেন। জিহাদী তৎপরতার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের ঘুম হারাম করে দিয়েছেন।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ উম্মাহর প্রতিটি কদম বিজয়ের দিকে বাড়ছে। আকাশে বাতাসে শুধু বিজয়ের সংবাদ ভেসে বেড়াচ্ছে। বিশ্বের সকল পরাশক্তি তাদের হাতে নাকানী চুবানীর শিকার হচ্ছে। এতসব বিজয়ের ধারাবাহিকতায় উম্মাহর প্রতিটি সদস্য খুশি হবেন, মুজাহিদদের স্তুতি গাইবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ধিক উলামায়ে সূ'দের; তারা এখনো আল্লাহর বাহিনীর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তারা এখনো ভরসা করে বসে আছে তাগুতি শক্তির উপর। তাই তারা নিজেদের পার্থিব জীবন হারিয়ে ফেলার ভয়ে এখনো আশ্রয় নিচ্ছে তাগুতের পতাকা তলে। আর তারা তাগুতের হয়ে বিরোধিতা করে যাচ্ছে উম্মাহর সিংহতুল্য সন্তানদের। আজ পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদগণকে দুইটি অপশক্তির মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

এক. ক্রুসেডার ও তাদের মিত্রশক্তি মুরতাদ শাসকগোষ্ঠি।

দুই. তাগুতের প্লাটফর্মে আশ্রয় গ্রহণকারী উলামায়ে সূ'।

তাই উম্মাহর সিংহরা যেভাবে জিহাদ বিস সাইফের মাধ্যমে প্রথম শক্তির মোকাবেলা করে যাচ্ছেন, তেমনি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের মাধ্যমে ২য় শক্তির মোকাবেলা করছেন। (শুরুতে ও শেষে কেবল আল্লাহরই প্রশংসা)

উলামায়ে সূ' কুরআন ও হাদিসে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। কুরআনুল কারীমে তাদের ব্যাপারে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর আলোচনা করা হয়েছে। হাদিসে পাকে তাদেরকে '**شرار الخلق**' তথা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সর্বদা তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে। **এসব আয়াত ও হাদিস থেকে যে বিষয়টি বুঝে আসে, তা হল: সব সময় এ উম্মতের মাঝে উলামায়ে সূ'দের একটি জামাত থাকবে। তারা এ উম্মাহকে গোমরাহ করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে যাবে। এর বিপরীতে উম্মাহর হক্বপন্থি ওলামাদের দায়িত্ব হবে, এ জাতীয় ওলামাদের মুখোশ জাতির সামনে পেশ করা। আর জাতির দায়িত্ব হবে, এসব আলেমদেরকে চিনে, তাদের নোংরা থাবা থেকে নিজেদের ঈমান আমাল হিফাজত করা।** সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের আয়োজন।

প্রথমেই আমাদের চিনে নিতে হবে উলামায়ে সূ'দের সংজ্ঞা কি?

"উলামায়ে সূ'" আরবী শব্দ, বাংলায় এর অর্থ হল, মন্দ আলেম। তবে ওলামাদের মাঝে মন্দ কিছু দেখলেই, তাদেরকে উলামায়ে সূ' বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। কারণ ওলামাগণ তো মানুষই হয়ে থাকেন। তাই তাদের থেকে কিছু অপরাধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই শুধু শাব্দিক অর্থ দিয়ে কাউকে উলামায়ে সূ' আখ্যা দেয়া যাবে না। বরং যেহেতু এটা ইসলামের একটি পরিভাষা, তাই ইসলামের ভাষ্য গ্রন্থ থেকেই এর অর্থ নিতে হবে। প্রথমে আমরা দেখি কুরআনুল কারীম এ ব্যাপারে কি বলে। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿الأعراف :١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الأعراف: ١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿الأعراف: ١٧٧﴾ مَن

يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿الأعراف: ١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿الأعراف: ١٧٩﴾

অনুবাদ: আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সূতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সেই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (সূরা আ'রাফ: ১৭৫-১৭৯)

আসুন এবার দেখি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- **"তিন শ্রেণীর মানুষকে সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এর মাঝে প্রথম শ্রেণীটা হচ্ছে-একদল জ্ঞাণী আলেম, যারা দুনিয়াবী স্বার্থে ইলম গোপন করতো এবং জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতো না।"**(সংক্ষেপিত)-জামে আত-তিরমিজি ও ইবনে হিব্বান।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে আমাদের সামনে আসলেন। আমরা সংখ্যায় ছিলাম নয়জন; পাঁচজন আরব এবং চারজন অনারব অথবা এর বিপরীত। তিনি বললেন, তোমরা শুন, তোমরা কি শুনছ? আমার পর অচিরেই অনেক জালিম শাসক আসবে। যারা সেই সকল শাসকদের সাথে আঁতাত করবে, তাদের অন্যায় গুলোকে সমর্থন দিবে এবং তাদের জুলুমে সহযোগিতা করবে, সে আমার উম্মত নয় এবং আমিও তার দায়িত্ব নিবো না এবং (কিয়ামতের দিন) তাকে আমার হাউজে কাউসারের সামনে আসতে দেয়া হবে না। আর যারা সেই সকল জালিম শাসকদের সাথে আঁতাত করবে না, তাদের জুলুমে সহায়তা করবে না বরং তাদের অন্যায়সমূহের বিরোধিতা করবে তারা আমার উম্মত এবং আমি তাদের দায়িত্ব নিবো এবং তাদেরকে (কিয়ামতের দিন) হাউজে কাউসারের পানি পান করানো হবে।" (জামে আত-তিরমিজি ও নাসায়ী, হাদীস নং ৪২০৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে কিছু সংখ্যক লোক দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং কুরআন মাজীদ পড়বে। তারা বলবে, 'আমরা রাষ্ট্রনায়ক ও ক্ষমতাসীনদের কাছে যাই তাদের পার্থিব স্বার্থে কিছুটা ভাগ বসানোর জন্য এবং আমরা নিজেদের দ্বীনকে অক্ষুন্ন রেখেই তাদের নিকট হতে সরে পড়ব।' কিন্তু তা সম্ভব নয়। যেমন কাঁটাযুক্ত গাছ থেকে কাঁটা ব্যতীত কোন ফল লাভ করা যায় না, তেমনি এদের নিকট থেকেও কোন ফল লাভ করা যায় না, কিন্তু.....।" [ইবনে মাজাহ]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলেম হল তারা, যারা সমসাময়িক শাসক গোষ্ঠীর দরবারে যাতায়াত করে।" [ইবনে মাজাহ]

রাবী মুহারিবী (রঃ) বলেন, 'এখানে শাসক গোষ্ঠী বলতে সমসাময়িক স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পেলাম। তা হল উলামায়ে সূ' দের বড় বৈশিষ্ট হবে, তারা সত্যকে গোপন করবে। তারা দুনিয়ার পিছনে দৌঁড়াবে। সর্বদা ক্ষমতাসীনদের মনোতুষ্টিতে মগ্ন থাকবে এবং শরীয়তের যে সব বিষয় কষ্টকর ও তাদের স্বার্থবিরোধী, তারা সব

সময় তার বিরোধিতা ও তার ব্যাপারে সংশয় ছড়াবে। কোরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগণকে সঠিক ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যে সব হক্কানী আলেমদের কার্যকলাপ তাদের পার্থিব স্বার্থে আঘাত হানবে, তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিবে। তাদেরকে উশৃঙ্খল বলবে।

উলামায়ে সূ'দের ইতিহাস

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿الأعراف: ١٦٩﴾

অনুবাদ: তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে কিতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুতঃ এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারো তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। তাদের কাছথেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আলয় ভীতদের জন্য উত্তম- তোমরা কি তা বোঝ না ?"(সূরা আ'রাফ:১৬৯)

বনূ ইসরাইলের বালআম বাউরা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন যুগই খালি ছিলনা এ ভয়াবহ গোষ্ঠিটি থেকে। বালআম বাউরা, মুসিলের শাসক মুজাফফার উদ্দীনের দরবারি আলেম, স্পেনের দাউদ, আকবরের দরবারি আলেমরা, সৌদি আরবের দরবারি আলেমরা এবং ভারত পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের দরবারি আলেমরা।

আমরা এখানে শুধু আমাদের ধারে কাছের কিছু আলেমের চিত্র তুলে ধরলাম। নতুবা খোঁজা হলে আরো বহু নামের সন্ধান পাওয়া যাবে।

উলামায়ে সূ'দের প্রতি কোরআন সুন্নাহর ধমকি

এই সব দুনিয়ালোভী, জেনেশুনে ইলম গোপনকারী "দরবারী আলেমদেরকে" সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿البقرة :١٥٩﴾

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের ও। (সূরা বাকারাহ:১৫৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿البقرة: ١٧٤﴾

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা বাকারাহ:১৭৪)

তাছাড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, তারপর একদল আলেমদের জন্ম হবে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবে, কিন্তু সে জ্ঞানকে দুনিয়াবানী স্বার্থে ব্যবহার করবে, জেনে শুনে ইলম গোপন করবে, জালেম-কুফফার শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। তাই তিনি আমাদেরকে এইসব দুনিয়ালোভী আলেমদের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"তিন শ্রেণীর মানুষকে সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এর মাঝে প্রথম শ্রেণীটা হচ্ছে-একদল জ্ঞাণী আলেম যারা দুনিয়াবী স্বার্থে ইলম গোপন করতো এবং জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতো না। (সংক্ষেপিত)-জামে আত তিরমিজি ও ইবনে হিব্বান।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি অচিরেই লোকদের উপর এমন একটি সময় আসার আশংকা

করছি, যখন কেবলমাত্র নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকবে না এবং কুরআনের লিখিত রূপটি ছাড়া তার বাস্তবায়ন থাকবে না। মসজিদগুলো চাকচিক্যে ভরপুর হলেও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। ঐ সময়কার আলেমরা হবে আসমানের নিচে বিচরণকারী সর্ব নিকৃষ্ট জীব। তাদের থেকেই বিভিন্ন ফিৎনা ছড়াবে এবং তারা নিজেরাও সেই ফিৎনায় আবর্তিত হবে।"(বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান। হাদিস সহীহ।)

হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বলেছেন, "আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মাহ-এর জন্য দাজ্জালের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি।' তখন আমি ভীত হয়ে পড়লাম, তাই আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটি কোন জিনিস, যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মাহ-এর জন্য দাজ্জালের চাইতেও অধিক ভয় করেন?' তিনি [রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন, 'পথভ্রষ্ট 'আলিমগণ।'"মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং. ২০৩৩৫)

দরবারী এবং দুনিয়ালোভী আলেমদের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া কথা বলেছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেন-

"যদি কোন শাইখ কুরআন এবং সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে, যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করেনা, তখন সে একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে যে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।"-আল ফতোয়া, ইবন তাইমিয়া, খন্ড-৩৫, পৃষ্টা-৩৭৩

"দরবারী/ দুনিয়াবী আলেমদের" মুখোশ উন্মোচন করা কি জরুরী?? কিভাবে "দরবারী আলেমদের" চিহ্নিত করবেন???

যদি দরবারী/দুনিয়াবী আলেমদের চিহ্নিতই করতে না-ই পারেন, তাহলে তো আপনি দুনিয়ায় বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতেই থাকবেন। এইজন্য তাঁদের চিহ্নিত করাটা জরুরী। কারা দুনিয়াবী আলেম আর কারা প্রকৃত আলেম তা চিহ্নিত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহই অবশ্যই কিছু criteria বলে দেয়া আছে। তার মধ্যে

অন্যতম criteria হচ্ছে-যারা জালিম শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলে না, তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ হবে। এভাবে কুরআন-সুন্নাহর সাহায্যে আপনি খুব সহজেই দুনিয়াবী আলেমদের চিহ্নিত করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে আমরা যেন কুরআন-সুন্নাহর বাইরে গিয়ে কোন সত্যিকারের আলেমের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেই। কারন সত্যিকারের আলেমরাই নবীগনের উত্তরসূরী, আমাদের নেতা, আমাদের পথ প্রদর্শক। কুরআন-সুন্নাহর সাহায্যে একটু এদিক-সেদিক তাকালেই আমরা দেখতে পাবো, কারা দুনিয়াবী আলেম আর কারা সত্যিকারের আলেম ইনশা আল্লাহ।

সবশেষে স্মরণ করিয়ে দেই, এই দরবারী আলেমদের ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য হবে তাদের বিভ্রান্তিগুলোর জবাব দেওয়া। তাদের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে উম্মাহাকে সতর্ক করা॥ সঠিক দলের অনুসারী হয়ে যান

এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন, **"যে কোন যুগে তুমি যদি সঠিক ইসলামপন্থী দলটি খুজে না পাও, তাহলে চিহ্নিত ইসলাম বিদ্বেষী এবং ইসলামের শত্রুদের দিকে তাকাও, তারা কোন দলটির প্রতি সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত। কারন সঠিক ইসলামি দল চিনতে মুসলমানেরা ভুল করলেও ইসলামের চিহ্নিত শত্রুরা কখনো ভুল করেনা।"**

আশা করি আপনাদের বুঝতে বাকি থাকার কথা না যে, বর্তমানে চিহ্নিত ইসলাম বিদ্বেষী এবং ইসলামের শত্রুরা কোন দলটির উপর সবচেয়ে বেশী ক্ষিপ্ত! তার পরেও বলছি শুনুন: তারা হলেন- মুজাহিদীনের জামা'আত বা দল। অতএব, আপনার করণীয় কি? তা আপনি নিজেই ঠিক করে নিন।

উদাত্ত আহবান

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আজ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুরতাদ সরকার থাকার কারণে, সাধারণ মুসলিমরা মুরতাদ, নাস্তিক, কুফফারদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে, অপদস্থ হচ্ছে। বিশেষকরে বর্তমানে কাশ্মিরের অবস্থা সচেতন কোন ব্যক্তির অজানা থাকার কথা নয়। আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নানা অশালীন বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে এবং কুটুক্তি করা হচ্ছে, যেগুলো এমনকি কাফেররাও বলতে সাহস পায়নি। এতদ্বসত্ত্বেও

আমাদের উলামায়ে সূ'রা চুপ মেরে বসে আছে। কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারছে না। নিবেও না।

তাই, আজ সময় এসেছে জেগে উঠার। নাস্তিক মুরতাদদের হাত থেকে ইসলাম তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান বাঁচাতে আপনাদের এগিয়ে আসার। নির্যাতিত মুসলমান ভাই-বোনদেরকে হেফাযত করার। সর্বোপরি কুফফারদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়ার। কারণ, গাযওয়ায়ে হিন্দের পটভূমি তৈরী হয়ে গেছে। তাই আর বসে থাকার কোন সুযোগ নেই।

মনে রাখবেন, নিন্দুকের নিন্দার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনেক বড়। আর আপনার হেফাযতের চিন্তা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে। কোন মুরতাদ শাসক করবে না। অথবা কোন উলামায়ে সূ'রা করবে না।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদেরকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার একজন যোগ্য সিপাহসালার হওয়ার তাওফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমীন

ডাউনলোড লিংক:

পিডিএফ

https://my.pcloud.com/publink/show?c...hAxGujSB৫ObvyX

ওয়ার্ড

https://my.pcloud.com/publink/show?c...sjpUYa৭JPhYDJX

****

সংগৃহীত, সংযোজিত, পরিমার্জিত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০০৯

সাপের লেজে নয়, মাথায় আঘাত করুন

saif abdullah

Moderator

০৯-০৩-২০১৯

একজন ডাক্তারের যোগ্যতা এখানেই যে, সে রোগীর অসুখের মূল জায়গা চিহ্নিত করতে পারে। আর এটাই তার মূল বৈশিষ্ট্য। এজন্য দেখা যায়, সে কলমের এক খোঁচাতেই রোগীদের থেকে বড় অংকের অর্থ নিয়ে থাকে। মানুষও টাকা দিতে তেমন কার্পণ্য করে না। কারণ, তারা জানে, তার কাছ থেকে মূল রোগ চিহ্নিত করে ওষুধ সেবন করলে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করা যাবে। একজন আলিম হলেন রুহানি ডাক্তার। তাকে বুঝতে হবে, উম্মাহর এ রোগের মূল উৎস কী। মূল উৎস চিহ্নিত না করে শুধু উপসর্গ দূর করার চেষ্টা করা হলে উপসর্গের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। একটা সারবে তো ওদিকে নতুন করে আরও দুটি উপসর্গ তৈরি হবে। এভাবে কিয়ামত চলে আসবে, কিন্তু তাদের অসুখ কখনও ভালো হবে না।

এখন উম্মাহর কোনো সচেতন রুহানি ডাক্তার যদি মূল রোগ চিহ্নিত করে উপদেশ দেয় যে, এসব উপসর্গ দূর করার পেছনে সময় নষ্ট না করে মূল জায়গাটি ঠিক করুন, তখন তারা রৈ রৈ করে হাঁক দিয়ে বসে, "মিয়া যাও, ভাগো। নিজে তো সমাজ ও রাষ্ট্রে ভালো কোনো কাজ করবেই না, আমরা যাও-বা ছোটোখাটো কাজ করার চেষ্টা করছি, তাতেও এদের বাধা। আমরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও মিছিল-মিটিং করে কত কিছু পরিবর্তন করেছি, তোমরা কী করেছ শুনি দেখি?" এভাবে উপহাস ও অবজ্ঞার সাথে তার কথাকে ফেলে দেওয়া হয়। সামান্য ভাবারও ফুরসত হয় না যে, ভাইটি আসলে কী বলতে চাচ্ছে, ভালো করে একবার শুনেই দেখি না!

আজ পুরো বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে কত হাজার কোটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তা গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু সেগুলোর কয়টা প্রতিহত করা হচ্ছে? গুনেগুনে কি আদৌ সবগুলোকে প্রতিহত করা সম্ভব? আপনি যতই দাওয়াত দেন না কেন, প্রজন্ম এখন ব্যস্ত সিনেমা, ফুটবল, ক্রিকেট, গেমিং, ইন্টারনেট ইত্যাদি নিয়ে। যতক্ষণ না

এর গোড়া ধ্বংস করতে পারবেন, ততদিন আপনার নরম কথার দাওয়াত আমভাবে ফলপ্রসূ হবে না। এটা দুনিয়ার একটা স্বভাবজাত নিয়ম যে, মানুষ সবসময় বিজয়ী জাতির অনুগামী হয়। বর্তমান পৃথিবীতে যারা আজ বিজয়ী, আজ তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। আপনি হাজারো ধর্মের দোহাই দিয়েও এদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারবেন না। তিক্ত হলেও এ প্রাকৃতিক নিয়ম আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। তাই পরাজিত জাতি প্রতিরোধের চিন্তা না করে কখনো নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে পারে না। করলেও সেটা কখনো প্রকৃত আদর্শের প্রচার হবে না, বরং তা হবে বিকৃত বা আংশিক আদর্শ।

কুফরি শক্তির পরিচালিত ষড়যন্ত্রের বিপরীতে যারা তাদেরই প্রণীত নিয়মে গণতান্ত্রিক ধারায় মিছিল-মিটিং করে এসব প্রতিহত করার চিন্তা করছে, তারা বুঝতেও পারছেন না যে, এভাবে প্রতিহত করাও ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। কারণটি খুব সংক্ষেপে বলি। আপনি যখন আঘাত খেতে থাকবেন, যখন আপনার ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে, তখন আপনার অন্তরে প্রতিশোধের একটি আগুনের স্ফূলিঙ্গ তৈরি হয়। এভাবে বারবার হতে হতে একটি পর্যায়ে তা বিস্ফোরিত হয়ে জালিমদের সকল পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় এবং সফল কোনো নেতৃত্ব থাকলে সেটা পরিণত হয় মহাবিপ্লবে। কিন্তু আপনি যদি এ প্রতিশোধের আগুন অন্তরে লালন না করে সামান্য মিছিল-মিটিং করেই দমিয়ে দেন, তখন বাসায় এসে এ আত্মতৃপ্তি কাজ করে যে, আজ একটা কাজের কাজ করে এসেছি। হুমকি-ধমকি দিয়ে ময়দান কাঁপিয়ে এসেছি। এভাবে প্রতিটি মিছিল-মিটিং ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আপনার এক একটি স্ফূলিঙ্গকে নিভিয়ে দিচ্ছে; অথচ আপনি আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন। এসব দেখে তাগুতিশক্তি নিজেদের বৈঠকে হাসে আর বলে, "দেখো, মুসলিমরা কত বোকা! আমরা ওদের সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছি, আর ওরা সামান্য প্রতিবাদ করেই খুশি হয়ে যাচ্ছে!!"

এজন্য আজ বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ করা উচিত হবে না যে, আমাদের এ বিপদ ও নির্যাতনের মূল উৎস খুঁজে বের করতে হবে। দংশনকারী সাপের লেজে আঘাত করে কিছুই হবে না, খুঁজতে হবে সাপের মাথা। লেজ দিয়ে যতই আঘাত করুক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না, সবার মনোযোগ থাকতে হবে মাথার দিকে। সুযোগ পেলেই মাথায় আঘাত করতে হবে। আপনি কি

জানেন, সাপটি কে? সে সাপ হলো জাতিসংঘ, যার সদস্য হলো, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। এদেরকে না দমিয়ে আপনি যত কিছুই করেন না কেন, তা হবে বিশাল সাগরের বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার মধ্যে কাগজে নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার নামান্তর। পুরো পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সব পরিচালিত হচ্ছে এ পাঁচটি দেশ থেকে। এদের বিরুদ্ধে যদি আজ থেকেই কাজ শুরু করেন, তাহলে কাল না হোক, পরশু না হোক, দশ বছর পর হলেও তারা পরাজিত হতে বাধ্য হবে। আর তাগুতের এসর মাথা ধ্বংস হলে আমাদের ছোটো-বড়ো এমন হাজারও সমস্যা মুহূর্তেই ঠিক হয়ে যাবে।

তাই শেষে আবারও বলছি, বুঝার চেষ্টা করুন। প্লিজ, সাপের মাথায় আঘাত করুন, সাপের মাথায়, লেজে নয়। আমরা যেন এ সবক কখনো ভুলে না যাই। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০৯৪

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ১

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১০-২০১৯

(২য় পর্ব কমেন্ট বক্সে দেখুন)

ইদানিং কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের বক্তব্য আশাকরি সকলেই শুনে থাকবেন। তার বক্তব্যের সারকথা:

[জিহাদ একটি মুনাজ্জাম ও শৃংখলাবদ্ধ কাজ। এলোপাথারি মারামারি করে মরে যাওয়াই জিহাদ নয়। আর শৃংখলাবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হলে জিহাদের স্থান লাগবে, নিয়মিত সেনাবাহিনি লাগবে, কুদরত তথা শত্রুর সাথে পেরে উঠার সামর্থ্য লাগবে। সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা এমন শৃংখলাবদ্ধ জিহাদ সম্ভব নয়, এর জন্য রাষ্ট্র লাগবে। রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দ্বারা জিহাদ করতে হবে। জিহাদ করবে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনি। সাধারণ মানুষ জিহাদে যাবে না। তবে যদি সেনাবাহিনি সাধারণ মানুষদের যেতে বলে তাহলে যাবে। কারণ, সেনাবাহিনি তখন তাদেরকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেবে। অন্যথায় সাধারণ মানুষ যাওয়া আত্মহত্যার শামিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়া তাদের জন্য জিহাদে যাওয়া হারাম হবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার জিহাদে যাওয়ার ডাক না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশের মুসলমানদের জন্য কাশ্মীর বা এ জাতীয় কোন ভূখণ্ডে যাওয়া হারাম।]

উপরোক্ত কথাটি (যদিও তাতে বেশ কিছু ভুল আছে তথাপি) এক পর্যায়ে মেনে নেয়ার মতো। কারণ, জিহাদ আসলে একটা জামাতবদ্ধ কাজ। এর জন্য একটা উপযুক্ত ময়দান এবং সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা না থাকলে তেমন ফলপ্রসূ হয় না। এটা অস্বীকার করার মতো নয়। এ জন্যই মুজাহিদিনে কেরাম যার তার কথায় কোন ভূমিতে রওয়ানা দিতে নিষেধ করেন। বরং মুজাহিদদের নিয়ম হল, প্রত্যেকে আপন ভূমিতে থেকে জিহাদ করবে। কখনও প্রয়োজন পড়লে বাহিরে যাবে। ঢালাওভাবে সকলে হিজরত করে অন্য ভূমিতে চলে যাওয়া আন্তর্জাতিক উমারাদের নিয়ম বহির্ভূত। যাহোক, কথাটা এক পর্যায়ে মেনে নেয়ার তবে। তবে

তার পুরো বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তার এ আশঙ্কা শুধু একটা আশঙ্কা নয়, বরং অনেকগুলো ভ্রান্ত আকিদার নাতিজা-ফলাফল। **যেমন, আমাদের দেশের মুসলমান যুবকদের জন্য কাশ্মিরে যাওয়া হারাম হওয়ার কারণ বলেছেন,**

- রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে অনুমতি দেয়নি।

- কাশ্মীরে জিহাদের জন্য কোথাও থেকে কোনো ডাক আসেনি। এমনকি তিনি দাবি করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে কোথাও জিহাদের ডাক নেই।

- কাশ্মীরিরা জিহাদে দাঁড়ায়নি। আর যখন তারা না দাঁড়াবে তখন আমাদের উপর তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব নেই। তারা যখন দাঁড়াবে এবং দাঁড়ানোর পর মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে যাবে, তখন অন্যরা যেতে পারবে, নতুবা হারাম হবে।

- কাশ্মীরিরা দাঁড়ালেও তারা না পারলে প্রথম ফরয হতো পাকিস্তানীদের উপর। আমরা যারা দূরে আছি, তাদের জন্য যাওয়া হারাম হবে। এটা আত্মহত্যার শামিল।

- কাশ্মীরে জিহাদ দাঁড়ালে, তারা না পারলে, এমনকি আশপাশের মুসলমানরাও না পারলে তখন আমরা যেতে পারবো। তবে আমাদের মধ্যে কেবল সে সকল লোকই যাবে যারা সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত। সাধারণ মানুষ কখনও জিহাদে যাবে না। অবশ্য তিনি সামনে গিয়ে এর বিপরীত কথা বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনি যদি সাধারণ মানুষকে যেতে বলে তাহলে তারা যাবে। সেনাবাহিনি তাদেরকে ট্রেনিং দেবে।

- যারা কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য বলছে, তারা নিজেরা জিহাদে যায় না। অন্যদেরকে যেতে বলে নিজেরা বসে থাকে। এরা নিজেদের সুনাম বাড়ানোর জন্য জিহাদের কথা বলছে। এরা ধান্দাবাজ- ফেতনাবাজ। এদের কথা শুনা জায়েয হবে না।

- কাশ্মীরে কারা জিহাদ করছে তা জানা নেই। আর হাদিসে এসেছে,

ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية

"যে ব্যক্তি এমন ঝাণ্ডা তলে যুদ্ধ করে যা হক না বাতিল জানা নেই, যে তার আপন গোত্রের স্বার্থে ক্রোধান্বিত হয় কিংবা গোত্রের দিকে আহবান করে বা

অন্যায়ভাবে গোত্রের সহায়তা করে আর এভাবেই মারা যায়, তাহলে সে জাহিলী মরা মরল।”- মুসলিম: ৪৮৯২

এছাড়াও আরও অনেক কিছু বলেছেন। সংক্ষেপে একটু গুছিয়ে বলতে গেলে এভাবে বলা যায়-

[কোন মুসলিম ভূখণ্ডে কাফেররা আগ্রাসন চালালে প্রথমত যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে মোবাবেলা করা তাদের উপর ফরযে আইন- যদি মোকাবেলার সামর্থ্য তাদের থাকে। মোকাবেলার সামর্থ্য না থাকলে ফরয নয়। তখন হয়তো হিজরত করবে, নয়তো সবর করবে (তথা মার খেতে থাকবে)। আর সামর্থ্যের মাপকাটি হল, কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের ডবলের চেয়ে বেশি না হওয়া।

আক্রান্ত মুসলমানরা যদি জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের হয়ে জিহাদ করা বাহিরের মুসলামনদের দায়িত্ব নয়। বাহিরের মুসলমানদের উপর তখনই জিহাদ ফরয হবে, যখন আক্রান্তরা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা আমীরের অধীনে মোকাবেলায় দাঁড়াবে। যখন তারা আমীরের অধীনে দাঁড়াবে এবং মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়বে তখনই কেবল বাহিরের মুসলমানদের উপর ফরয হবে, অন্যথায় নয়।

যদি তারা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা আমীরের অধীনে মোকাবেলায় দাঁড়ায় কিন্তু মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রের সকলের উপর জিহাদ ফরয হবে না, কেবল সেনাবাহিনির উপর ফরয হবে। সাধারণ জনগণের উপর ফরয হবে না। তবে সেনাবাহিনি যদি সাধারণ জনগণকে যেতে বলে তাহলে যাবে এবং সেনাবাহিনি তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবে।

পার্শ্ববর্তীরা যদি জিহাদে যায় এবং তারাও মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে দূরবর্তীদের উপর জিহাদ ফরয। পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানরা যদি জিহাদে না যায়, তাহলে দূরবর্তী দেশগুলোর মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয নয়। (শায়খ যদিও কথাটি এত পরিষ্কার করে বলেননি, তবে বয়ান থেকে কথাটি স্পষ্ট।)

তবে সেনাবাহিনি হোক, সাধারণ মুসলমান হোক, পার্শ্ববর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক: তাদের জন্য তখনই জিহাদে যাওয়া জায়েয হবে, যখন রাষ্ট্র প্রধান অনুমতি দেবে। রাষ্ট্র প্রধান অনুমতি না দিলে জিহাদে যাওয়া হারাম।]

এককথায়, সব বিভ্রান্তির গোঁড়া হল, ইমাম। শায়খের মতে জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ইমাম, ইমামের আহ্বান ও অনুমতি লাগবে। যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরও একজন ইমাম লাগবে; আর বাহিরের মুসলমান যারা জিহাদে যেতে চাচ্ছে তাদেরও তাদের ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি লাগবে। অবশ্য তিনি এতটুকু ব্যবধান করেছেন যে, যারা বাহিরের তাদের জন্য তো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধান লাগবে; কিন্তু যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য এমন রাষ্ট্র প্রধান লাগবে না। অন্তত জিহাদে অভিজ্ঞ এমন কোন ব্যক্তির অধীনে জিহাদে দাঁড়াতে হবে। যদি তারা জিহাদে দাঁড়ায় তাহলেই কেবল বাহিরের মুসলমানদের জন্য এখানে এসে জিহাদ করা জায়েয হবে, অন্যথায় যদি তারা শুধু মারই খেতে থাকে, অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির অধীনে জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে বাহিরের মুসলমানদের জন্য তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা জায়েয নয়, হারাম। কারণ, যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের কোন ইমাম নেই।

দ্বিতীয়ত যদি তারা কোন আমীরের নেতৃত্বে দাঁড়ায়ও এবং অক্ষম হয়ে মারও খেতে থাকে, তথাপি বাহিরের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম, যতক্ষণ না তাদের রাষ্ট্র প্রধান তাদেরকে অনুমতি দেয়। এর দলীল তিনি দিয়েছেন নিচের হাদিসটি দিয়ে-

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

"ইমাম হচ্ছেন ঢালস্বরূপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হবে এবং তার দ্বারা আত্মরক্ষা করা হবে।"- বুখারি ২৭৯৭, মুসলিম ১৮৪১

অতএব, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদেরও একজন ইমাম লাগবে, আর বাহিরের মুসলমান যারা যাবে, তাদেরও ইমামের অনুমতি লাগবে। এ হাদিসের আলোচনা আমরা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, শায়খ বলেছেন, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর জিহাদ তখনই ফরয হবে, যখন শত্রু প্রতিহত করার কুদরত তাদের থাকবে। এর মাপকাটি তিনি বুঝাচ্ছেন, শত্রু সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের বেশি না হওয়া। দ্বিগুণের বেশি হলে কুদরত নেই ধরা হবে। তখন আর ফরয থাকবে না। ধরলাম ফরয নয়, তাহলে অন্তত প্রতিরোধ করা জায়েয হবে কি'না? এ ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কিছু না

বললেও যতটুকু বুঝা যায়, তার মতে এমতাবস্থায় প্রতিরোধ করা হারাম হবে। কেননা, এটা 'ইলক্বাউন নাফস ইলাততাহলুকা' তথা আত্মহত্যার শামিল। শায়খের আরেকটা কথা থেকে এমনটা বুঝা যায়। তাহ হল, শায়খ যখন বলেছিল, রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি না হলে জিহাদে যাওয়া হারাম, তখন একজন সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে এর আপত্তি করেছিল-

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

"তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।"- নিসা ৭৫

আপত্তি করেছিল যে, এ আয়াতে তো রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি লাগবে বলা হয়নি। তখন তিনি আজগুবি একটা জওয়াব দিয়েছেন। সাথে এও বলেছেন, দুর্বলদেরকে তো একথা বলা হয়নি যে, তোমরা জিহাদ শুরু কর। তাদেরকে সবর করতে বলা হয়েছে।

শায়খের এ কথা এবং আগের কথা মিলালে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বুঝাচ্ছেন, দুর্বলদের জন্য জিহাদ করা হারাম। এটা আত্মহত্যার নামান্তর। এছাড়াও আরো বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তিনি বিষয়টি বুঝানোর পায়তারা করেছেন। যদি এমনটাই হয়, তাহলে শায়খের এ দাবি নির্জলা মিথ্যা। কারণ, আয়াতে তো এ কথা বলা হয়নি যে, 'তোমরা মার খেয়ে যাও, তবুও জিহাদ শুরু করবে না। তোমরা দুর্বল। জিহাদ শুরু করা তোমাদের জন্য হারাম হবে'। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায়, দুর্বলদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন করা হয়নি। তাই না করার অনুমতি আছে। কিন্তু করলে হারাম হবে একথা তো বলা হয়নি। বরং করাটাই প্রশংসনীয়। মার খেয়ে খেয়ে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে, ইজ্জত-আব্রু হারিয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরে যাওয়া প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আলোচনা করবো।

অধিকন্তু দুর্বলদের জন্য জিহাদ না করে থাকার অনুমতি আছে কথাটা ঢালাওভাবে সহীহ নয়। কাফেররা আপনাকে, আপনার সামনে আপনার ছেলে-মেয়ে, মা-বাপা ও ভাই-বোনকে নির্যাতন ও হত্যা করছে আর আপনি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন? কিছুই করবেন না? এটার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সামর্থ্যে যতটুকু আছে আপনাকে করতে হবে। বসে বসে মার খেয়ে খেয়ে, নিজের ইজ্জত-আব্রু হারিয়ে মরার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সামনে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা করবো।

আর শায়খ শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলেই যে জিহাদ ফরয নয় বলেছেন, সেটা মূলত তার অজ্ঞতার ফল। আহযাবের যুদ্ধে যখন কুরাইশরা আরবের বড় বড় কয়েকটি কাফের গোত্র এবং মদীনার ইয়াহুদিদের সমন্বয়ে বহুজাতিক বাহিনি গঠন করে মদীনা অবরোধ করেছিলে, তখন কি কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি ছিল না? তখন কি জিহাদ ফরযে আইন ছিল না? না'কি হারাম ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে যে প্রতিরোধ করেছেন তা কি হারাম করেছেন? শায়খ আপনি কি বলছেন? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? আমার মনে হয় শায়খ কি যে বলেন তা চিন্তা করেন না। মুখে যা আসে বলে দেন। এজন্য শায়খের আগে পিছে কথার মধ্যে অনেক গড়মিল দেখা যায়। ২০ মিনিটের দু'টো বয়ানে মধ্যেও শায়খের অনেক গড়মিল আছে। বরং বলতে গেলে শায়খের প্রতিটি কথাতেই একেকটি মহা বিভ্রান্তি লুকায়িত। সব আলোচনা করতে গেলে বিশাল কিতাব লিখতে হবে। আলোচনা সংক্ষেপ করতে চাচ্ছি।

তাহলে এখন মুসলমানদের করণীয় কি? বাইরের মুসলামানদের করণীয় বলেছেন, দোয়া করা এবং যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদেরকে বলা। এর বাইরে কোন কাজ নেই। এমনকি কাশ্মীরিদের দাবিতে মিছিলও করতে তিনি নিষেধ করেছেন। দোয়ার বিষয়টা মেনে নিলাম। মুসলমানের বিপদে অন্য মুসলমান দোয়া করবে এটাই তো ভ্রাতৃত্বের দাবি। এতে আপত্তি নেই। আপত্তি হলো, দোয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি'না- সেটা নিয়ে।

তিনি দোয়া ছাড়া আর করণীয় বলেছেন, **'যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদেরকে বলা'।** এর দ্বারা তিনি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তাগুত শাসকগোষ্ঠী, অন্যান্য কাফের

রাষ্ট্রের শাসকদের বুঝিয়েছেন। জাতিসংঘকেও হয়তো বুঝিয়ে থাকবেন। কিন্তু তাদের কাছে যদি বলা না যায় (বিশেষত যখন তিনি মিছিল করতেও নিষেধ করেছেন তখন বলার আর কি সূরত বাকি রইল? আর শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি নিয়ে পৌঁছা যে মোটামুটি অসম্ভব আশাকরি বর্তমানে কারো কাছে অস্পষ্ট নয়; আর পৌঁছতে পারলেও তাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা); কিংবা বলার পর যদি তারা কোন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে কি করণীয় তা তিনি বলেননি। তবে তিনি এতটুকু বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার যদি ভারতের পক্ষ হয়ে কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে ভারতের পক্ষে যোগ দেয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে না। সাথে এ কথাও বলেছেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতকে সমর্থন করে যাচ্ছে। **তবে আরো কিছু প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন, যেগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন,**

- সরকার যখন কুফরের পক্ষ নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন সরকারের কি বিধান? সে মুসলমান থাকবে কি'না বা তার আনুগত্য জরুরী কি'না বা সে আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে বহাল থাকবে কি'না (যেমনটা তারা বর্তমানে সরকারকে আমীরুল মু'মিনীন মনে করে থাকে এবং তার আনুগত্য ফরয বলে থাকে)?

- সরকার যদি নিজেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এবং জিহাদেরও অনুমতি না দেয় তখন মুসলমানদের কি করণীয়?

- সরকার যদি ভারতের পক্ষে যোগ দেয়, তাহলে এদেশের মুসলমানদের কি করণীয়?

এসব প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন।

ফতোয়ার নাতিজা-ফলাফল

শায়খের ফতোয়া অনুযায়ী ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে একটু লক্ষ করি: শায়খ বলেছেন, কাশ্মীরে যে পরিমাণ হিন্দু সৈন্য আছে এবং তাদের যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে, তার সামনে কাশ্মীর মুসলমানদের দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই। এমনকি এও বলেছেন, বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ কাশ্মীরে চলে গেলেও কিছু করতে পারবে না। এতই যখন দুর্বল, তখন কাশ্মীরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো আত্মহত্যার

শামিল। শায়েখের ফতোয়া অনুযায়ী (যদি আমি শায়খের কথা সঠিক বুঝে থাকি) কাশ্মীরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো হারাম। কিংবা অন্তত ফরয নয়। আর শায়খ বলেছেন, কাশ্মিরিরা জিহাদে দাঁড়ায়নি। মোটকথা দাঁড়ানো হারামই হোক কিন্তু এমনটাই হয়ে থাকুক যে, তারা দাঁড়ায়নি- সর্বাবস্থায় বহির্বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কাশ্মিরে যাওয়া হারাম। কারণ, এক দিকে তারা নিজেরা যখন দাঁড়ায়নি (যদিও শায়খের এ বক্তব্য সঠিক নয়, বরং কাশ্মিরিরা টুকটাক হলেও জিহাদ করে যাচ্ছে) তখন শায়খের দরবারি ফতোয়া অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করা বাকি মুসলমানদের দায়িত্ব নয়। অধিকন্তু পাকিস্তান যেহেতু এগিয়ে যায়নি, তাই আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রধানের যেহেতু অনুমতি হয়নি, তাই বাহিরের মুসলমানদের জন্য কাশ্মিরে সহায়তা করতে যাওয়া হারাম। অতএব, এখন যদি গোটা কাশ্মীরকে মৃত্যুপুরীও বানানো হয়; কাশ্মীরের নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেও যদি ধরে ধরে যবাই করা হয় বা বোম্বিং করে উড়িয়ে দেয়া হয়; যদি মা-বোনদের আহাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিতও হয়, যদি তাদের প্রতি দরদে হৃদয় ফেঁটে টুকরো টুকরোও হয়ে যায়, তথাপি আমাদের জন্য এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য জিহাদে যাওয়া হরাম! হারাম! হারাম! কাঁদতে পারবেন, দোয়া করতে পারবেন, জিহাদ করতে পারবেন না। এমনকি মিছিলও করতে পারবেন না। করলেই হারাম হবে। জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর সামনে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে- কেন তুমি রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ছাড়া জিহাদে গেলে? তাগুতদের কথা মতো কেন ঘরে বসে থাকলে না? কেন কাশ্মীরিদের নীরবে হত্যা করতে দিলে না? কেন মালউনদেরকে বাধা দিলে? আরো হাজারো জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে!!

এই হল ফতোয়ার সারকথা। বাহ! অনেক সুন্দর ফতোয়া। এ ধরণের সরকারি ফতোয়া দেয়ার জন্যই বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরি কুকুরদেরকে রুটি আর উচ্ছিষ্ট দিয়ে তাগুতগোষ্ঠী পোষে যাচ্ছে। না হলে তাদের কি-ই বা দরকার পড়েছে যে, এদেরকে তারা পোষে যাবে- যদিও তা উচ্ছিষ্ট দিয়েই হোক না কেন!!

(চলমান ইনশাআল্লাহ)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৪৬

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস-০২

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১১-২০১৯

উপরে আমরা দরবারি ফতোয়াটি দেখেছি। এবার একটু পর্যালোচনায় যাব। শায়খের সংশয়গুলোর উপর একটু আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সুবিধাবাদিরা কাফের-মুরতাদদের পক্ষে যতই ওকালতি করুক; যতই তাবিল, তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করুক- আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। আল্লাহ তাআলার চিরসত্য ওয়াদা-

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(33)

"ওরা আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণনা বিধান ব্যতীত বাকি সকল কিছুতেই অসম্মত- যদিও কাফেররা (তা) অপছন্দ করে। তিনিই তো সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করেন- যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"- তাওবা ৩২-৩৩

♣ সংশয়: ইমামের অনুমতি

এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা আগেও হয়েছে। তবে শায়খের বক্তব্য যেহেতু নতুন করে ফিতনার সৃষ্টি করেছে তাই কিছু আলোচনা সমীচিন করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সরকারি মোল্লারা মূলত কথার একাংশ বলে আরেকাংশ বাদ দিয়ে ফিতনার সৃষ্টি করে। পূর্ণ কথাটি বললে তখন সকলেই সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারতো। **ইমামের**

আনুগত্য আমরা অস্বীকার করি না, ফরয মনে করি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল, তাদের।"- নিসা ৫৯

কিন্তু এ আনুগত্য দু'টি শর্ত সাপেক্ষে:

প্রথম শর্ত: ইমাম মুসলমান হতে হবে। কাফের কখনও মুসলমানদের ইমাম হতে পারে না। যেমনটা এ আয়াতেও বলা হয়েছে **(مِنْكُمْ)** তথা ইমাম মুসলমান হতে হবে। **শায়খ আব্দুল্লাহ আদদুমাইজি বলেন,**

فقوله تعالى (منكم) نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين ، قال د . محمود الخالدي : [ولم ترد كلمة (أولي الأمر) إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين ، فدل على أن ولي الأمر يشترط أن يكون مسلما]. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী **(منكم)**-'তোমাদের মধ্য থেকে' সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, উলূল আমর মুসলমানদের মধ্য থেকে হওয়া শর্ত। ডক্টর মাহমুদ আলখালিদি বলেন, '(উলূল আমর) শব্দটি যত জায়গায় এসেছে, সব খানেই (মুসলমানদের মধ্য থেকে হওয়া) কথাটির সাথে মিলে এসেছে। বুঝা গেল, উলূল আমর মুসলমান হওয়া শর্ত'।"- আলইমামতুল উজমা ১৫৭

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

'আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।'- নিসা: ১৪১

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]. اهـ

"কোন মুসলমানের উপর কোন কাফেরের কোন কর্তৃত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 'আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না'।"- ফাতহুল কাদীর: ৫/২৬৫

দ্বিতীয় শর্ত: আদেশ বা নিষেধ শরীয়তসম্মত হতে হবে। শরীয়ত পরিপন্থী আদেশ-নিষেধে কোন আনুগত্য নেই। যেমনটা হাদিসে এসেছে যে, **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

»على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.«

"পছন্দ-অপছন্দ সকল বিষয়ে মুসলমানের জন্য শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক। তবে যদি গুনাহের আদেশ করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। গুনাহের আদেশ করা হলে কোন শ্রবণ বা আনুগত্য নেই।"- মুসলিম ৪৮৬৯, বুখারি ৬৭২৫

এটাই আমাদের আকীদা। যেমনটা **ইমাম ত্বহাবি রহ. (৩২১হি.) আহলুস সন্নাহর আকীদায় লিখেছেন,**

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. اهـ

"আমরা আমাদের আইম্মা ও আমাদের দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয মনে করি না- যদিও তারা জুলুম করে। তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করি না। আনুগত্যের হাতও গুটিয়ে নিই না। (বরং) তাদের আনুগত্যকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লাহ-এর আনুগত্য মনে করি ও ফরয মনে করি- যতক্ষণ তারা কোনো গুনাহের আদেশ না দেন।"- আলআকিদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ ৪৭

শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে

উপরোক্ত দুই শর্তের কোন একটায় ব্যাত্যয় ঘটলেই হুকুম বিপরীত হবে। যদি প্রথম শর্তে ব্যত্যয় ঘটে তথা ইমাম মুসলমান না থাকে, তাহলে শরীয়তের নির্দেশ: যুদ্ধ

করে হলেও তাকে অপসারণ করে দিতে হবে। যেমনটা হাদিসে এসেছে যে, হযরত উবাদ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

دعانا النبي ﷺ فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة في مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَ أَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) .متفق عليه وهذا لفظ مسلم(.

"আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তার মধ্যে একটি ছিল: আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপি (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তবে হাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে- তাহলে ভিন্ন কথা।"- সহীহ বোখারি: ৬৬৪৭, সহীহ মুসলিম: ৪৮৭৭

এটি মুসলিম উম্মাহর ইজমায়ী তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। **ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) এর বক্তব্য বর্ণনা করেন,**

قال القاضي عياض: أجمع العلماءُ على أن الإمامةَ لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفرُ انعزل. اهـ

"উলামায়ে কেরাম সবাই একমত যে, কোনো কাফেরকে খলিফা নিযুক্ত করলে সে খলিফা হবে না এবং কোনো খলিফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে যাবে।"- শরহে নববি আলা মুসলিম ১২/২২৯

আরো বলেন,

قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته. اهـ

“কাজী ইয়ায রহ. আরও বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া বিনষ্ট করে অথবা বিদআত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে।”- শরহে নববি আলা মুসলিম ১২/২২৯

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

يَنعَزِلُ بالكفر إجماعا فيجبُ على كل مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمن قَوِيَ على ذلك فله الثوابُ، ومن داهن فعليه الإثمُ، ومن عَجَزَ وجبتْ عليه الهجرةُ من تلكَ الأرضِ. اهـ

“কুফরীর কারণে শাসক সর্বসম্মতিক্রমে অপসারিত হয়ে যাবে। তখন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে শিথিলতা করবে, সে গুনাহগার হবে। আর যে অক্ষম, তার জন্য আবশ্যক হলো ঐ ভূমি থেকে হিজরত করা।”– ফাতহুল বারি: ১৩/১৫৩

আর যদি দ্বিতীয় শর্তের ব্যত্যয় ঘটে তথা ইমাম শরীয়ত বহির্ভূত আদেশ দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো করা যাবে না, তবে তার উক্ত আদেশ বা নিষেধ মেনে চলা যাবে না। বরং যা শরীয়তের নির্দেশ তাই পালন করতে হবে।

আমাদের প্রেক্ষাপট

উপরোক্ত সারসংক্ষেপ কথা বুঝার পর এবার আমাদের প্রেক্ষাপটে আসি। আমরা জানি, বর্তমান তাগুত শাসকগোষ্ঠী মুরতাদ। আল্লাহর শরীয়ত প্রত্যাখান করে কুফরি শাসন প্রবর্তন, ইসলাম ও মুসলামানদের বিপক্ষে যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষাবলম্বন, শরীয়তের বিধি বিধান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কারণে এরা মুরতাদ হয়ে আছে। এমতাবস্থায় জিহাদের মাধ্যমে এদেরকে অপসারণ করে মুসলিম ভূমি এদের থেকে উদ্ধার করা ফরয। তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার তো কোন প্রশ্নই নেই।

শায়খের কথা মতো যদি এসব তাগুতকে মুসলমান এবং আমীরুল মু’মিনীন ধরেও নিই, তথাপি জিহাদের অনুমতি না দেয়া বা তাতে বাধা দেয়া সুস্পষ্ট শরীয়ত

বহির্ভূত কাজ। এ ধরণের আদেশ-নিষেধে কোনো আনুগত্য নেই। আল্লাহ তাআলার আদেশ আমীরের আদেশের অগ্রবর্তী। জিহাদ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আমীরের নিষেধের কারণে তা থেকে বিরত থাকা যাবে না। যারা আমীরের নিষেধের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে ফরয তরকের গোনাহ মাথায় নিয়ে অপরাধী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। এ বিষয়টি সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৪৬

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৩

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৩-২০১৯

আমীরের অনুমতি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত

জিহাদ একটি নাজুক ইবাদত। এখানে সামান্য ভুল ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এজন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্দেশনা ছাড়া এখানে কাজ করা শঙ্কামুক্ত নয়। সাধারণত জিহাদের ব্যাপারে ইমামুল মুসলিমীন ও তার উমারাগণ অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। আর তারা হবেন-ই বা না কেন, তাদেরকে তো এ কাজের জন্যই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা তো সর্বক্ষণ এ কাজেই থাকেন। অধিকন্তু যে যার মতো জিহাদ করতে গেলে বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই শরীয়ত আমীর উমারাদের মেনে চলতে বলেছে। ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রেও এ কথা, দিফায়ী জিহাদের ক্ষেত্রেও এ কথা। ইকদামি জিহাদের বিষয়টা তো স্পষ্টই। আর দিফায়ির ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমনই। কারণ, সব সময় এমন হয় না যে, শত্রু এসেই হঠাৎ সকলের অগোচরে হামলা করে বসে। বরং অনেক সময় আগে থেকেই জানা যায় যে, শত্রু আসছে। আবার অনেক সময় শত্রু এসে অবরোধ করে, আক্রমণ করে না। এসব ক্ষেত্রেও শরীয়ত যুদ্ধ শুরুর আগে ইমামের সাথে আলোচনা করে নিতে বলে। কারণ, সাধারণ মানুষ অনেক সময় শত্রুর অবস্থা, শক্তি, যুদ্ধের কলা-কৌশল ভাল জানে না। উমরাগণ এসব বিষয় ভাল জানেন। তাই তাদের অনুমতি ও নির্দেশনা নিয়ে কাজ করা উচিৎ। হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা। তবে কোথাও যদি এমন হয় যে, শত্রু হামলা করে দিয়েছে এবং ইমামের নির্দেশনা নেয়ারও সুযোগ নেই, তখন ইমামের অনুমতি ছাড়াই হামলা প্রতিরোধ করবে। কারণ, ইমামের নির্দেশনা নিতে বলা হয়েছিল তো মূলত শত্রু প্রতিহত করার জন্যই। যখন ইমামের অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে শত্রু প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না বা আরো কষ্টকর হচ্ছে, তখন আর অনুমতির দরকার নেই। এখানে নিজেরা জিহাদ শুরু করে দেয়ার মাঝেই মাসলাতাহ।

দলীল

সুন্নাহ থেকে এর প্রকৃষ্ট দুটি দলীল বিদ্যমান।

এক. গাযওয়ায়ে যু কারাদ: একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপাল উষ্ট্রী মাঠে চড়ছিল। কাফেররা হঠাৎ আক্রমণ করে সেগুলো ছিনিয়ে নেয়। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিরে বের হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীপাল ছিনতাই হয়েছে, অনুমতির অপেক্ষা না করে এদের পেছনে ধাওয়া করেন এবং উটগুলো ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুশি হন।

যেহেতু অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে উটগুলো উদ্ধার করা সম্ভবপর ছিল না, তাই অনুমতি ছাড়াই তিনি কিতালে জড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজে খুশি হন এবং তার প্রশংসা করেন এবং অধিক পরিমাণে গনিমত দেন। বুঝা গেল, এ ধরণের পরিস্থিতিতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। হাদিসটি সহীহাইনে এসেছে। **মুসলিম শরীফে সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যবানিতে হাদিসটি নিম্নরূপ:**

خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله -ﷺ- ترعى بذى قرد - قال - فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال فأسمعت ما بين لابتى المدينة ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم بذى قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلى وكنت راميا ... حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة - قال - وجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- والناس ... قال - ثم رجعنا ويردفنى رسول الله -ﷺ- على ناقته حتى دخلنا المدينة .

“ফজরের আযান হওয়ার আগেই আমি বের হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধাল উষ্ট্রীগুলো যু কারাদে চড়ছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক গোলামের সাথে সাক্ষাৎ হল। সে বলল, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীপাল লুণ্ঠন হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে নিয়েছে? উত্তর দিল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। তিনি বলেন, তখন আমি (মদীনাবাসীকে সতর্ক করা এবং তাদের থেকে সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে) তিনবার 'ইয়া সাবাহা....' বলে চিৎকার দিলামা। তিনি বলেন, সমগ্র মদীনায় আমার আওয়াজ পৌঁছাতে সক্ষম হলাম। এরপর দিলাম সামনের দিকে দৌঁড়। অবশেষে গিয়ে যু কারাদে তাদের নাগাল পেল। তারা তখন পানি উঠাচ্ছিল। আমি আমার তীর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি ভাল তীরন্দাজ ছিলাম। ... এভাবে অবশেষে তাদের থেকে সকল উষ্ট্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম এবং আরো ত্রিশটি চাদরও তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য লোক এসে উপস্থিত হল। ... তিনি বলেন, এরপর আমরা মদীনার দিকে ফিরলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার উষ্ট্রীর পেছনে সওয়ার করালেন। এভাবে মদীনায় পৌঁছলাম।"- সহীহ মুসলিম ৪৭৭৮

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فلما أصبحنا قال رسول الله -ﷺ- « كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ». قال ثم أعطانى رسول الله -ﷺ- سهمين سهم الفارس وسهم الراجل

"(পরদিন) যখন সকাল হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সালামা। তিনি বলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গনিমতে দুই ভাগ দিলেন: এক ভাগ অশ্বারোহীর, আরেক ভাগ পদারোহীর।"- সহীহ মুসলিম ৪৭৭৯

দুই. ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে: ইমাম যখন মুরতাদ হয়ে যাবে, তাকে অপসারণ করা ফরয। যারা কাফের ইমামের পক্ষ নেবে, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। এটিই শরীয়তের নির্দেশ, যেমনটা হযরত উবাদা ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। ইমাম তো মুরতাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম নেই বলে শরীয়ত জিহাদ

বন্ধ রাখতে বলেনি। সম্ভব হলে একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে। সম্ভব না হলে আপাতত একজনকে আমীর বানিয়ে নিয়ে মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। মুরতাদ সরে গেলে নিজেরা একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে। তাতারদের বিরুদ্ধে সাইফুদ্দিন কুতজ এর জিহাদ এভাবেই হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদও এভাবেই হয়েছে।

এবার ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ করুন-

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ المقل منهم، والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. اهـ

"শত্রু এসে পড়লে ধনী-গরীব সকলের জন্য বের হয়ে পড়া ফরয। তবে ইমামের অনুমতি ছাড়া শত্রুর দিকে রওয়ানা দেবে না। তবে যদি এমন কোন শক্তিধর শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যার (সাথে কিতাল করতে দেরি করলে তার) থেকে সকলে অনিষ্টের আশঙ্কা করছে, যার ফলে ইমামের অনুমতি নেয়া সম্ভব হচ্ছে না- তাহলে কথা ভিন্ন।"- আলমুগনি ৯/২১৩

সামনে বলেন,

لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين؛ إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه، لتعين الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي - ﷺ - فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة، تبعهم، فقاتلهم، من غير إذن، فمدحه النبي - ﷺ - وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وأعطاه سهم فارس وراجل. اهـ

"আমীরের অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কারণ, যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব তারই উপর ন্যাস্ত। শত্রুর সংখ্যা কম না বেশি এবং শত্রুর গোপন ঘাঁটি ও কৌশল-ষড়যন্ত্র

সম্পর্কে তিনিই ভাল অবগত। তাই তার মতামতই মেনে নেয়া চাই। এটাই মুসলামনদের জন্য অধিক কল্যাণ। তবে শত্রু যদি আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, যার ফলে অনুমতি নেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তখন অনুমতি নেয়া আবশ্যক নয়। কেননা, তখন শত্রুর সাথে কিতাল করা এবং তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার মাঝেই সনিশ্চিত কল্যাণ আর তাদেরকে ছেড়ে রাখার মাঝেই সুনিশ্চিত ক্ষতি। এ কারণেই কাফেররা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটপালের উপর আক্রমণ করেছিল এবং সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার বাহিরে তাদের নাগাল পেলেন, তিনি অনুমতি ছাড়াই তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন এবং কিতাল করলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করে বলেছেন, 'সালামা আমাদের পদাতিক বাহিনির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা' এবং তাকে একজন ঘোড়সওয়ার ও একজন পদাতিক যোদ্ধার সমপরিমাণ গনিমত দিয়েছেন।"- আলমুগনি ৯/২১৩-২১৪

এ আলোচনা ফরযে আইনের সময়কার। মাসলাহাতের খাতিরে এখানেও অনুমতির কথা বলেছেন। তদ্রূপ যখন অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে কিতাল শুরু করার মাঝেই মাসলাহাত তখন অনুমতি ছাড়াই জিহাদ শুরু করতে বলেছেন। বুঝা গেল, ইমাম বা আমীরের অনুমতি এমন কোন বিষয় নয় যা ব্যতীত জিহাদ সর্বাবস্থায় নাজায়েয। বরং বিষয়টি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত।

খতিব শারবিনি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন,

لا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظم الخطر. اهـ

"কাফেরদের প্রভূত শক্তিধর কোন সম্রাট আমাদের (দারুল ইসলাম) রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রবেশ করে গেলে (আমীরের অনুমতি ও নির্দেশনা ছাড়া) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা সাধারণ জনগণ তাকে প্রতিহত করতে তাড়াহুড়া করে কোন ব্যবস্থা নেবে না। কেননা, এতে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা আছে।"- মুগনিল মুহতাজ ৬/২৪

এ আলোচনাও ফরযে আইনের বেলায়। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে বিধায় ইমামের অনুমতি ছাড়া জনগণ তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে আকস্মিক শত্রু আক্রমণ করে বসলে ভিন্ন কথা- যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، وان حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الاماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج.اهـ

"যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে।"- আলমুগনী ১০/৩৭৪

বুঝা গেল, জিহাদ ফরযে আইন হোক আর ফরযে কিফায়া হোক সকল অবস্থায় ইমাম বা আমীরের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এর মাঝে মাসলাহাত। তবে যখন অনুমতি নিতে গেলে মাসলাহাত নষ্ট হবে, তখন অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। তদ্রূপ যদি ইমাম না থাকে, তথাপি বসে থাকা যাবে না। অবশ্য জিহাদ শুরু করার সময় তৎক্ষণাৎ একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। তদ্রূপ আমীর শহীদ হয়ে গেলেও একজনকে ততক্ষণাৎ আমীর বানিয়ে নেবে, যাতে শৃংখলা ঠিক থাকে; যেমনটা মূতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন।

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

فإن بعث الإمام جيشا، وأمر عليهم أميرا، فقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم، كما فعل أصحاب النبي - ﷺ - في جيش مؤتة، لما قتل أمراؤهم الذين أمرهم النبي - ﷺ - أمروا عليهم خالد بن الوليد، فبلغ النبي - ﷺ - فرضي أمرهم، وصوب رأيهم، وسمى خالدا يومئذ: " سيف الله ". اهـ

"ইমাম যদি কাউকে আমীর নির্ধারণ করে তার নেতৃত্বে কোন বাহিনি পাঠান, অতঃপর উক্ত আমীর নিহত হয় বা মারা যায়, তাহলে বাহিনি নিজেরা নিজেদের

একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে পারবে। যেমনটা মূতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক নির্ধারিত আমীরগণ যখন সকলে শহীদ হয়ে যান, তখন তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের এ কাজে সন্তুষ্ট এবং একে সঠিক বলেন। সেদিনই খালেদ রাদিয়াল্লাহুকে তিনি 'সাইফুল্লাহ'- 'আল্লাহর তরবারি' উপাধি দেন।"- আলমুগনি ৯/২০২-২০৩

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,

وإن نادى منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا. إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قوماً وينبغي أن يؤمر عليهم أميراً لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميراً ثم يقاتلوا. اهـ

"(যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পর) আমীরের ঘোষক যদি ঘোষণা দেয় যে, দানা পানির জন্য বাহিরে যাওয়া নিষেধ- তাহলে সংঘবদ্ধ হোক বা না হোক- কারো জন্যই বাহিরে যাওয়া উচিৎ হবে না। তবে ইমামের উচিৎ দানা পানির জন্য কিছু লোককে পাঠানো এবং পাঠানোর সময় একজনকে আমীর বানিয়ে দেয়া। যাতে তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলে যেন যুদ্ধ করতে সমর্থ্য হয়।

তদ্রূপ ইমাম নিষেধ করার পূর্বেই যদি (আমীর ছাড়া) বিক্ষিপ্তভাবে বেরিয়ে পড়ে অতঃপর তাদের উপর শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, তাহলে তাদের উচিৎ ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া তারপর যুদ্ধ শুরু করা।"- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৯৪

সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম, জিহাদের জন্য একজন আমীর এবং তার নির্দেশনা আবশ্যক। আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেরা কিছু করতে যাবে না। তবে বিষয়টি

মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত। যেখানে আমীরের অনুমতি নিতে গেলে মাসলাহাত ছুটে যাবে, সেখানে আমীরের অনুমতি নিতে হবে না। আমীরের অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। তবে উপস্থিত সময়ে ঐক্য ঠিক রাখার জন্য আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। তদ্রূপ আগের আমীর শহীদ হয়ে গেলে বা মারা গেলেও নিজেদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে তারপর কিতাল শুরু করবে। আমীর না বানিয়ে কিতাল শুরু করা উচিৎ নয়।

যখন প্রমাণ হল, আমীরের সম্পর্ক মাসলাহাতের সাথে তখন আমাদের সামনে নিম্নের সূরতগুলো আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে:

♣ ইমাম ফরযে আইন জিহাদে বাধা দিলে

ইমাম মুহাম্মদ রহ. 'আসসিয়ারুল কাবীর' এ বলেন,

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما. اهـ

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নাফীরে আম হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।" -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮

অর্থাৎ নাফিরে আম হয়ে গেলে তথা কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে ইমাম নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে হবে। কাফেররা আক্রমণ করার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। ইমাম যদি এ জিহাদে বের হতে নিষেধ করেন, তাহলে তিনি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী আদেশ দিলেন যা মান্য করা যাবে না। যেমনটা আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি। আরেকটি হাদিসে কথাটি এভাবে এসেছে,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"খালেকের নাফরমানী করে মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নয়।"-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৪৪০৬

মালিকী মাযহাবের কিতাব 'ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক' এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اهـ

"ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।"- ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اهـ

"কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।" -আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০

অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

♣ ইমাম জিহাদ না করলে বা জিহাদের অনুমতি না দিলে

ইবনু আসাকির রহ. (৫৭১হি.) আহমাদ ইবনু সা'লাবা আলআমিলি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

سئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع الإمام الجائر قال: إن كان جائرا وهو يعمل في الغزو بما يحق عليه فقاتل معه. وإن كان يرتشي منهم ويهادنهم فقاتل على حيالك. اهـ

“জালেম ইমামের সাথে মিলে শত্রুর (তথা কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ওয়াকি’ ইবনুল জাররাহ রহ. (১৯৭হি.) এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন, জালেম হলেও যদি যথাযথভাবে জিহাদ করে, তাহলে তার সাথে মিলেই যুদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি শত্রুদের থেকে ঘুষ নেয় এবং তাদের সাথে স্বজনপ্রীতির আচরণ করে, তাহলে তুমি তোমার নিজের মতো করে (আলাদা) জিহাদ করো।”- তারিখে দিমাশক ৭১/৪৭

লক্ষ্যণীয়, ইমাম বিদ্যমান থাকাকালেও যদি ইমাম খিয়ানত করে, অর্থের লোভে জিহাদ বন্ধ করে দেয় বা শত্রুদের সাথে স্বজনপ্রীতি দেখায়, তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়াই আলাদা জিহাদ করার কথা বলেছেন। এ কথা বলেননি যে, ইমাম জিহাদ বন্ধ করে রাখলে, তিনি অনুমতি না দিলে নিজে থেকে জিহাদ করতে যেও না; নিজে থেকে করতে গেলে হারাম হবে- এসব কিছুই বলেননি। বরং জিহাদ করতে বলেছেন। এবার আমাদের সরকারগুলোর অবস্থা বিবেচনা করুন।

খতীব শারবিনী শাফিয়ি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন,

[فصل] فيما يكره من الغزو ، ومن يحرم أو يكره قتله من الكفار ، وما يجوز قتالهم به (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) تأدبا معه ، ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد ، و إنما لم يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد ...تنبيه : استثنى البلقيني من الكراهة صورا.

إحداها : أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان.

ثانيها : إذا عطل الإمام الغزو و أقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد.

ثالثها : إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له . اهـ

“ইমাম বা তার নায়েবের অনুমতি ছাড়া জিহাদ মাকরুহ। ... তবে বুলকিনি রহ. কয়েক সূরতকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন।

১. অনুমতি নিতে গেলে যদি জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে যায়।

২. যদি ইমাম ও তার সৈন্য-সামন্ত জিহাদ ছেড়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে যায়।

৩. যদি প্রবল ধারণা হয় যে, অনুমতি চাইলে অনুমতি দেবে না।" – মুগনিল মুহতাজ: ১৭/২৮৭

অর্থাৎ যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে আর ইমামের অনুমতি নিতে গেলে শত্রুর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। কেননা, এখানে অনুমতি নিতে গেলে জিহাদের উদ্দেশ্য- তথা শত্রু প্রতিহত করা- ব্যহত হবে। তদ্রূপ ইমাম যদি জিহাদ ছেড়ে বসে থাকে বা কোন ওজর ছাড়াই কাউকে জিহাদে যেতে নিষেধ করবে মনে হয়ে থাকে, তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়া নিজেরাই জিহাদ করে নেবে। শারবিনী রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ আল্লাহ তাআলার বিধান। ইমাম শুধু শৃংখলার জন্য। যখন ইমামের অনুমতি নিতে গেলে যখন এ ফরযে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকবে, তখন অনুমতি নেবে না। তদ্রূপ, ইমাম এ ফরয আদায়ে গাফলতি করলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

♣ কাশ্মীর জিহাদ ও রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝলাম: ইমাম না থাকলেও জিহাদ ছাড়া যাবে না; তদ্রূপ ইমাম জিহাদ না করলে, অনুমতি না দিলে বা বাধা দিলে ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকেই জিহাদ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আমরা জিহাদের দায়িত্বটা ইমামের হাতে তখনই ন্যাস্ত করবো, যখন ইমাম নিয়মিত জিহাদ করবেন। এর ব্যতিক্রম হলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

এবার আমাদের বাংলাদেশসহ অন্য সকল তাগুতি রাষ্ট্রের দিকে তাকাই। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এরা মুরতাদ। স্বয়ং এদের বিরুদ্ধেই জিহাদ ফরয। আর তাদের আনুগত্যের তো কোন প্রশ্নই আসে না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً

"হে নবী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজান্তা ও মহাপ্রজ্ঞাময়।" – সূরা আহযাব: ১

কাজেই তাদের আদেশ নিষেধের কোন মূল্য নেই।

আর আবু বকর যাকারিয়া সাহেবের মতো যারা এদেরকে মুসলমান এবং আমীরুল মুমিনীন মনে করেন, তাদের ধারণা অনুযায়ীও কাশ্মীর বা অন্য কোন ভূখণ্ডে জিহাদে যেতে এদের অনুমতি লাগবে না। তারা যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, অন্যদেরকেও করতে দিচ্ছে না, বরং তারা নিজেরাই কাফেরদের বাহিনিতে পরিণত হয়েছে, তখন এদের আদেশ নিষেধের কোন মূল্য নেই। কাজেই বর্তমান তাগুতি রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসরত যেকোন মুসলমান – নিরাপত্তা ও মাসলাহাতের দিকটি বিবেচনায় রেখে- পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্রে গিয়ে জিহাদে শরীক হতে পারবে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনই বাধা নেই; বরং এটাই দায়িত্ব। অবশ্য আগেও বলেছি,

- যার-তার কথায় চলে যাবে না। মুজাহিদদের সাথে নিরাপদ ও পাকাপোক্ত যোগাযোগ হওয়ার পরই কেবল যাবে।

- তদ্রূপ এ কথাও বলেছি, নিজ দেশের তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা করাই নিয়ম। বিশেষ দরকার পড়লেই কেবল অন্য ভূমিতে হিজরত করবে, অন্যথায় নয়। সারা দুনিয়াই এখন জিহাদের ময়দান। সুবিধামতো সব জায়গাতেই জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৮০

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৪

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৭-২০১৯

সংশয়: দুর্বলতা এবং শত্রু সৈন্যের আধিক্যতা

শায়খের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ভারতের মোকাবেলা করার মতো শক্তি কাশ্মিরিদের নেই। ভারতের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এমতাবস্থায় জিহাদ করতে যাওয়া 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' তথা আত্মহত্যা হবে। কাজেই কাশ্মিরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো হারাম।

পর্যালোচনা

প্রথমত: কাশ্মিরে অন্তত ২০/২৫ লাখের মতো যুদ্ধোপোযোগি যুবক আছে। তারা অন্তত তাদের দ্বিগুণ তথা ৪০/৫০ লাখ মুশরিকের মোকাবেলা করতে সক্ষম। আর যদি ভারতের মুসলমানদের ধরা হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে অন্তত ৩/৪ কোটি যুদ্ধোপোযোগি যুবক আছে। এরা অন্তত ৬-৮ কোটি মুশরিকের মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাহলে মুসলমানরা দুর্বল কোথায়? আমাদের দুর্বলতা ফ্রিজে পানি বরফ করে রেখে ঠাণ্ডার অজুহাতে তায়াম্মুম করার মতো।

দ্বিতীয়ত: শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে জিহাদ হারাম বলে কোন কথা শরীয়তে নেই। এটি সম্পূর্ণই বানোয়াট। ইয়াহুদিদের মানস সন্তান দরবারি আলেমরাই কেবল এ কথা বলে বেড়ায়। নতুবা কুরআন, হাদিস বা আইম্মায়ে কেরামের কারো বক্তব্যে আপনি এ ধরণের কথা পাবেন না। আল্লাহ তাআলা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উপর রহম করুন, তিনি এসব নিফাকপ্রসূত সংশয়ের অপনোদন করে উম্মাহর সঠিক রাহনুমায়ি করে গেছেন সাতশো বছর আগেই। এ ব্যাপারে **قاعدة في الإنغماس في العدو** তথা 'শত্রুবাহিনির ব্যূহের ভেতরে ঢুকে আক্রমণ' নামক তার একটি স্বতন্ত্র রিসালা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে চয়নকৃত কিছু বক্তব্য পেশ করবো। বিস্তারিত ঐ রিসালাতে দেখা যেতে পারে।

♣ শত্রুবাহিনি দ্বিগুণের বেশি হলে

এ ব্যাপারে প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো দেখি। আল্লাহা তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)

"৬৪. হে নবী! আপনার এবং আপনার অনুসারি মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (কাজেই জনবল ও সরঞ্জামাদির স্বল্পতায় আপনি ঘাবড়াবেন না)। ৬৫. হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ-অবিচল ব্যক্তি থাকে, তাহলে (ওদের) দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের একশো থাকলে তারা কাফেরদের হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা (কাফেররা) এমন সম্প্রদায় যারা (জিহাদের ফজিলত) বুঝে না। (তারা যুদ্ধ করে দুনিয়ার জন্য, আর তোমরা দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহা প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে। কাজেই তারা তোমাদের সামনে দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না।)।"- আনফাল ৬৪-৬৫

ইসলামের শুরু যামানায় একজন মুমিন দশজন কাফেরের মোকাবেলা করা ফরয ছিল। আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন, তোমাদের যদি একজন দশজনের মোকাবেলাও করতে হয় তথাপি তোমরাই বিজয়ী হবে। শর্ত হল, সবরের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুহাজির ও আনসারদের বাহিরের লোকজনও মুসলমান হতে থাকলো, যাদের ঈমানী মজবুতি ও সবর তাদের সমান ছিল না, তাই তাদের পক্ষে একজন দশজনের মোকাবেলা কঠিন ছিল। এ দিকটি বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব হালকা করে দিয়েছেন। বিধান দিয়েছেন, একজন দু'জনের মোকাবেলা করতে হবে। দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(66)

“আল্লাহ এখন ভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। অতএব, তোমাদের যদি একশো দৃঢ়পদ-অবিচল ব্যক্তি থাকে, তাহলে দু’শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের এক হাজার থাকলে আল্লাহর হুকুমে দু’ হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ সবরকারী-দৃঢ়পদ লোকদের সাথে আছেন। (সংখ্যায়-সরঞ্জামে স্বল্প হলেও আল্লাহ তাদের নুসরত করবেন)।”- আনফাল ৬৬

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

এক. শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে মোকাবেলা ফরয নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মোকাবেলা জায়েয নয়। বরং শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা স্পষ্ট যে, শত্রু সংখ্যা অনেক গুণ বেশি হলেও, মৃত্যু নিশ্চিত হলেও ময়দান ত্যাগ না করে লড়াই করে যাওয়া এমনকি শহীদ হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার পছন্দ। এ ব্যাপারে আমরা সামনে ইনশাআল্লাহ দলীলভিত্তিক আলোচনা করবো। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المصابرة لما زاد على الضعف ليس في الآية أن ذلك لا يستحب ولا يجوز. اهـ

“এখানে বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়। আয়াতে এ কথা নেই যে, মোকাবেলা মুস্তাহাব নয় বা জায়েয নয়।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫৭

দুই. প্রথমে একজন দশজনের মোকাবেলা ফরয ছিল। পরে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে দায়িত্ব হালকা করে দিয়েছেন। বুঝা গেল, একজন মুমিন হিম্মত করলে দশজনের মোকাবেলা করতে সক্ষম। এক হাজার দশ হাজরের, এক লাখ দশ লাখের মোকাবেলা করতে সক্ষম। যদি তারা সবরের সাথে মোবাবেলা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিজয়ী হবে। জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

قوله تعالى {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} لم يرد به ضعف القوى والأبدان و إنما المراد ضعف النية لمحاربة المشركين فجعل فرض الجميع فرض ضعفائهم. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘আল্লাহ এখন ভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে’: এখানে সাজ-সরঞ্জাম ও শারিরীক শক্তির দুর্বলতা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতালের নিয়্যত ও হিম্মতের দুর্বলতা। দুর্বল হিম্মতের লোকদের ফরয যতটুকু (তথা দু’জনের মোকাবেলা করা), (উচ্চ হিম্মতের লোকসহ) সকলের বেলায় সেটুকুই ফরয করা হয়েছে।”- আহকামুল কুরআন ৩/৯২

অর্থাৎ ফরয তো সকলের জন্য একই, কিন্তু হিম্মত করলে একজন দশজনের মোকাবেলা করতে পারবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“কত ছোট ছোট দল রয়েছে যারা আল্লাহর হুকুমে বড় বড় বাহিনির উপর বিজয়ী হয়েছে!! আল্লাহ সবর ও অবিচলতার পরিচয়দাতাদের সাথে আছেন।”- বাকারা ২৪৯

তিন. দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়- এ বিধান ইকদামি জিহাদে। পক্ষান্তরে দিফায়ি জিহাদ তথা যেখানে মুসলমানরা নিজেরাই আগ্রাসনের শিকার, সেখানে বিধান ভিন্ন। সেখানে শত্রু সংখ্যা যতই বেশি হোক মোকাবেলা করতে হবে। একান্তই যদি কেউ মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فإذا كان المؤمنون طالبين لم تجب عليهم أن يصابروا أكثر من ضعفيهم، وأما إذا كانوا هم المطلوبين وقتالهم قتال وقع عن أنفسهم فقد تجب المصابرة كما وجبت عليهم المصابرة يوم أحد ويوم الخندق مع أن العدو كانوا أضعافهم. وذم الله المنهزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في سورة آل عمران والأحزاب؛ بما هو ظاهر معروف. اهـ

“যখন মুমিনরা (কাফেরদের ভূমি বিজয়ের জন্য) কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে যাবে, তখন দ্বিগুণের বেশির মোকাবেলা ফরয নয়। পক্ষান্তরে যখন মুমিনরা নিজেরাই আগ্রাসনের শিকার হবে এবং তাদের কিতাল হবে আত্মরক্ষার্থে, তখন মোকাবেলা ফরয। যেমন, উহুদ ও খন্দকের দিন মোকাবেলা ফরয ছিল-

অথচ শত্রুবাহিনি অনেক গুণ বেশি ছিল। উহুদের দিন যারা ময়দান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং খন্দকের দিন যারা জিহাদবিমুখতা প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরান ও আহযাবে তাদের যে কত কুৎসা বর্ণনা করেছেন তা (সকলের) কাছে সুস্পষ্ট ও জানাশুনা।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫৭

[বি.দ্র. কিতাবে **المظلومين و ظالمين** লেখা আছে। তবে আলোচনার আগ-পর থেকে স্পষ্ট যে, **المطلوبين و طالبين** হবে।]

উহুদে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাতশো আর কাফেররা ছিল তিন হাজার, তদ্রূপ খন্দকে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তিন হাজার আর কাফেররা ছিল দশ হাজার- যা তাদের তিনগুণেরও বেশি। তখন মোকাবেলা ফরয ছিল। উহুদে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার তিনশো সাথীসহ চলে আসে। খন্দকে মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানা তুলে জিহাদ থেকে সরে পড়তে চেয়েছিল। কুরআনে কারীমে তাদের সকলের নিফাক তুলে ধরে সমালোচনা করা হয়েছে। বুঝা গেল, দিফায়ি জিহাদে সংখ্যার হিসাব নেই। সামর্থ্যানুযায়ী দিফা করতে হবে। যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্যত্র বলেছেন,

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. اهـ

"প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিকে ধ্বংস করে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে কোনো গুরুতর ফরয নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ফুকাহাগণ ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছেন।"- আলফাতাওয়াল কুবরা ৪/৬০৮

অন্যত্র বলেন,

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى : {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعليكم النَّصْرُ إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [الأنفال : 72]، وكما أمر النبي ﷺ بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي ﷺ: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا] {الأحزاب: 13]. اهـ

“শত্রু যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, তখন যাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তাদের সকলের উপর ফরজ হয়ে যায় তাদেরকে প্রতিহত করা। যাদের উপর আক্রমণ করেনি, তাদের উপরও আক্রান্তদের সাহায্যে শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর যদি তারা দ্বীনের জন্য তোমাদের সাহায্য চায়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা। তবে তা যেন এমন কওমের বিরুদ্ধে না হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।’ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের সাহায্য করার আদেশ দিয়েছেন। (যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে) সে ব্যক্তি চাই যুদ্ধের জন্য বেতনভুক্ত হোক বা না হোক (উভয় অবস্থায়ই তার উপর আবশ্যক সাহায্য করা)। প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী জান এবং মাল দিয়ে সাহায্য করা ফরজ। কম-বেশি, পায়দল কিংবা সওয়ার হয়ে- যেভাবে সম্ভব। যেমন, খন্দকের বছর (আহযাব যুদ্ধে) যখন শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তখন আল্লাহ তায়ালা কাউকেই জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেননি; যেমন অনুমতি দিয়েছিলেন আক্রমণাত্মক জিহাদের বেলায়, যেখানে আগে বেড়ে কাফেরদের উপর হামলা করা হয়। সেখানে মুসলমানদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অংশগ্রহণকারী ও তরককারী। কিন্তু এখানে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদ ত্যাগ করার অনুমতি চেয়েছিল, তাদের তিরস্কার করে বলেছেন, ‘তাদের একদল এই বলে

যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল যে, আমাদের বাড়ি-ঘরগুলো অরক্ষিত। অথচ বাস্তবে সেগুলো অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের অভিপ্রায় ছিল (কোনো উপায়ে) পালিয়ে যাওয়া'।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৫৮

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد. يجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. اهـ

"দিফায়ি জিহাদ ইকদামি জিহাদের তুলনায় বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে ফরজ হয়। এ কারণেই তা প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। গোলাম তাতে মনিবের অনুমতি নিয়ে, না নিয়ে উভয় অবস্থায়ই জিহাদ করবে। সন্তান পিতা-মাতার এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। *এই প্রকার জিহাদের দৃষ্টান্ত উহুদ ও খন্দকের জিহাদ। এই প্রকার জিহাদে শত্রুসংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ বা তার কম হওয়া শর্ত নয়। কারণ, উহুদ ও খন্দকে কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল। এরপরও জিহাদ ফরজ ছিল।* কারণ, এ জিহাদ করতে হয় জরুরি ভিত্তিতে এবং আক্রমণকারী শত্রুর প্রতিরোধে। এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (তথা ইকদামি) জিহাদ নয়।"- আলফুরূসিয়্যাতুল মুহাম্মাদিয়া ১৮৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২১৮

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৫

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২০-২০১৯

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা জায়েয বরং প্রশংসনীয়

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট, শত্রু সংখ্যা যতই হোক, মোকাবেলা করা কাশ্মিরিদের জন্য ফরয। দ্বিগুণ বা তার কম হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়। এ আলোচনা থেকে আশাকরি শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়ার মূর্খতাও স্পষ্ট। শরীয়তের এমন সুস্পষ্ট বিষয় এবং যার ব্যাপারে স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর স্পষ্ট নসও বিদ্যমান (যে ইবনে তাইমিয়াকে আশ্রয় করে তারা নিজেদেরকে সালাফি দাবি করে)- এমন স্পষ্ট বিষয়কে যারা অস্বীকার করে, অপব্যাখ্যা করে: তারা কিসের সালাফি? সালাফিয়্যাত আর হাদিস হাদিস করে এরা উম্মাহকে ধোঁকায় ফেলতে চায়। তাগুতের নেক দৃষ্টি লাভের জন্য তারা সব কিছুই করে। এদের সাথে ইবনে তাইমিয়ার কি সম্পর্ক, আর সালাফিয়্যাতেরই বা কি সম্পর্ক? এগুলো সব ধোঁকা। শুধু আল্লাহ আরশে সমাসীন কি'না, তাবিজ ব্যবহার বৈধ কি'না- এসব মাসআলার জিগির তোলে সালাফিয়্যাতের রং লাগাতে চায়। যখন কুফর বিত তাগুতের কথা আসে, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর কথা আসে- তখন মুনাফিকদের মতো এদের চোখ ছানা বড় হয়ে যায়, যেন মৃত্যুর মূর্চা শুরু হয়ে গেছে। এরা আর যাই হোক- ইবনে তাইমিয়ার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সালাফিয়্যাত থেকেও এরা হাজারো লাখো ক্রোশ দূরে।

যাহোক, শায়খ মূর্খতা বা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীমের আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলে জিহাদ নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ দেখিয়েছি, কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর ধোঁকা। শত্রু সংখ্যা বেশি এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মোকাবেলা করা শুধু জায়েযই নয় বরং প্রশংসনীয়। **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কয়েকটি সূরত তুলে ধরে বলেন,**

"الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون"

كالرجل: يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم. ويسمي العلماء ذلك: "الانغماس في العدو": فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره . وكذلك الرجل: يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه. مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه، ويرى أنه يقتله ويغتفل بعد ذلك.والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون. فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليس في ذلك إلا خلافا شاذا. وأما الأئمة المتبعون ك: "الشافعي" و"أحمد "وغيرهما فقد نصوا على جوز ذلك. وكذلك: هو مذهب: "أبي حنيفة، و"مالك "وغيرهما. ودليل ذلك: الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة. اهـ

“মাসআলা: কোনো একক ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র একটি দল তাদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি শত্রুর মোকাবেলা করা- যখন তাদের কিতালে দ্বীনের কোনো উপকার সাধিত হয়, তবে তাদের প্রবল ধারণা যে, তারা সকলে নিহত হবে;

- যেমন, কোনো ব্যক্তি একাই কাফেরদের সারিতে হামলা করে এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ...

- এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি কাফেরদের অভ্যন্তরস্থ কোনো কাফের নেতাকে হত্যা করে। যেমন, চুপিসারে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। যখন মনে করল যে তাকে হত্যা করতে পারবে, সকলের সম্মুখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

- কোনো ব্যক্তির সকল সাথি পলায়ন করলো। তখন সে একাই বা ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেল। এ যুদ্ধে কাফেরদের কিছু ক্ষতি তো হবে, তবে মোটামুটি নিশ্চিত যে, তারা সকলে নিহত হবে।

চার মাযহাবের আইম্মায়ে কেরামসহ অন্য সকল ইমামের মতে এ সকল সূরত জায়েয। কিছু ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মত ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

শাফিয়ি ও আহমাদসহ অন্যান্য অনুস্বরণীয় ইমাম সুস্পষ্ট বলে গেছেন যে, এগুলো জায়েয। আবু হানিফা ও মালেকসহ অন্যান্য ইমামের মাযহাবও এমনই। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর সালাফগণের ইজমা এর স্বপক্ষে দলীল।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ২১-৩১

এর পর তিনি কুরআন সুন্নাহ থেকে এর দলীল পেশ করেন। সেখান থেকে সহজ কয়েকটি দলীল তুলে ধরছি। বিস্তারিত উক্ত রিসালায় দেখা যেতে পারে।

কুরআনে কারীম থেকে দলীল

ক. আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা (এরূপ) লোকদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।"- বাকারা ২০৭

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন বিকিয়ে দেয়ার ব্যাখ্যা ইবনে তাইমিয়া রহ. এভাবে দেন,

وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبه الله ويرضاه، وإن قتل أو غلب على ظنه أنه يقتل. اهـ

"তা এভাবে হবে যে, এমন পথে নিজের জীবন উৎস্বর্গ করে দেবে, যে পথ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ও যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট- যদিও মৃত্যু নিশ্চিত হয় বা প্রবল ধারণা হয় যে, সে নিহত হবে।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩২

আয়াতের শানে নুযূল থেকে বিষয়টি পরিষ্কার। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية.أن صهيبا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة إلى النبي ﷺ .فلحقه المشركون وهو وحده. فنشل كنانته، وقال: والله لا يأتي رجل منكم إلا رميته. فأراد قتالهم وحده، وقال: إن أحببتم أن تأخذوا مالي بمكة

فخذوه، و أنا أدلكم عليه. ثم قدم على النبي ﷺ. فقال النبي ﷺ: "ربح البيع أبا يحي."وروى أحمد بإسناده: أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كلا بل هذا ممن قال الله فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ} (البقرة:207) . اهـ

"আয়াতে কারীমার শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়:

ক. সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় রওয়ানা দেন। মুশরিকরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন তিনি একা মাত্র। তিনি তূণীর থেকে তীর নিলেন। বললেন, আল্লাহর কসম, যে কেউ সামনে আসবে তাকেই বিদ্ধ করবো। তিনি একাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, যদি আমার সম্পদ নিয়ে নেয়া (এবং বিনিময়ে আমাকে নিরাপদে হিজরতে যেতে দেয়া) তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে নিতে পার। আমি তা কোথায় আছে বলে দেব। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আবু ইয়াহইয়া! তোমার বিক্রি লাভেই হয়েছে'।

খ. ইমাম আহমাদ রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একাই শত্রু বাহিনির উপর আক্রমণ করলো। তখন কিছু লোক বলতে লাগলো, লোকটি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাদের কথা প্রত্যাখান করে) বললেন, কিছুতেই নয়! বরং সে তো ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা (এরূপ) লোকদের প্রতি অতিশয় দয়ালু'।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩১-৩২

খ. আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আল্লাহ্ মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সাথে) যে লেন-দেন করেছো, তার উপর আনন্দিত হও। আর এটাই মহা সাফল্য।”- তাওবা ১১১

আল্লাহ তাআলা যখন জান-মাল কিনে নিয়েছেন, তখন তা আল্লাহর হাতে সমর্পণ করতে হবে। **ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,**

فإن المشتري يسلم إليه ما اشتراه، وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته، وإن غلب على ظنه أن النفس تقتل والجواد يعقر، فهذا من أفضل الشهادة. اهـ

“কেননা, ক্রেতা যা ক্রয় করেছে, তা তার তাতে সমর্পণ করে দিতে হবে। আর তা এভাবে হবে যে, জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ও তার আনুগত্যে উৎস্বর্গ করবে- যদিও প্রবল ধারণা হয় যে, তার প্রাণ সংহার হবে এবং ঘোড়া কাটা পড়বে। আর এটাই শাহাদাতের সর্বশ্রেষ্ট পন্থা (যেমনটা হাদিসে এসেছে)।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩৩

এরপর ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ কিছু আয়াত থেকে বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেগুলো এখন উল্লেখ করছি না। (ইনশাআল্লাহ চলমান)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২৩৮

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৬

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২৫-২০১৯

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা জায়েয বরং প্রশংসনীয়

সুন্নাহ থেকে দলীল

ক. বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল তিনশোর চেয়ে কিছু বেশি, পক্ষান্তরে শত্রু সংখ্যা ছিল তিনগুণ বা তারও বেশি।

খ. উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাতশোর মতো, পক্ষান্তরে শত্রু সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মতো।

গ. খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের সম্মিলিত জোটে সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজারের অধিক, যা সাহাবায়ে কেরামের কয়েক গুণ।

ঘ. অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই কোনো কোনো সাহাবি একা একা কাফের বাহিনির উপর হামলা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করতেন।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فعلم: أن القوم يشرع لهم أن يقاتلوا من يزيدون على ضعفهم، ولا فرق في ذلك بين الواحد والعدد، فمقاتلة الواحد لثلاثة كمقاتلة الثلاثة للعشرة. اهـ

“বুঝা গেল, শত্রু বাহিনি দ্বিগুণের বেশি হলেও কিতাল জায়েয। এক্ষেত্রে একক ব্যক্তি জামাতের মাঝে কোন তফাৎ নেই। কেননা, এক ব্যক্তি তিনজনের মোকাবেলা করা তিন ব্যক্তি মিলে দশজনের মোকাবেলা করারই মতো।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৪৫

ঙ. আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। ইমাম বুখারি রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا

قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري و ابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب و ابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোয়েন্দাগিরির জন্য দশ সদস্যের একটি সারিয়্যা পাঠান। আসিম ইবনু সাবিত আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের আমীর নির্ধারণ করেন। তারা রওয়ানা হন। উসফান ও মক্কার মধ্যস্থ হাদআ নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, হুজাইল গোত্রের বনু লিহইয়ান কবিলার কানে তাদের সংবাদ গেল। প্রায় দু’শো লোক, যাদের প্রত্যেকেই দক্ষ তীরন্দাজ ছিল, তাদেরকে ধরার জন্য রওয়ানা দিল। ... আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীগণ যখন এদেরকে দেখলেন, একটি উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাদেকে ঘিরে ফেলল। বললো, ‘নেমে এস। আত্মসমর্পণ কর। আমরা অঙ্গিকার করছি, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না’।

সারিয়্যার আমীর আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আর যাই হোক, আল্লাহর কসম! আজকের দিনে আমি কোনো কাফেরের আশ্রয়ে নামবো না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সংবাদ আপনার নবীর কাছে পৌঁছে দিন'। এতে কাফেররা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সাতজনকে হত্যা করল। বাকি তিনজন অঙ্গিকার মতো নিচে নেমে এলেন। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনু দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরেকজন। যখন কাফেররা তাদেরকে বাগে পেল, তাদের তীরের রশিগুলো কেটে দিল এবং তাদেরকে বেঁধে ফেল। তখন তৃতীয়জন বললেন, 'এই তো প্রথম গাদ্দারি। আল্লাহর কসম আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐসব (নিহত) সঙ্গীদের মাঝে গ্রহণ করার মতো আদর্শ আমার জন্য আছে (অর্থাৎ আমিও তাদের মতো শহীদ হয়ে যাব)'। কাফেররা তাকে টেনে হেঁচড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি কোনো মতেই গেলেন না। ফলে তারা তাকে হত্যা করে দিল এবং খুবাইব ও ইবনু দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে চললো। অবশেষে বদরের পর মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দিল।"- সহীহ বুখারি ২৮৮০

দীর্ঘ হাদিস। এরপর খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার ঘটনা এবং আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ মৌমাছির দ্বারা সংরক্ষণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المائة أو المائتين، ولم يستأسروا لهم حتى قتلوا منهم سبعة .ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد من إتباعهم حتى قتلوه. اهـ

"এই যে এরা মাত্র দশজন লোক। ঐ একশো বা দুইশো লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আত্মসমর্পণ করেননি। এভাবে তাদের সাতজন শহীদ হয়েছেন। এরপর যখন তিনজন আত্মসমর্পণ করলেন, একজন তাদের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানালেন, ফলে তারা তাকেও হত্যা করে দিল।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫২

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله - ﷺ - بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به.اهـ

"ময়দানে টিকে থাকতেও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কতক লোক এর বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, এটা না'কি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। তাদের কথা সঠিক নয়। বরং এ তো হচ্ছে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া। অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমনটা করেছেন। হযরত আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন। যাকে মৌমাছি দিয়ে হেফাযত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। বুঝা গেল, এতে কোন অসুবিধে নেই।"- শরহুস সিয়ারিল কাবীর ১/ ৮৫

ইবনে তাইমিয়া রহ. এছাড়াও আরো দলীল পেশ করেছেন। আলোচনা সংক্ষেপণার্থে আমরা আর সামনে বাড়বো না। যতটুকু উল্লেখ করেছি, সত্যানুসন্ধানীর জন্য এতেই অনেক খোরাক আছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য বুঝার ও মেনে চলার তাওফিক দান কর! (চলমান)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/newreply.php?p=৭২৯৪০

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৭

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-০১-২০১৯

♣ ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা

দুর্বলতার হালতে জিহাদ করাকে শায়খ ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা তথা আত্মহত্যার নামান্তর এবং হারাম বলেছেন। এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এবার শুধু ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা-এর স্বরূপটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো, যাতে পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, ইয়াহুদি চরিত্রের এসব আলেম কত ধোঁকাবাজ। শরীয়তের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকেও এরা কিভাবে বিকৃত করে যাচ্ছে।

ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা প্রমাণ করতে তারা সূরা বাকার এ আয়াতটির অপব্যাখ্যা করে,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }

“তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান (সুকর্ম) কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন(সুকর্মশীল)দের ভালোবাসেন।”- বাক্বারা: ১৯৫

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

তোমরা যদি অর্থ-সম্পদ অর্জনের দিকে মনোনিবেশ কর, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তা ব্যয় না কর, তাহলে কাফেররা তোমাদের

উপর বিজয়ী হয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। জিহাদ ছেড়ে অর্থ-সম্পদের দিকে মনোনিবেশ করে নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - ﷺ - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر, فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري - ﷺ - فقال: يا أيها الناس , إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , و إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - ﷺ -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع منها , فأنزل الله على نبيه - ﷺ - يرد علينا ما قلنا: {و أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها , وندع الجهاد .قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية" [جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমাদের জামাতের আমির ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ বিন ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা নগরপ্রাচীরকে পশ্চাতে রেখে যুদ্ধের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল

(যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- '(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।' তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো? (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। আমরা যদি (কিছু দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম (তাহলে ভাল হতো না?)! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

{و أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

"তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।"

অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।'

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহাদ করতে থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, কুসতুনতুনিয়ায় তাকে দাফন করা হয়।"- জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২

পাঠক দেখুন! আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি আর দরবারিরা কি ব্যাখ্যা করছে!!

***

খোলাসা

- ইসলামের শুরু যামানায় শত্রু সংখ্যা দশগুণ হলেও মোকাবেলা করা ফরয ছিল।

- দুর্বল হিম্মতের মুসলমানদের প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহ তাআলা এ সীমা কমিয়ে দ্বিগুণে নিয়ে এসেছেন। শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে মোকাবেলা করতে হবে। এর বেশি হলে ফরয নয়।

- ফরয না হলেও মুস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়।

- উপরোক্ত আয়াত ইকদামি জিহাদের বেলায় প্রযোজ্য। দিফায়ী জিহাদের বেলায় শত্রু সংখ্যা যত বেশিই হোক, সামর্থ্যানুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে। যেমনটা উহুদ ও খন্দকে আমরা দেখেছি।

- নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা এবং জীবন দিয়ে দেয়া জায়েয বরং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রসংশনীয়। যেমনটা আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গী সাহাবাগণ করেছেন।

- শত্রুর ভয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করা মুনাফিকি।

- নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কিতাল করা ও জীবন দিয়ে দেয়া 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' নয়। 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' হল জিহাদ ও জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা পরিত্যাগ করা।

কাশ্মিরিদের উপর জিহাদ ফরযে আইন

উপরোক্ত আলোচনার পর স্পষ্ট, বর্তমান কাশ্মিরের পরিস্থিতি খন্দক যুদ্ধের মতো। মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তাদের উপর প্রতিরোধ ফরযে আইন। যে যেভাবে পারে প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে যারা নিহত হবে তারা শহীদ বলে গণ্য হবে- যদি জাতীয়তাবাদি চেতনা না থাকে। যারা সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিরোধ না করবে, তারা মদীনার মুনাফিকদের মতোই তিরস্কারের যোগ্য এবং ফরযে আইন তরকের গুনাহয় লিপ্ত। আর বহির্বিশ্বের মুসলমানদের উচিৎ সামর্থ্যানুযায়ী সহায়তা করা। এ ব্যাপারে শায়খের বিভ্রান্তির খণ্ডনে আমরা সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩০১

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৮

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-০৬-২০১৯

♣ সংশয়.ক: আক্রান্তরা না দাঁড়ালে কি বাকিদের উপর ফরয নয়?

♣ সংশয়.খ: পার্শ্ববর্তীরা সহযোগিতা না করলে কি পরবর্তীদের উপর ফরয নয়?

ফিকহের কিতাবাদিতে এ দু'টি সংশয়ের জওয়াব এক জায়গায় বরং একই লাইনে দেয়া হয়েছে। আমরাও তাই একসাথেই আলোচনা করবো।

সংশয়: শায়খ বলছেন,

- কাশ্মিরিরা যদি জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদের সহায়তার জন্য যাওয়া অন্য মুসলিমদের কোন দায়িত্ব নয়, বরং হারাম।

- কাশ্মিরিদের সহায়তা করার প্রথম দায়িত্ব পাকিস্তানের। তারা না করলে পরবর্তীদের জন্য সাহায্যে যাওয়া হারাম।

(লক্ষ্যণীয়, শায়খ কিন্তু কাশ্মিরিরা জিহাদে দাঁড়ালে নাজায়েয হবে বলেছেন। কারণ, ভারতের সৈন্য অনেক বেশি। আবার বলছেন, তারা না দাঁড়ালে বাহিরের মুসলমানরা যেতে পারেবে না। গেলে হারাম হবে। এক দিকে কাশ্মিরিরা দাড়ালে হারাম হবে, অপরদিকে বাইরের মুসলমান গেলেও হারাম হবে। ভিতর থেকেও জিহাদ হারাম, বাহির থেকেও জিহাদ হারাম। মুসলমানকে যাতাকলে পিষে ফেলার স্বপক্ষে এমন ফতোয়া মনে হয় কাফের বিশ্ব কমই পেয়ে থাকে।)

শায়খের এ দু'টো সংশয় দেখে বড়ই অবাক হতে হলো। কিতাবুল জিহাদের প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠাও যাদের পড়া আছে, তারাও অবাক না হয়ে পারবে না। বুঝলাম না যে, আহকামুস সিয়ারের ব্যাপারে শায়খ কি আসলেই এতোটা অজ্ঞ? না'কি

শায়খ উপরের নির্দেশে সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছেন? স্বার্থপরতা বা হুমকি ধমকি কি উম্মাহকে গোমরাহ করার পথে টেনে নিয়েছে শায়খকে? আল্লাহ মা'লূম। আমি প্রথমে ফিকহের কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি-

বিভিন্ন কিতাবের বরাতে আল্লামা ইবনু আবিদিন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا :فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. اهـ

"যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ঐসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকে না। এভাবে তার পরের এবং তার পরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে মাশরিক-মাগরিব; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।"- রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

আল্লামা ইবনু নুজাইম মিসরী রহ. (৯৭০ হি.) বলেন,

المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب

إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا. اهـ

"এখানে উদ্দেশ্য হল, কোনো নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ। তখন সে এলাকার সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয় অথবা (আল্লাহর) নাফরমানী করে অলসতা করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।"- আলবাহরুর রায়েক ১৩/২৮৯

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (৪৫৬হি.) বলেন,

ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم: أن يقصدهم مغيثا لهم . اهـ

"পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হবে না। তবে শত্রুরা কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলে তখন যে ব্যক্তিই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম, তার উপরই ফরজ তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।"- আলমুহাল্লা ৫/১২২

দাগ দেয়া অংশটুকু লক্ষ করুন-

- আক্রান্তদের ব্যাপারে ইবনে আবিদিন রহ. এর বক্তব্য: আক্রান্তরা 'যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন'।

- পার্শ্ববর্তীরা সহায়তা না করলে ইবনু নুজাইম রহ. এর বক্তব্য: যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয় অথবা (আল্লাহর) নাফরমানী করে অলসতা করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে'।

পরিষ্কার যে, আক্রান্তরা যদি অলসতা করে জিহাদ না করে তাহলে অন্যদের উপর ফরযে আইন। তদ্রূপ পার্শ্ববর্তীরা যদি অলসতা করে জিহাদ না করে তাহলে অন্যদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। আর ইবনে হাযমের বক্তব্য তো আরো স্পষ্ট। যেই সহায়তা করতে সক্ষম তাকেই সহায়তা করতে হবে।

বক্তব্যগুলোর সাথে শায়খের বক্তব্য মিলেয়ে দেখুন। শায়খ কি এসব বক্তব্য দেখেননি? না দেখে থাকলে এ ব্যাপারে কথা বলার আগে অন্তত ফিকহের দুয়েকটি কিতাব পড়ে দেখার দরকার ছিল। আর যদি দেখে থাকেন, তাহলে তো স্পষ্টই ধোঁকাবাজি।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৫১

পিডিএফ- কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়ার বিভ্রান্তির খণ্ডন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-২৪-২০১৯

কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়ার বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের খণ্ডনে ধারাবাহিক লেখাটি শুরু করেছিলাম। আল্লাহ তাআলার তাওফিকে লেখাটি সম্পন্ন হয়েছে। পোস্টে লেখার শিরোনাম ছিল:

‘জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস’।

পিডিএফ- এ সেটি পরিবর্তন করে

‘কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়ার বিভ্রান্তির খণ্ডন’- রাখা হল।

মৌলিকভাবে এ পুস্তিকায় যেসব সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে-

রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ছাড়া জিহাদ নাই।

শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলে প্রতিরক্ষা ফরয নয়।

আক্রান্তরা না দাঁড়ালে অন্যদের দায়িত্ব নেই।

পার্শ্ববর্তীরা সহায়তা না করলে দূরবর্তীদের দায়িত্ব নেই।

এছাড়াও আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন সংশয়ের সমাধান এসেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা- তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াস তার দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন।

লিংক:

https://my.pcloud.com/publink/show?c...rAefikfYLfQnx৭

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫১৪

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ফিতনাতুদ দাজ্জাল - সালাফ ও আমরা

আদনানমারুফ

Senior Member

১০-১৩-২০১৯

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর খলিফারুপে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কেবলই তাঁর ইবাদত করার জন্য। অর্থাৎ, নবী রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য যে জীবনব্যবস্থা প্রেরণ করেছেন তার যথাযথ অনুসরণের জন্য। তিনি আমাদেরকে পালনীয় বা বর্জনীয় যে দায়িত্বগুলো অর্পণ করেছেন গুরুত্বের বিচারে সেসবের সবগুলো একরকম নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দেয়া সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ কর্তব্য হল তাঁর প্রতি ইমান আনা, তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দেওয়া। এক্ষেত্রে পৃথিবীতে আগত তাঁর সব বান্দারাই একরকম নয়। তাদের কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি আদায় করে, আর অন্য অনেকে আদায় করে না। বরং, বলা ভাল, বান্দাদের অধিকাংশই তাঁর দেয়া এই দায়িত্বটি পালন করে না। যারা পালন করে তাদের সকলেই আবার আন্তরিকভাবে পালন করে না। আল্লাহ তায়ালা যদিও বান্দাদের মনের খবর জানেন, কে আন্তরিকভাবে ইমান এনেছে আর কে আনেনি এটা যদিও তিনি জানেন কিন্তু বান্দার উপর বাস্তবিক প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য তিনি বাহ্যিকভাবেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের ইমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, তিনি দেখতে চান, কারা আন্তরিকভাবে ইমান এনেছে আর কারা শুধু মুখেই ইমানের দাবীদার। পরীক্ষার মাধ্যমগুলো সবগুলো একরকম না, আবার সকলের ক্ষেত্রেও একরকম নয়। কেয়ামতের আগে আল্লাহ তায়ালা নিকৃষ্ট এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে নিজ বান্দাদের ইমানের পরীক্ষা নিবেন। যে ব্যাপারটিকে আমরা দাজ্জালের ফিতনা নামে জানি। এই পরীক্ষাটি হবে সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ। দাজ্জালের ফিতনার ভয়াবহতার কিছু চিত্র চলুন আমরা দেখে আসি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস থেকে। এক হাদীসে নবীজি ইরশাদ ফরমান-

ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب.

পৃথিবীতে প্রেরিত প্রতিজন নবীই নিজ নিজ উম্মাহকে মিথ্যাবাদী ও কানা দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। -সুনানে আবু দাউদ ৪৩১৬

আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবীজি বলেন-

إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال.

বনু আদমের সৃষ্টির পর দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ ও বিপদজনক কোন ফিতনা এ পৃথিবীতে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই নিজ নিজ উম্মাহকে দাজ্জালের ব্যাপার সতর্ক করেছেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭, [আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এ হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন **واسناده قوي** অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। ফয়জুল বারী ৪/৪০৬]

প্রিয় ভাইয়েরা! লক্ষ করুন, দাজ্জালের ফিতনা এমন একটি ফিতনা যার ব্যাপারে সকল নবী রাসূলই নিজ উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, এ পৃথিবীতে যত ফিতনা এসেছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিপদজনক ফিতনা হল দাজ্জালের ফিতনা। দাজ্জালের পৃথিবীতে আসার সময় তো হল কেয়ামাতের পূর্বক্ষণে। শেষ নবীর পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণের পর। অন্যান্য নবীর সময়ে তো সে আসবে না। কিন্তু তারপরও এই ফিতনার ভয়াবহতার কারণে তাঁরা নিজ নিজ উম্মাহকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালাও নবী রাসূলদের এ ব্যাপারে কোনরূপ নিষেধ করেননি যা থেকে এ ফিতনার ভয়বহতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা শেষ নবীর উম্মাহ যারা দাজ্জালের ফিতনার মূল টার্গেট তাদেরকেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে নিকৃষ্ট কানা দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এক হাদীসে এসেছে-

عن النواس بن سمعان، قال: ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظننناه في طائفة النخل.

নাওয়াস বিন সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করলেন, তিনি এক্ষেত্রে কখনো আওয়াজ নীচু করলেন আর কখনো আওয়াজ উঁচু করলেন। (তাঁর আলোচনার ধরণে) আমরা মনে করতে লাগলাম, সে মনে হয় খেজুর গাছের সারির কাছে এসে পড়েছে। -সহিহ মুসলিম ২৯৩৭

দেখুন, নবীজি দাজ্জালের ব্যাপারটা কতটা ভয়াবহরূপে তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যার ফলে তাদের কাছে মনে হয়েছে, দাজ্জাল সম্ভবত মদীনার অদূরে অবস্থিত খেজুর গাছের সারির কাছে চলে এসেছে। এছাড়াও এ ফিতনার ভয়াবহতার ব্যাপারে নবীজি হতে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তো ভাইয়েরা আসুন, আমরা এ ফিতনার ব্যাপারে নবীজির বর্ণিত হাদীসগুলো পাঠ করে তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করি, এ ফিতনা হতে বাঁচার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি।

আমাদের সালাফ আমাদের মত এ ফিতনার ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন না। তাদের সতর্কতার ব্যাপারে পূর্বোক্ত হাদীসটির সাথে চলুন আরো কিছু নমুনা দেখে আসি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চেয়ে নামাযের শেষ বৈঠকে একটি দোয়া পড়তেন। সাহাবায়ে কেরামকেও পড়তে বলতেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এই দোয়াটি ঠিক সেভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন তিনি তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলো, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় চাই, কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার কাছে জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে আশ্রয় চাই"। -সহিহ মুসলিম ৫৯০

অন্য রেওয়ায়েতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে-

قال رسول الله ﷺ: " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال."

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা সকলেই যখন তাশাহহুদ পড়বে তখন চারটি বিষয় হতে আশ্রয় চাইবে, বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে ও দাজ্জালের ভয়াবহ ফিতনা হতে। -সহিহ মুসলিম ৫৮৮

প্রথমোক্ত হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত তাবেয়ী তাউস বিন কায়সান রহ.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই দোয়াটির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বের কারণে তিনি নামাযে তা পড়া ওয়াজিব মনে করতেন। একবার তাঁর ছেলে নামায পড়ার তিনি তাকে এই দোয়াটি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাসূচক উত্তর করলেন। তখন তাউস বললেন, যাও! পুনরায় নামায পড়। -সহিহ মুসলিম ৫৯০ নং হাদীসের পরের অংশ

ইবনু মাজাহ রহ. নিজ সুনানে ৪০৭৭ সংখ্যায় দাজ্জালের ব্যাপারে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণনার পর তিনি আব্দুর রহমান আলমুহারেবী রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب، حتى يعلمه الصبيان في الكتاب.

এই হাদীসটি মক্তবের শিক্ষককে দেওয়া প্রয়োজন, যেন তিনি হাদীসটি মকতবের শিশুদের শিক্ষা দেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৭৭ নং হাদীসের পরের অংশ।

আল্লামা সাফফারিনী রহ. (১১৮৮ হি.) বলেন-

مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال... فينبغي لكل عالم ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه

المحن و اندرست فيه معالم السنن وصارت السنة فيه كالبدع والبدعة شرعا يتبع.

আলিমদের উচিত দাজ্জালের হাদীসসমূহ শিশু, মহিলা ও পুরুষ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। ... এ কাজটি সকল আলিমেরই করা উচিত। বিশেষত আমাদের এই যামানায়, যখন বিভিন্ন ফিতনা মাথা উঁচু করেছে, বিপদাপদ বেড়ে গেছে, সুন্নাহ এতটাই মিটে গেছে যে সুন্নাহই হয়ে গেছে বিদআত আর বিদআত হয়ে গেছে অনূসরণীয় শরিয়ত। -লাওয়ামিউল আনওয়ারুল বাহিয়্যাহ ২/১০৬, ১০৭

তো প্রিয় ভাইয়েরা! আসুন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক ভয়াবহ ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক হই, তার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি সহ দোয়া করি। বিশেষত, নবীজির বলে দেওয়া দোয়াটি গুরুত্বের সাথে পাঠ করি, এ ফিতনাসহ অন্যান্য সব ফিতনার ব্যাপারে সালাফের মত সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪১৩

নাফিরে আম: আরেকটু আলোকপাত

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২২-২০১৯

নাফিরে আম সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, নাফিরে আম ইমামুল মুসলিমিনের আহ্বানের নাম নয়, নাফিরে আম হচ্ছে- যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয় আর তা প্রতিহত করার জন্য ব্যাপকভাবে মুসলমানদের জিহাদে বের হতে হয়। যেমনটা ইবনু আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেছেন,

وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى "النَّفِيرُ الْعَامُّ"

"এ অবস্থাকে 'নাফিরে আম' বলা হয়।"- রদ্দুল মুহতার ৪/১২৭এ অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন। ইমামুল মুসলিমিন আহ্বান করুক বা না করুক, ইমাম থাকুক বা না থাকুক- সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন। যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে প্রথমত তাদের উপর ফরযে আইন। তারা না পারলে বা না করলে তাদের প্রতিবেশীদের উপর। এভাবে এক সময় তা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ফরয হয়ে যায়।

তবে যফর আহমদ উসমানী রহ. ই'লাউস সুনানে যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে অনেকে বুঝে নিতে পারেন যে, নাফিরে আম হচ্ছে ইমামুল মুসলিমিনের আহ্বানের নাম। ইমামুল মুসলিমিন আহ্বান না করলে নাফিরে আম হয় না। তাই বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করে দেয়া ভাল মনে হচ্ছে। এজন্য **শরহুস সিয়ার থেকে দু'টি উদ্ধৃতি পেশ করছি ইনশাআল্লাহ-**

এক. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,

وعند النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه. وإذا لم يكن النفير عاما، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه، فإن أمره بالخروج مع ذلك، فليطعه. اهـ

“নাফিরে আমের সময় পিতা-মাতা নারাজ হলেও জিহাদে যেতে পারবে। আর নাফিরে আম না হলে যদি ইমাম জিহাদে যেতে আদেশ দেন, তাহলে পিতা-মাতার নারাজির বিয়ষটা তাকে অবগত করবে। এরপরও বের হতে আদেশ দিলে, ইমামের কথাই মানবে।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১৪৫৫

দুই. সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

إذا وقع النفير عاما كان له أن يجبر الناس على الخروج. اهـ

“নাফিরে আম হলে ইমামুল মুসলিমিন জনগণকে জিহাদে বের হতে বাধ্য করতে পারবেন।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ৫১৭

প্রথম বক্তব্যে বলা হচ্ছে, নাফিরে আম না হলে যদি ইমাম জিহাদে যেতে আদেশ দেন ...। বুঝা গেল, নাফিরে আম আর ইমামের আহ্বান ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। নাফিরে আম ভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, ইমামের আহ্বানের উপর নির্ভরশীল নয়। সে ভিন্ন কারণ না পাওয়া গেলেও যদি ইমাম জিহাদে যেতে আদেশ দেন, তাহলেও জিহাদে বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বক্তব্যে বলা হচ্ছে, নাফিরে আম হয়ে গেলে ইমাম জনসাধারণকে জিহাদে যেতে বাধ্য করতে পারবেন। বুঝা গেল, নাফিরে আম ভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। সে ভিন্ন কারণে যখন নাফিরে আম হয়ে যাবে, তখন জনগণ জিহাদে বের হতে না চাইলে ইমামুল মুসলিমিন জনগণকে জিহাদে বের হতে বাধ্য করতে পারবেন। কারণ, মুসলমাননা আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে আইন। আর কোন মুসলমান কোন ফরয আদায় করতে রাজি না হলে ইমামুল মুসলিমিন তাকে তা আদায় করতে বাধ্য করবেন। যেমন, যাকাত দিতে রাজি না হলে কিতাল করে হলেও যাকাত আদায় করবেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দু’টি থেকে আশাকরি পরিষ্কার যে, নাফিরে আম ইমামের আহ্বানের নাম নয়। নাফিরে আম একটা অবস্থা ও পরিস্থিতির নাম, যে পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের দরকার পরে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৭৩

সংশয়: লা তামান্নাও লিকাআল আদুউ

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-০৭-২০১৯

হাদিসে এসেছে, **'লা তামান্নাও লিকাআল আদুউ'- 'তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না।'**

হাদিস থেকে কেউ কেউ সংশয়ে পড়তে পারেন যে, হাদিসে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর জিহাদ মানেই তো শত্রুর মুখোমুখী হওয়া। অতএব, হাদিসে জিহাদ নিষেধ করা হয়েছে। এক ভাই হাদিসটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তখন সংক্ষেপে হাদিসের মর্ম বলেছিলাম। ইনশাআল্লাহ এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

হাদিসটি বুখারি-মুসলিম উভয়ই রিওআয়াত করেছেন। বুখারি শরীফের রিওয়াতটি এমন,

حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال (أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم) –صحيح البخاري، رقم: 2861، ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت

"উমার ইবনু উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবু নজর সালিম রহ. বর্ণনা করেন, আমি তার (উমার ইবনু উবায়দুল্লাহর) কেরানী ছিলাম। তিনি যখন হারুরিয়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা

রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে একটি পত্র লেখেন। আমি পত্রটি পড়লাম। তাতে লিখা ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখী হন। সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি (হামলা না করে) অপেক্ষায় থাকলেন। এরপর জনসম্মুখে নসিহতের জন্য দাঁড়ান। বলেন, হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে শত্রুর মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। শুনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা সঞ্চালনকারী, সম্মিলিত (কাফের) বাহিনিকে পরাভূতকারী! আপনি তাদের পরাভূত করুন। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের নুসরত করুন'!"- সহীহ বুখারি ২৮৬১

বিশ্লেষণ

♣ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চিরাচরিত সুন্নতের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, **'সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি (হামলা না করে) অপেক্ষায় থাকলেন'।**

এটি রাসূলের যুদ্ধনীতি। দিনের শুরুভাগে যদি আক্রমণ না করতেন, বেলা চড়ে উঠলে আর আক্রমণ করতেন না। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর যখন জোহরের নামাযের সময় শুরু হত তখন আক্রমণ করতেন। **যেমন এক হাদিসে এসেছে,**

كان النبي ﷺ يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس –مسند الإمام أحمد، رقم: 19141، ط. الرسالة، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. اهـ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার সময় শত্রুর মোকাবেলায় নামতে পছন্দ করতেন।"- মুসনাদে আহমাদ ১৯১৪১

অন্য হাদিসে এসেছে,

كان رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس يمهل ثم ينهد إلى عدوه –سنن سعيد بن منصور، رقم: 2518، ط. الدار السلفية – الهند

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। তারপর শত্রুর মোকাবেলায় নামতেন।”- সুনানু সাঈদ ইবনু মানসূর ২৫১৮

অন্য হাদিসে এসেছে,

كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات –صحيح البخاري، رقم: 2989، ط. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দিনের শুরু ভাগে কিতাল না করতেন, (নুসরতের) বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়া ও নামাযের সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।”- সহীহ বুখারি ২৯৮৯

হাফেয ইবনু হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك. اهـ

“বুঝা গেল, যুদ্ধ পিছিয়ে দেয়ার ফায়েদা হচ্ছে যে, নামাযের সময় হচ্ছে দোয়া কবুলের সময়। আর জঙ্গে আহযাবে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বিজয় হয়েছিল। কাজেই বায়ুপ্রবাহও নুসরতের একটা সম্ভাব্য কারণ।”- ফাতহুল বারি ৬/১২১

অধিকন্তু এ সময় বায়ুপ্রবাহের ফলে মন-মেজাজ ভাল থাকে। তাছাড়া এ সময় নামাযের পর মুসলমানরা মুজাহিদদের জন্য দোয়া করে।

অতএব, আলোচ্য হাদিসে ‘সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি (হামলা না করে) অপেক্ষায় থাকলেন’ দ্বারা উদ্দেশ্য: হামলা করার উদ্দেশ্যে জোহরের ওয়াক্ত আসার অপেক্ষায় থাকলেন।

♣ **‘এরপর জনসম্মুখে নসিহতের জন্য দাঁড়ান। বলেন, হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর’।**

বুঝা যাচ্ছে, জোহরের ওয়াক্ত আসার পর, নুসরতের বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার হামলা করতে যাবেন। তবে হামলার আগে যুদ্ধের একটি আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। নিজেদের শক্তির উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার নুসরত কামনা করা। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা যেন তিনি আমাদের বিপদমুক্ত রাখেন। সহীহ সালামতে বিজয় দান করেন। শত্রুর মুখোমুখী না হয়েই যদি বিজয় এসে যায়, তাহলে সেটাই ভাল। এর বিপরীতে এমন দোয়া না করা যে, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে শত্রুর মুখোমুখী কর। সহীহ সালামতে বিজয় দিয়ো না। তাদের সাথে আমাদের যেন লড়াই হয়। আমরা যেন আমাদের বীরত্ব দেখাতে পারি। আমরা যে তোমার খাঁটি বান্দা এটা যেন প্রমাণ হয়ে যায়'। এ ধরণের কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ,

 # এ ধরণের কামনা নিজের বড়ত্বের আলামত। আল্লাহর নুসরতের বদলে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসার নামান্তর।

ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

إنما نهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الاعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة. اهـ

"শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ বাহ্যত এটি আত্মগৌরব মনে হয়। মনে হয় যেন (আল্লাহর পরিবর্তে) নিজেদের উপর ভরসা করা হচ্ছে। যেন জাগতিক শক্তি-সামর্থ্যকে যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে।"- আলমিনহাজ শরহু মুসলিম, ১২/৪৫

 # নফস বড় গাদ্দার। এখন যদিও মনে হচ্ছে যে, নামুক যুদ্ধে। দেখিয়ে দেব মজা। কিন্তু ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পর দিল ঘুরে যেতে পারে। বরং এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

যেমন বক্ষমান হাদিসের কোনো বর্ণনায় এসেছে,

لا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك –مسند الإمام أحمد، رقم : 9196، ط. الرسالة، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح بطريقيه وشواهده. اهـ

“তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। কারণ, এতে শেষ পরিণতি কি হবে তোমাদের জানা নেই।”- মুসনাদে আহমাদ ৯১৯৬

হাফেয ইবনু হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وقال بن دقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة. اهـ

“ইবনু দাকিকুল ঈদ রহ. বলেন, মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া সবচেয়ে কঠিন জিনিস। অধিকন্তু তা অজানা বিষয়, সামনে উপস্থিত নেই। যখন সম্মুখে আসবে, ভালোয় ভালোয় যেমন হওয়া দরকার তেমন হবে বলে কোন নিশ্চয়তা নেই। এ জন্য তা কামনা করা অপছন্দনীয়। তাছাড়া ব্যক্তি মনে মনে যে দৃঢ় অঙ্গীকার করে রেখেছে, পরে তার বিপরীতও হয়ে যেতে পারে। তবে সম্মুখে এসে গেলে সবর করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।”- ফাতহুল বারি ৬/১৫৭

উহুদের যুদ্ধে আমরা এর প্রমাণ দেখেছি। বদর যুদ্ধে যেসকল সাহাবি শরীক হতে পারেননি, তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, একটা যুদ্ধ হলে বদরিদের মতো আমরাও দেখিয়ে দিতাম ...! কিন্তু উহুদের দিন যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছন দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছুটতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের তিরস্কার করে বলেন,

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

“মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তো তোমরা তা কামনা করতে। এখন তো তোমরা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করলে।”- আলে ইমরান ১৪৩

অর্থাৎ- কিন্তু তোমাদের সেই অঙ্গীকার কোথায় গেল? এখন কেন পলায়ন করলে?

আবুস সাউদ রহ. (৯৮২ হি.) বলেন,

وهو توبيخٌ لهم على تمنِّيهم الحربَ وتسبُّبِهم لها ثم جُبنِهم وانهزامِهم. اهـ

“আল্লাহ তাআলা তিরস্কার করছেন যে, তারাই তো যুদ্ধ কামনা করেছিল, যুদ্ধ ডেকে এনেছিল। এরপর ভীরুতা প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।”- তাফসিরে আবুস সাউদ ২/৯২

যেখানে সাহাবায়ে কেরামের মতো ব্যক্তিরাও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে পারেননি, সেখানে পরবর্তীদের জন্য কিভাবে সম্ভব? এজন্যই যুদ্ধ কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

 # যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন বিপদের বোঝা মাথায় নেয়, সাধারণত তারা তা রক্ষা করতে পারে না। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় কোন পদ চাইতে হাদিসে নিষেধ এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ». –صحيح مسلم، رقم: 4819، ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة. بيروت

“নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। কারণ, চেয়ে নিলে তোমাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। আর চাওয়া ছাড়াই এসে পড়লে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নুসরত করা হবে।”- সহীহ মুসলিম ৪৮১৯

অথচ ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদার কথা সকলে জানি। যে সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে স্থান দেয়া হবে, তাদের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। এতদসত্বেও নেতৃত্ব পাওয়ার কামনা করতে, চেয়ে নিতে নিষেধ এসেছে। কারণ, পরে তার যথাযথ হক আদায় করা সাধারণত সম্ভব হয় না। এ কারণে যারা পদ চায় তাদেরকে পদ দিতে হাদিসে নিষেধ এসেছে।

এমনিভাবে ফিতনা থেকে, দারিদ্রতা থেকে, অসুস্থতা থেকে পানাহ চাওয়ার কথা হাদিসে এসেছে। অথচ হাদিসে এসেছে:

- ফিতনার সময় শরীয়ত যিন্দা করলে শহীদের সওয়াব মিলবে।

- গরীবরা ধনীদের আগে জান্নাতে যাবে।

- মহামারিতে মারা গেলে শহীদের সওয়াব পাবে।

এতদসত্বেও এগুলো থেকে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোন অঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সম্মুখীন হলে তখন সবর করা অতো সহজ হবে না। হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে হ্যাঁ! যদি এসেই পড়ে, তখন সবর করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذرونحو ذلك أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون. كما ثبت في الصحيحين من غيروجه عن النبي ﷺ {أنه نهى عن النذر؛ وقال :إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل} وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: {لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها؛ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خيروكفر عن يمينك} وثبت عنه في الصحيحين أنه }قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه} . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: {لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف} وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء؛ وكما يفعل كثيرممن يعاهد الله عهودا على أمور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبرويثبت. اهـ

“নিজের উপর বোঝা টেনে আনা অপছন্দনীয়। যেমন অঙ্গীকার, মান্নত বা অন্য কোনভাবে শরীয়ত যা অবধারিত করেনি তা অবধারিত করে নেয়া। কিংবা কোন পদ তলব করা বা এমন অঞ্চলে যাওয়া যেখানে মহামারি চলছে। সহীহাইনে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, ‘মান্নত কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এর দ্বারা কেবল কৃপণ লোকদের থেকে কিছু সম্পদ বের করে নেয়া হয়’।

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, ‘নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। কারণ, চেয়ে নিলে তোমাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। আর চাওয়া ছাড়াই এসে পড়লে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নুসরত করা হবে। আর কোন কসম করার পর যদি এর ভিন্নটাতে কল্যাণ আছে বলে মনে কর, তাহলে ভালোটাই করবে আর কসমের কাফফারা দিয়ে দেবে’।

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে, মহামারির ব্যাপারে তিনি বলেছেন, ‘কোন এলাকায় মহামারি পতিত হয়েছে শুনলে সেখানে যাবে না। আর কোন ভূমিতে থাকাবস্থায় পতিত হলে সেখান থেকে বের হয়ে পালাবে না’।

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেন, ‘তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে শত্রুর মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। শুনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে’।

এ ধরণের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেগুলোর দাবি:

- নিজের উপর বিভিন্ন বিষয় অবধারিত করে নেয়া বা হারাম করে নেয়ায় পা না বাড়ানোই উচিৎ। কারণ, পরে তা রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে না। অনেকেই অনেক বিষয়ে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অঙ্গীকার ভঙ্গের সম্মুখীন হয়।

- আরো দাবি: বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করবে। অটল থাকবে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ১০/৩৮

ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

نهى الرسول أمته عن تمنى لقاء العدو؛ ولأنه لا يعلم ما يئول أمره إليه ولا كيف ينجو منه، وفى ذلك من الفقه النهى عن تمنى المكروهات، والتصدى للمحذورات، ولذلك سأل السلف العافية من الفتن والمحن؛ لأن الناس مختلفون فى الصبر على البلاء، ألا ترى الذى أحرقته الجراح فى بعض المغازى مع رسول الله (ﷺ) فقتل نفسه، وقال الصديق: (لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر). اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তার জানা নেই যে, পরিস্থিতি শেষে কোন দিকে গড়াবে। এও জানা নেই যে, কিভাবে তা থেকে নাজাত মিলবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, অপছন্দনীয় বিষয়াশয়ের আকাঙ্ক্ষা করা বা স্বেচ্ছায় নিজেকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করা নিষেধ। এ কারণে সালাফগণ ফিতনা ও শাসকদের বালা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করতেন। কেননা, বিপদে সবর করার শক্তি সকলের সমান নয়। ঐ লোকের অবস্থাটা কি দেখনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে যে জখমের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আত্মহত্যা করেছিল?! (আবু বকর) সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘বিপদে পড়ে সবর করার চেয়ে সুস্থ ও নিরাপদ থেকে শুকর করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।”- শরহুল বুখারি লি ইবনি বাত্তাল ৫/১৮৫

 # শরীয়ত প্রথমেই কাফের সাথে যুদ্ধে লেগে যেতে আদেশ দেয়নি। প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে বলেছে। তাতে সম্মত না হলে জিযিয়া কবুলের দাওয়াত দিতে বলেছে। কোনটাতেই সম্মত না হলে তখন যুদ্ধের আদেশ। উদ্দেশ্য- ভালোয় ভালোয় কাজ হয়ে গেলে বিপদে জড়ানোর দরকার নেই। জিহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদের মেরে শেষ করে ফেলা নয়। উদ্দেশ্য ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা। প্রথমে তা সম্ভব না হলে অন্তত ইসলামী শাসনের অধীনে নিয়ে আসা। যাতে এক দিকে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, অন্যদিকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখে আস্তে আস্তে মুসলমান হয়ে যায়। মারামারি-কাটাকাটি ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো উদ্দেশ্য নয়। এগুলো করা হবে প্রয়োজনের তাগিদে। অতএব, কোন মুমিনের উচিৎ নয় সংঘর্ষে জড়ানোর কামনা করা। সহীহ সালামতে নিরাপদে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার দোয়া করবে। যদি এভাবে কাজ না হয় তখন যুদ্ধের বিধান।

ইমাম কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) সুন্দর কথাই বলেছেন,

ولأن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام، والدعوة دعوتان: دعوة بالبنان، وهي القتال ودعوة بالبيان، وهو اللسان، وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الأولى؛ لأن في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال، وليس في دعوة التبليغ

شيء من ذلك، فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها. اهـ

"যুদ্ধ এ জন্য ফরয করা হয়নি যে, এটি স্বতন্ত্র একটি মাকসাদ। বরং ফরয করা হয়েছে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্যে। আর **দাওয়াত দুই প্রকার:**

এক. দাওয়াত বিলবানান তথা শক্তিবলে দাওয়াত। এটি হল যুদ্ধ।

দুই. দাওয়াত বিলবায়ান তথা বুঝানোর মাধ্যমে দাওয়াত। এটি হবে যবান দ্বারা তাবলিগ করার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে সহজ। কেননা, যুদ্ধে জান-মাল হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তাবলিগের মাধ্যমে দাওয়াতে এর কিছুই নেই। যখন সহজ দাওয়াতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন এটি দিয়েই শুরু করা আবশ্যক।"- বাদায়িউস সানায়ি ৭/১০০

মোটকথা, মারামারি মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য কুফর বিদূরিত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যত সহজে তা সম্ভব হয়, ততই ভাল। তাই নিরাপদে, সহজে ও সহীহ সালামতে কাজ হয়ে যাওয়ার দোয়া করাই কাম্য। মারামারির আকাঙ্ক্ষা কাম্য নয়।

♣ হাদিসের পরের অংশ: 'তবে শত্রুর মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। শুনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে'।

দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি এটাই যে, কাফেররা মৌখিক দাওয়াতের দ্বারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয় না কিংবা জিযিয়া কবুল করতেও সম্মত হয় না। আমরা আমাদের দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহ তাআলার কাছে কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিলের দোয়া করব। তবে সব সময় সংঘর্ষ ছাড়া সমাধান হবে না। সংঘর্ষে জড়াতেই হবে। তখন শরীয়ত আদেশ দিয়েছে সবরের সাথে মোকাবেলার। অসংখ্য অগণিত নিয়ামত ও মান-মর্যাদার লোভ দেখিয়ে আল্লাহ তাআলা এ সময় টিকে থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। ভীরুতা ও কাপূরুষতা থেকে বারণ করেছে। পলায়ন করা হারাম করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"- সুরা আনফাল: ৪৫-৪৬

হাফেয ইবনু হাজার রহ. বলেন,

قال القرطبي وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين وقال بن الجوزي المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. اهـ

"কুরতুবি রহ. বলেন ... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে। জিহাদের বিনিময়ে যে প্রতিদান মিলবে তারও জানান দিচ্ছে। উৎসাহ দিচ্ছে শত্রুর নিকটবর্তী হতে। তরবারি চালাতে। লড়াইয়ের ময়দানে একে অপরের নিকটে জমায়েত হতে। যেন লড়াইকারীদের মাথার উপর তরবারি ছায়াদানকারী শামিয়ানার মতো হয়ে যায়। ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, উদ্দেশ্য- জান্নাত জিহাদের দ্বারা মিলবে।"- ফাতহুল বারি ৬/৩৩

♣ আশাকরি উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, এ হাদিসে জিহাদ ছাড়তে বলা হয়নি, বরং জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে জিহাদের একটি আদব শিখানো হয়েছে যে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর কখনও ভরসা করবে না। ভরসা করবে আল্লাহর উপর। আল্লাহর নুসরতের উপর। বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কামনা করবে না। সহীহ সালামতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ার দোয়া

করবে। **এজন্য ইবনু কুতায়বা রহ. (২৭৬হি.) এ হাদিসকে নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে এনেছেন,**

آداب الحرب ومكائدها

"যুদ্ধের আদব ও কলা-কৌশল।"- উয়ূনুল আখবার ১/১৮৫

ইবনু হাজার রহ. বলেন,

وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم بما يحتاجون إليه وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة والحث على سلوك الأدب وغير ذلك. اهـ

"হাদিস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মুস্তাহাব বুঝা যাচ্ছে:

- শত্রুর মুখোমুখী হলে দোয়া করা।

- আল্লাহর কাছে নুসরত চাওয়া।

- মুজাহিদদের এমনসব বিষয়ে অসীয়ত করা যেগুলো তাদের ইসলাহ করবে।

- এমনসব বিষয় তা'লিম দেয়া যেগুলো তাদের প্রয়োজন পড়বে। ...

- আদব বজায় রেখে চলার প্রতি উৎসাহ দেয়া। এ ছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয়।"- ফাতহুল বারি ৬/১৫৭

উভয় ইমামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, হাদিসটি যুদ্ধের আদব বয়ান করার জন্য বলা হয়েছে, যুদ্ধ থেকে ফেরানোর জন্য নয়।

অধিকন্তু হাদিসের শুরু-শেষ ও প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট:

- হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানে বলেছেন।

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দিনের শুরুভাগে হামলা করেননি, তখন হামলাটি যেন মোবারক সময়ে হয় এ জন্য জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন।

- জোহরের সময় হওয়ার পর যখন হামলা করবেন স্থির করেছেন তখন যুদ্ধের একটি আদব বর্ণনা করেছেন, পাশাপাশি সবরের সাথে টিকে থাকার উৎসাহ দিয়েছেন।

- আমীর উমার ইবনু আব্দুল্লাহ রহ. যখন হারুরিয়্যা তথা খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে এ কথা বলেননি যে, জিহাদে যাওয়া যাবে না, হাদিসে নিষেধ এসেছে। বরং তিনি যুদ্ধের একটি সুন্নত শিখালেন যে, যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন যেন বুঝিয়ে সুজিয়ে দলীল-প্রমাণ পেশ করে খাওয়ারেজদের পথে নিয়ে আসা যায়। সংঘর্ষ ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করবেন। যেমনটা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। নিজে গিয়ে এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে মুনাযারা করে খাওয়ারেজদের ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছেন। এতে অধিকাংশ খাওয়ারেজ ফিরে আসে। বাকি যারা থেকে যায় তাদের সাথে কিতাল করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এটিই শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন।

- কয়েকটি হাদিস থেকে বুঝা যায়, এ হাদিস খায়বারের যুদ্ধের সময়কার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগেও অনেক জিহাদ করেছেন, এর পরেও করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের পতাকা উড্ডীন করে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়েন। রোম-পারস্যসহ অর্ধেকেরও বেশি দুনিয়া বিজয় করেছেন। যদি এ হাদিসে জিহাদ নিষেধ করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সেদিন জিহাদের ময়দানে থেকে যাওয়া জায়েয হতো না। এর পরে কোন যুদ্ধ করা জায়েয হতো না। সাহাবায়ে কেরামের সকল জিহাদ হারাম হতো। যেহেতু তা হয়নি, বুঝা গেল, জিহাদ নিষেধ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও উদ্দেশ্য নয়, সাহাবায়ে কেরামও এমনটি বুঝেননি। এর বিপরীত যারা বুঝবে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্তির শিকার। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

মোটকথা- জিহাদের ব্যাপারে গোটা শরীয়তে যে শুধু হাদিস একটাই তা তো নয়। সবকিছু বাদ দিয়ে একটা হাদিসের পেছনে পড়ে মনমতো ব্যাখ্যা করে জিহাদের বিরুদ্ধে লেগে পড়া অন্তরের বক্রতার আলামত।

আল্লাহ তাআলা এদের চিত্রটাই তুলে ধরেছেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

“তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আপনার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, (যেখানে রয়েছে দু’ধরণের আয়াত) এর কিছু আয়াত হচ্ছে মুহকাম (সুস্পষ্ট দ্বর্থ্যহীন) এবং এগুলোই হচ্ছে কিতাবের মূল অংশ; আর কিছু আয়াত আছে মুতাশাবিহ (রূপক)। যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (সমাজে) ফিতনা বিস্তারের এবং আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কিতাবের মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে থাকে।”- আলে ইমরান ৭

অধিকন্তু হাদিসটিও অস্পষ্ট নয়। হাদিসের শুরু-শেষ ও প্রেক্ষাপট থেকে এবং স্বয়ং হাদিসের শব্দ থেকেই স্পষ্ট যে, জিহাদের আদব বয়ান করা পাশাপাশি জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেয়া হাদিসের উদ্দেশ্য। জিহাদের বিপরীত কোন কিছু হাদিসের কোনো একটি শব্দেও নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৯১২

যেসব ভুল আমাদের ধ্বংস করবে

saif abdullah

Moderator

০৯-০১-২০১৯

অস্তিত্ব সংকটে ভোগা একটি জাতি যখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মনোযোগী না হয়ে মেতে থাকে হাসি-ঠাট্টা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে, তখন সে জাতির ধ্বংসের ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সময় এখন কতটা নাজুক, তা কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারবে, যারা মালাহিম, ফিতান ও আলামতে কিয়ামতের পাশপাশি ইতিহাস, সমরকৌশল ও বিশ্বের ভূ-রাজনীতি সম্বন্ধেও ভালোভাবে ওয়াকিফহাল। আল্লাহর শপথ! যদি না এসব বিষয়ে আমার টুটাফাটা অধ্যয়ন থাকত, তাহলে আজ আমিও সে পথেই হাঁটতাম, যে পথে হাঁটছে আমার বন্ধু-বান্ধব, উসতাদ-ছাত্র, আত্মীয়-স্বজনসহ পরিচিত-অপরিচিত অধিকাংশ মানুষ।

এ সঙ্গীন মুহূর্তে আমাদের কী করণীয় ছিল, আর আমরা করছিটা কী! এ বড় আজিব এক ব্যাপার। আমি দেখতে পাচ্ছি, তাতারি ফিতনার আগ মুহূর্তে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল, ঠিক সে অবস্থায়ই আজ বিরাজ করছে মুসলিম সমাজে। জানি, আমার এক চিৎকারে এ জাতির কোনো বোধদয় হবে না। তবুও মাঝেমধ্যে বোকার মতো চিল্লাই; এ আশায় যে, এতে যদি একজন মানুষও বেঁচে যায়, সেটাওবা কম কীসে! আজ আমি সংক্ষিপ্তাকারে সমাজে চলমান ওইসব বিষয় নিয়ে সতর্ক করব, যা আমাদের ধ্বংসকে আরও তরান্বিত করছে। এগুলো থেকে আমাদের পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে, নইলে ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

★এক: অন্তর্দ্বন্দ্ব এখনও শেষ হচ্ছে না; বরং কারা যেন এ আগুনে আরও ঘি ঢালছে; অথচ এ থেকে আমাদের এখন হাজারও ক্রোশ দূরে অবস্থান করা জরুরি ছিল। এখন আমাদের এ সময় নেই যে, আমরা আহলে হাদিস-হানাফি, জামাত-হিফাজত, আলিয়া-কওমি, মানহাজি-মাদখালি, দেওবন্দি-মাদানি, সুন্নি-বিদআতি

অন্তর্কলহ জাগিয়ে নিজেদের দমে যাওয়া যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে নিজেরা নিজেদেরকেই ভস্মিত করব। বর্তমানে শাখাগত সকল ফিকহি মতভেদ; এমনকি মতানৈক্যপূর্ণ আকিদাগত বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও সেগুলো এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

★দুই: সাধারণরা তো দূরে থাক, স্বয়ং ছোট-বড় অনেক আলিমও এখন বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে মূল বিষয় ভুলে যাচ্ছে। অথচ এ ইস্যুগুলো তৈরি করার পেছনেও এমন অনেক ষড়যন্ত্র থাকে, যা সাধারণ লোকেরা বোঝে না। তখন তারা মূল বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে গৌণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আলিমদের তো এ জায়গায় এসে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়, তাদের তো সকল বিষয়েই সজাগ থাকা জরুরি। এ বিষয়গুলো নিয়ে এখনই সচেতন না হলে আমরা সর্বদা এ চক্রেই আটকে থাকব, কখনও চিন্তার এ কয়েদখানা থেকে বের হতে পারব না।

★তিন: জেনে বা না জেনে বর্তমানের অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন ভণ্ড পির, সেলিব্রেটি ও টিকটক তারকাদের অঙ্গভঙ্গি নকল করে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করছে। এগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও ট্রল করে যাচ্ছে। এমনকি অনেকে তো পরিবারেও এগুলো এপ্লাই করছে এবং শিশুদের এসবে অভ্যস্ত করে তুলছে। অথচ চিন্তাশীল ও সুস্থ রুচির মানুষ এসব কর্মকাণ্ডকে চরম ঘৃণার চোখে দেখে থাকে, আর এমনটাই হওয়া উচিত। বর্তমান উম্মাহর করুণ হালের কথা মনে পড়লে অনেক সময় তো খাবারও গলধঃকরণ কষ্টকর হয়ে পড়ে, সেখানে কিনা আমরা এসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় সময় পার করছি!

★চার: আমাদের অধিকাংশ আলিম ও তালিবুল ইলম ভাইদের এখনও আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ইখতিলাফি মাসআলা-মাসায়িল, মাজহাব, আকাবির, সাদ কান্ধলবি, জাকির নায়েক ইত্যাদি। অথচ তাদের না আছে আকিদার ইলম, না আছে ওয়ালা বারার খবর, না আছে মালাহিম-ফিতান বিষয়ক কোনো ধারণা আর না আছে ইতিহাসের প্রতি কোনো আগ্রহ। ইশ! বর্তমান এ নাজুক পরিস্থিতিতে এসবের যে কতটা প্রয়োজন, তা যদি বুঝাতে পারতাম! গুরুত্ব ও প্রয়োজনয়ীতার বিচারে কোনটা আগে আর কোনটা পরে, সেটা নির্ধারণ করতে না পারলে এমন ইলম আমার কতটা কাজে লাগবে, ভেবে দেখা উচিত।

★পাঁচ: এ জেনারেশনের অধিকাংশ সদস্য আধুনিক ও আপডেট হওয়ার চিন্তায় বিভোর। সবাই এখন উন্নত বাড়ী, অত্যাধুনিক গাড়ি ও রাজকীয় হালে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানদের ওপর আল্লাহ যে ইদাদ ফরজ করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে কি কারও সন্দেহ আছে? এত এত জায়গা-জমি কিনছি, কেউ গাড়ীর ফিকির করছি, কিন্তু কেউ কি ইদাদের জন্য দুটি টাকা বা দুটি জিনিস হলেও প্রস্তুত করে রাখছি? শারীরিক ইদাদ করতে না পারলেও মানসিক ও আর্থিক ইদাদের বিষয়ে আমরা কতটুকু সচেতন? আমরা করতে না পারলেও আমাদের শত্রুদের ইদাদ কিন্তু ঠিকই সম্পন্ন হয়ে গেছে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০৭৬

হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতা ও কিয়ামতের একটি আলামত: অজ্ঞতার বিস্তার

Abu Zor Gifari

Senior Member

০৩-২৩-২০১৯

[একজন আলিমের হৃদয় বিদীর্ণকারী অভিজ্ঞতা। প্রতিটি লাইন যথেষ্ট নিঃশ্বাস নিয়ে পড়ুন। তাড়াহুড়া করবেন না। লেখাটা পড়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সে হাদীসটি মনে পড়ে গেল, 'তোমরা যদি জানতে- যা আমি জানি তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী।' ইয়া রহমান ইয়া রহীম! দূর্বল এ বান্দার ওযর তুমি কবুল করো। আমিন।]

ধর্ম, আন্ত:ধর্ম ও ইরতিদাদ নিয়ে কিছু আলাপ-

ধর্ম ও আন্ত:ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনা করেছি। ফলে এ বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটা সময় ছিলো; যখন ধর্মীয় পন্ডিতরা কোথাও একসাথ হতেন। পরে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতেন। একজন মুসলিম পন্ডিতও তুলে ধরতেন ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র ধর্ম তার বয়ান। সম্প্রতি বিষয়টা ভিন্নদিকে মোড় নিয়েছে। কোথাও আকবরের দ্বীনে ইলাহীর মতো সকল ধর্মের অনুসরণে গড়ে উঠছে একটি নতুন ধর্ম। কোথায়ও চলছে আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি বয়ান। আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির সমাবেশগুলোতে সাধারণত বক্তারা অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথাই বেশি বলেন। ইসলামের দিক থেকে অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা বলা- এর দুটি দিক আছে। একটা হচ্ছে কোন অমুসলিম ব্যক্তির নিরপত্তা ও অবস্থাভেদে তার প্রতি ইসলামের নির্দেশিত সদাচার। আরেকটা হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্যাকুলারিজমের ভিত্তিতে তার বিশ্বাস ও কর্মযজ্ঞকে ধর্ম হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্থান দেয়া। স্যাকুলারিজমের প্রবক্তারা, বিশেষ করে মাঠপর্যায়ে আন্ত:ধর্মীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়; এমন এনজিওগুলো- বিষয়টিকে সহজে বুঝাতে"ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা" এই শিরোনামে আহ্বান করে থাকে।

ঈমান ও কুফর যে, দুটি সম্ভাবনাময় সত্যের ভিন্নমত নয় বরং দুটি বিপরীতমুখী মতামত, যার একটা গ্রহণ করলে অন্যটাকে অস্বীকার করতে হয়, এই কথাটা

মিটিয়ে দেয়াই বর্তমান 'ধর্মীয় সম্প্রীতি' বয়ানের সহজ পাঠ। কিন্তু কোন মুসলিম যদি ভিন্নধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের কোন একটির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করে, তাহলে দিন শেষে যা হবে; তা হচ্ছে তিনি আল্লাহর একত্ববাদকে নিরংকুশ মানছেন না। আর যে ব্যক্তি শিরকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করে, হোকনা তা খেলাচ্ছলে, রাজনৈতিক কারণে বা উৎসবের আমেজ নিতে; তার তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস প্রশ্নবিদ্ধ হবেই। তাই এমন ব্যক্তি যদিও নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তবুও সে কাফির।

এই যে ভিন্নধর্মের বিশ্বাস ও আচারের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীত অনুভব না করা, এর জন্য যদি কেউ আপনাকে সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদী বলতে চায়; তাহলে আপনার হাতে অপশন দু'টো। কুফরের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা, এটা যে খালেস তাওহীদ ও মুসলিম আইডেন্টি, জঙ্গিবাদ নয়, এই কথা যদি আপনি তাদের বুঝাতে ব্যার্থ হন; তাহলে হয় এই বোঝা মাথায় নিয়েই আগামীর দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত হন অথবা পরিচয়ে মুসলিম থেকেও ভেতরে নিজের জন্য ইরতেদাদ পছন্দ করুন। সমস্ত নবীগণ আলাইহিস সালামকে এই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে এবং কিয়ামতের আগে দাজ্জালের ভয়াবহ পরীক্ষার অপশন এই দু'টোই। এই ছাড়া ঈমান ও কুফরের মাঝে তৃতীয় কোন অপশন নাই।

গত কয়েক বছর আমি যেখানেই গিয়েছি সুযোগ পেলেই পার্শ্ববর্তী মানুষটার কাছে জানতে চেয়েছি; ইসলাম ও দুনিয়াতে প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা কী। এখানে বিশ্বাসের কোন 'দ্বন্দ্ব' সে কী স্বীকার করে কী না, এবং জানতে চেয়েছি, এই যে আমি ধর্ম বিশ্বাসে পরস্পর 'দ্বন্দ্ব' শব্দটা বললাম এ বিষয়ে তার কোন আপত্তি আছে কী না। আমি দেখলাম অধিকাংশ মুসলিমই প্রচলিত ধর্মগুলোর সাথে ইসলামের বিশ্বাসগত পার্থক্যটুকু কী তা জানে না। সহজ করে বললে তাদের অধিকাংশই "কালিমাতুত তাওহীদের প্রথম অংশ "লা-ইলাহা" এর মর্ম বুঝেনা। অর্থাৎ তারা বুঝে আল্লাহ একজন আছেন এটাই ধর্ম। আর দুনিয়ার সকল ধর্মের লোকেরাই কোন না কোন পর্যায়ে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ একজন আছেন; সুতরাং মতবাদের দিক থেকে এখানে ধর্মে ধর্মে ভিন্নতা থাকলেও বিশ্বাসের দিক থেকে সকলেই এক।

অমুসলিমদের পূজা পার্বন উদযাপনে অংশগ্রহণ করে ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে এমন অনেক মুসলিম পরিচয়ধারী ব্যক্তির সাথেও আমার এ বিষয়ে কিছু কথা হয়েছে; তাদের একজনের হুবহু বক্তব্য আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"অন্য ধর্মের উপাসনাকে আমি আমাদের ইবাদত বা আল্লাহ কে বুঝিনা। ওদের উপসানা ওরা করে, ওদের আনন্দ উৎসব ওদেরই। তবে ওদের উৎসব যেন আনন্দময় হয় মানুষ হিসেবে আমি এই শুভ কামনা আমি করি"।

অর্থাৎ তিনি একথা বুঝেছেন যে, অমুসলিমদের পূজা উদযাপন আল্লাহর ইবাদত নয়; কিন্তু তিনি এটা বুঝেন নি যে, এগুলো আল্লাহর সাথে শিরক। তাই কোন মুমিন মন থেকে এই শিরকি উদযাপনকে আনন্দময় হওয়ার প্রত্যাশা করা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। বরং তাওহীদের দাবি হচ্ছে "একজন মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক যেন না হয় এই প্রত্যাশা করবে"।

শহরের এক বড় মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে জানালেন যে; একদিন তিনি মসজিদে তাওহীদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর মসজিদ সভাপতি তাকে প্রশ্ন করেছে যে, "আপনি যেভাবে ওয়াজ করলেন তাতে মনে হচ্ছে; শুধু মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কালিমাতুত তাওহীদ কবুল করে নি, সে জাহান্নামে যাবে এই বিষয়ে মসজিদ সভাপতির সংশয় আছে। তদুপরি তিনি মসজিদ সভাপতি এবং তার দাবি তিনি মুসলিমও। সমাজের মুসলিমদের তাওহীদের আকিদার যে কী অবস্থা তা নিয়ে এমন হাজারো উদারহণ টানা যাবে।

সম্প্রতি একটি ভিডিও পেলাম। "মাদানী নগর মাদরাসা" থেকে দাওরায়ে হাদীস ফারেগ এক ছাত্র "মুভ ফাউন্ডেশনের" প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার পর; তার মতামত ব্যক্ত করছে এই ভাষায় যে- (লিংক চাইলে কমেন্টে দেয়া যাবে)

"আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হওয়া উচিত যে আমরা মানুষ। যদি মুসলমান পরিচয় দেই আমরা, সারা পৃথিবীর মধ্যে দেড়শ কোটি মানুষকে আমরা সাথে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু তার থেকেও বড় যদি আমরা মানুষ পরিচয় দেই তাহলে সারা পৃথিবীর ছয়শ কিংবা সাতশ কোটি মানুষকে আমরা এক সাথে পাই"।

‘মুভ ফাউন্ডেশন’ এই ভাইটির কথাকে কাটছাট করেছে কী না তা আমি জানিনা। কিন্তু যে কথাগুলো এখানে প্রকাশ করা হলো; তাতে তাওহীদের দিক থেকে কোন সমস্যা আছে কী না!! এটা বুঝতে পারা এখন একটা বড় ধরণের ঈমানী পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি আমাদের অনেকের কাছেই এখন সব কিছুতেই “কী সমস্যা?” একটি কমন ডায়ালগে পরিণত হয়েছে।

একজন মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাই ছাড়াও, কাফিরদের (যারা আপাত মানুষও) নিজের সাথে নিয়ে আসতে, নিজের মুসলিম পরিচয়কে হাইড করে দিতে চায় এবং এটাকে গর্বের বিষয় মনে করে, তবে তাতে তার তাওহীদ বিরোধী কিছু হয়ে গেলো কী না! তা বুঝবার জন্য ঈমানের যে একেবারে প্রাথমিক পাঠ, আমরা সে জায়গা থেকেই সরে এসেছি। একাডেমিক বলি আর নন একাডেমিক বলি কুফর ও তাওহীদ প্রমাণের ক্ষেত্রে ‘বন্ধু ও শত্রুর’ পাঠ আমরা সমাজ থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ফলে কাফিরদেরও সাথে না নিয়ে আসতে পারার বেদনা থেকে একজন মুসলিম তার মুসলিম পরিচয়কে মানুষ পরিচয় থেকে ছোট করে দেখছে। অথচ তিনি ‘দাওরায়ে হাদীস’ ফারেগ একজন আলিমও।

আমি জানি “আমি মুসলিম” এই পরিচয়ের সাথে সাম্প্রদায়িকতার ট্যাগ যুক্ত করা আছে। আমি এও জানি যে, মুসলিম পরিচয় বহন করা এটি রাজনৈতিক ও জাতীয়বাদের মতো কোন ঠুনকো বিষয় নয় যে, দিন শেষে আমরা আমরাইতো। মুসলিম মানেই আলাদা কিছু। একটি বিপ্লবী পরিচয়। সমস্ত কুফরকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই এ পরিচয় গড়ে উঠে। এখানেও সহনশীলতার পাঠ আছে; তবে তা ‘বাইনাহুম’। মোটাদাগে ‘আশিদ্দাউ আলাল কুফফার’। দুনিয়ার সমস্ত কাফিরদের নিজেদের অবস্থাও তাই। তাই যে মুসলিম এই ট্যাগের মুকাবেলা করতে নারাজ, উল্টো এ থেকে বাঁচতে কোন ধরণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, নিজের মুসলিম পরিচয়ই মুছে দিতে চায়?, সে মুসলিম রইল কী না এই বিতর্ক এখন খুবই প্রাসঙ্গিক।

সম্প্রতি যশোরে, এমপিকে ফুল দেয়ার যে ভিডিও দৃশ্য ভাইরাল হলো; এটা আচমকা কোন ঘটনা নয়; মুসলিমদের ভেতরের তাওহীদ ধারণার যে কী অবস্থা, তার একটা সামগ্রিক ভিউ। মানুষের ধারণা ঐ যে একবার তার নাম রেখে, আরেকবার ‘মুসলমানি’ করে তাকে মুসলমান বানানো হয়েছে তারপর এটা ভাঙ্গার

আর কোন সুযোগ নেই। ফলে সে নিত্য দিন ঈমান বিরোধী কাজ করছে আর দাবি করছে মুসলিম।

এই বিষয়ে আমি আর দীর্ঘ আলাপ করছিনা। “নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ” নামে “সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ”. এর ছোট্ট একটি রেসালা পড়েছি। সেখানে তিনি ردة جديدة (নতুন ইরতিদাদ) এই শিরোনামে একটি অধ্যায় লিখেছেন। তাতে এই নতুন ইরতেদাদের বিষয়ে তিনি খুব বলিষ্ঠ ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন। কিভাবে একজন মুসলিম ইরতেদাদকে গ্রহণ করেও নিজেকে মুসলিম দাবি করতে পারে তিনি খুব শক্ত ও সুন্দর ভাষায় তা তুলে ধরেছেন। আপনারা এই কিতাবটি পড়ে নিতে পারেন।

দু:খ হচ্ছে ঠিক এই সময়ে; যখন মানুষেরা মুক্তচিন্তা ও সহনশীলতা চর্চার নামে দলে দলে ইসলাম থেকে নিজেদের গর্দান মুক্ত করছে; তখন আমাদের সম্মানিত দাঈগণ মানুষদের হাসির প্রকার শেখাচ্ছেন আর ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করছেন মিস্টি কথার তরিকা নিয়ে। যাদের ঈমানের অবস্থা ভয়াবহ তাদের শেখাচ্ছেন আযআ'ফুল ঈমান।

যে ব্যক্তি নিজেকে ইসলামের একজন দায়ী মনে করেন তার প্রতি আহ্বান তাওহীদের পাঠ বৃদ্ধি করুন। ইসলাম এ অঞ্চলে যেভাবেই আসুক শুরু থেকেই এখানে একান্তই তাওহীদের একাডেমিক পাঠ গূরুত্ব পায়নি। মানুষ বুঝেনি যে, শুধু স্বীকারই নয় অস্বীকারও ঈমান, বরং ঈমানের শুরু অংশ “ লা-ইলাহা”- ইল্লাল্লাহ- মানে -কোন ইলাহ মানিনা। তবে; যাকে মানি তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনি আমার রব।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৭৮৫

*****